# আঁকা-বাঁকা

প্রবোধকুমার সান্যাল

মিত্র ও ঘোষ.
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আঁকা-বাঁকা

চতুর্থ সংস্করণ

—সাড়ে চার টাকা—

এই গ্রন্থের রচনাকাল মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৫

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্ত্তৃক কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস লিঃ, ৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

তবুও ফেরৎ দিলে ?

হ্যাঁ, সম্পাদকের ভাষায় দৃষ্টিভঙ্গীটা কিছু আধুনিক।

আধুনিক মানে ?

মানে, যাতে আত্মবঞ্চনা নেই, পাঠক ঠকাবার মত রংদার কবিতার ধোঁয়া নেই, বর্ষা-বসন্তের ইনানো-বিনানো প্রশস্তি নেই।

তবে কি ছাই ছিল ?

ছিল সোজা কথাটা সহজ ক'রে বলা। সত্যের রূঢ়তা—

যাই হোক, সাহিত্যিক হওয়া কঙ্করকুমারের কপালে ঘ'টে উঠলো না। সে বাড়ী ফিরে এসে আহারাদির পর ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে লিখতে বসলো একখানা চিঠি। লিখলো এই :

প্রিয় মীনাক্ষী, তোমার বাবার সেই পুরনো প্রণয়কাহিনীটা নিয়ে তুমি আমায় একটা গল্প লিখতে বলেছিলে। গল্পটা 'বিশ্বপ্রেম' নামক মাসিক পত্রে পাঠাই কিন্তু সেদিন সেটা ফেরৎ এলো। সুতরাং আপাতত সাহিত্য রচনায় ইস্তফা দিলুম। ইতি। তোমার কঙ্কর।

পুনশ্চ—

তুমিও ত এম-এ পাশ করেছিলে। আমার পিতার মৃত্যুর পর (ধনবান পিতা) আমার মনস্তত্বটা কেমন দাঁড়ালো নিশ্চয় তুমি অনুভব করবে। আমি অবশ্যই দুঃখিত, এবং সেই দুঃখটা আরও গভীর হবে বাবার জমানো টাকাটা হাতে এলে। তিনি অতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, এবং তাঁর কৃপণতাগুণ ছিল ...মি তাঁর সুযোগ্য পুত্র। এমন হ'তে পারে আমি তাঁর অর্থ সংকার্যে ...ং অনেকটা গণতন্ত্রমতে জীবনযাপন করব। কিছুদিন আগে ...এসেছিল, তা'তে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি যা চরিত্রহীন হ'তে গেলে আরও অনেক টাকা লাগবে, কারণ সহর। যাই হোক শীঘ্রই আমার সুদিন আসছে, উইলের ...

তার প্রমাণ বর্তমান কল্‌কাতা শহরের ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। ভদ্রঘরের
পুরুষদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে কল্‌কাতার অনেক পতিতা-পল্লীতে ইম্
ট্রাস্টকে লেলিয়ে দিয়েছেন। আজ বারাঙ্গনা সমাজ ভীষণ বিপন্ন!
প্রাপ্য যা কিছু সমস্তই আধুনিক তরুণীরা আত্মসাৎ করছেন। গালে ক
রং মাখা, ঠোঁটের রেখায় পুরুষের বুকের রক্ত মাখা, মুখে মাখা মদ
কাঁধকাটা জামা, গলার কাছে তিনকাটা জমি অনাবৃত রাখা, রঙীন পেটি
ব্যবহারের দ্বারা কলেজের ছাত্রের দৃষ্টি উত্তম-অধম বাদ দিয়ে মধ্যমে আনা—
সকল প্রসাধনে আধুনিক তরুণীরা আধুনিক পতিতাগণকে পরাজিত করেছেন
সেইজন্য, হে মীনাক্ষী দেবী, আমি তোমার শ্রীচরণে আবেদন জানাই, তু
রঙ্গরঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হও। পতিতাগণের দুঃখ ঘোচাও এবং আধুনিক
মেয়েদের গর্ব খর্ব করো। তুমি এসে দুই নৌকায় পা দিয়ে দাঁড়াও এবং আমি
স্খলিত-আদর্শ তরুণ, আমি তোমার পূর্ণিমা ও অমাবস্যার রূপ দেখে অর্থহীন
আধুনিক গদ্য কবিতা রচনা করি।

সাহিত্য রচনা ত্যাগ ক'রে এখন আমি ব্যায়াম অভ্যাস করছি, এইটেতেই
বেশী কাজ হবে। সময় পেলেই গণিত ও বিজ্ঞান চর্চা করি। অতএব তোমার
কোনো ভয় নেই।

আমার যৌনজীবন কি ভাবে চলছে এটা তোমার জানার ঔৎসুক্য অবশ্যই
আছে, কারণ তুমি স্ত্রীলোক। কেবল এই কথাটাই জানিয়ে রাখি বাংলাদেশে
মেয়েদের দেখলেই আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী পাঠ করি। অর্থাৎ সংযম
শ্রদ্ধায় আসে না, আসে বিতৃষ্ণায়।

আশা করি তোমার অন্যান্য পুরুষ বন্ধুরাও তোমার পরামর্শমতো ব
শিক্ষা করছেন। আমার প্রেম ও লালসা গ্রহণ করো। ইতি—

আমি রাজি হয়েছি বটে তবে এখনো দিনস্থির করিনি। আমি ... পাওয়া মেয়ে, সুতরাং আশা করি আমার এই অহংকার তোমার অশোভন নয়।

বয়সের উল্লেখটা মেয়েদের কাছে কটু। আমার বয়স দেখো না, মনের চেহারা জানতে চেয়ো না, কেবল আমার দিকে চেয়ে দেখো। যদি নিতান্তই বয়স জানতে চাও তবে বলব, ছাব্বিশ বছরের চিহ্ন সর্বাঙ্গে থরে থরে সাজানো। দু'বছর আগে তোমার সঙ্গে দার্জিলিঙ পালিয়েছিলুম মনে আছে? কল্পনা করো জুলাই মাসের দার্জিলিঙ, উপমা তৈরী করো দার্জিলিঙের দৃশ্যের সঙ্গে আমার সর্বশরীরের। সেখানকার পাহাড়ের মাথায় নববর্ষার মেঘের মতন আমার কালো এলো চুল,— আরো নীচে নামো, জলাপাহাড় আর বার্চ হিল,—আরো নীচে নামো, কটিতল শস্যশ্যামলা; নামো নীচে, যেখানে পশুরাজ্য—যেখানে হিংস্রতা, যেখানে ভয়ঙ্কর প্রবৃত্তির বাসা, যেখানকার অসংখ্য নদীবাহিনী সুধারায় মানব সৃষ্টি আর কৃষিক্ষেত্র অবিরাম প্রাণসঞ্জীবিত হচ্ছে। আমার এই পত্র ভদ্রঘরের স্বামীস্ত্রীর প্রেমপত্রের মতো অশ্লীল নয়, এর মধ্যে তরুণ সাহিত্যের দুর্গন্ধ নেই, সুতরাং আমার এই দাম্ভিক আত্মপরিচয়ের ভাষা তুমি সংবাদপত্রেও ছাপতে পারো। চৌদ্দয় ধরেছিল ফুল, আঠারোয় ফল, ছ... এখন পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা। আমি বাংলা দেশের মেয়ে, মাতৃদেবীর কথা সত্য হয় তবে পিতাও আমার অবশ্য বাঙালী—কিন্তু দেহটা আমার ঠিক ... মেয়ের মতন নয়, কিছু নতুন মসলা সংযোগে এটা তৈরী, মাটির চেয়ে ... অংশ বেশি, অর্থাৎ মচ্‌কাবে না কোনোদিন, উত্তাপেও গলবে ... ভূমিকম্পেই ভেঙে পড়তে পারে। নাম রাখা হয়েছিল মীনাক্ষী, বো... আছে ধারালো স্বচ্ছতা আর হিংস্রতা। গায়ের রংটা খুব ফর্সা ন... মতন, দেখলে অবগাহনের ইচ্ছা জাগে। আর চরিত্র? পা... পারব না, বরং হাসতে হাসতে গলায় দুলতে পারব।

আশা করি আনন্দে আছো। স্নেহসম্ভাষণের সঙ্গে যা দিতে পারতুম সেটা চিঠিতে দেওয়া যায় না। তবে ছলনাটুকু গ্রহণ করো। ইতি—

চিরকালিনী

পুনশ্চ—

চাকরিটা এবার ছাড়তে পারি কিনা জানিও। চারশো তিয়াত্তর টাকা এই ক'মাসে জ'মে গেছে। ওটা সহজেই খরচ করতে পারি কারণ আরো ছাব্বিশ বছর আমার টাকার অভাব ঘটবে না। তা ছাড়া তোমার পৈতৃক সম্পত্তির সঙ্গে আমার যৌবনটা প্রায় অচ্ছেদ্য। আমি সেই আবহমান কালের শক্তিতেই তোমাকে নিঃস্ব করতে পারবো সন্দেহ নেই। সামান্য চোখের কটাক্ষ আর ঠোঁটের ভাষা—এতেই আমার অন্নসংস্থান হয়ে যাবে। কবে তোমার দর্শন মিলিবে বয়োজ্যেষ্ঠা এই দাসীকে একটু জানিয়ো। তোমার পদসেবা করতে আমার কুণ্ঠা নেই, কারণ রসিকজন জানেন, স্ত্রীলোক পায়ে হাত বুলোলে পুরুষের শরীরের মধ্যে নানারূপ বৈজ্ঞানিক কার্যকারণ ঘটতে থাকে। ভারতবর্ষের নিয়মকর্তাদের রসবোধ ছিল।

তুমি একজন উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ, এবং আমি কুলনাশিনী তরুণী। মানে, আমি এতই খরস্রোতা যে, অবিশ্রান্ত কুলক্ষয় ক'রে না চললে আমার প্রাণের সত্য পরিচয় দেওয়া যায় না। বিপ্লবের সঙ্গে যেমন ধ্বংস জড়ানো, তেমনি তোমার সঙ্গে আমি। কিছু একটা গ'ড়ে তোলবার মতন প্রতিভা নেই কিন্তু ভাঙাভাঙি করবার কেমন একটা উল্লাসকর প্রবৃত্তি বেশ উৎসাহিত ক'রে তুলছে। তোমার অভিজ্ঞতা সংগ্রহের বাসনা, আর আমার ...াপনা, দুটোই যেন ঝড় ওঠবার আগে একটা নিশ্চল অবস্থা। বিপ্লব...ংসের রীতি হচ্ছে যে তারা ঘরমুখী নয়, বাইরেই তাদের গোলমাল। তাদের না আছে স্টাইল, না জিনিয়স্—তবু নবাগতের জন্য তারা পথ ক'রে যায়। তোমাকে ব'লে রাখি আমি বরং রঙ্গমঞ্চের উপর ওরিয়েন্টাল কায়দায় নাচ

দেখিয়ে জনসাধারণের মনে রং ছড়াতে পারবো কিন্তু বিয়ে ক'রে স্বামীর সঙ্গে পতিতাবৃত্তি করতে পারব না। এখানকার মেয়েমহলে ধারণা, আমার কিছু ছিট আছে। সেদিন মিস্ দত্ত নামক একটি তরুণী বললেন, আপনার মতন মেয়ে বাঙলায় নেই। আমি বললুম দেখতে জানলে পথেঘাটেই আমার মতন মেয়ে পাওয়া যায়। তফাৎ এই, তারা কথা বলে না, আমি বলি। যারা বলে, অবিশ্বাস, সংশয়বাদ আর অশ্রদ্ধা কেবল আধুনিক যুগের ছেলেদের ঘরেই আগুন ধরিয়েছে তারা সত্য কথাটা বলে না, মেয়েদের মনে অনেক আগেই বারুদ জমেছে, কিন্তু মুখ ছিল তাদের চাপা। প্রমাণ চাও? রাজপথের দিকে চেয়ে দেখো—স্ত্রী আন্দোলনটা চলছে প্রকাশ্যে, অলিগলিতে দেখো মেয়েরা আনছে সমাজ-বিপ্লব। তাদের হাতে টাকা নেই কিন্তু দেহটা আছে মূলধন। খবরের কাগজ পড়ো,—আজ ঘর ভাঙছে মেয়েরাই। কেন জানো? নতুন ক'রে সব জিনিষের দাম কষতে হবে। যাদের বড়লোক ব'লে জানতুম আর মানতুম তারা আর বড় নয়; তার কারণ নতুন অর্থনীতি-শাস্ত্রে জানা গেল টাকায় বড় হওয়া যায়। মনস্তত্ত্ব প'ড়ে জানা গেল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম এসব অতি সামান্য কথা। মা-বাপকে অতিশয় খাতির করবার দরকার নেই, হয়ত তারা অতি নীচু স্তরের মানুষ।

যাই হোক, তোমার চিঠি পেলে নিজের ইতি-কর্তব্য চিন্তা করব। শিকল ওপড়াতে আমার দেরী হবে না, কারণ যে ঘরে আমি থাকি সেটা পাখীর বাসা, খোঁচা দিলেই ভেঙে পড়বে। তা ছাড়া আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ভেবে নিতে পারি। যদি এরা আমাকে না ছাড়তে চায় তবে রাত্রিযোগে ভৈরবীর বেশ ধ'রে গৃহত্যাগ করব। কূলনাশিনী পদ্মার গতি সকে অকূলের দিকে। শীঘ্র চিঠি দিয়ো। ইতি—

তোমারই অন্যতমা—

# আঁকা-বাঁকা

পৈতৃক আমলে বনেদি জিনিষপত্র কঙ্করের বাড়ীতে গচ্ছিত ছিল। পুরনো আসবাবের দোকানে কঙ্কর কতকগুলি বিক্রি ক'রে টাকা মজুত করল। সহোদর এক ভগ্নী ছিলেন কৃষ্ণনগরে, তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হোলো। নাম সুপ্রভা, বয়সে কঙ্করের অপেক্ষা বছর তিনেকের বড়, চারটি সন্তানের জননী, স্বামী উকিল। সকালের দিকে মেজাজটা কঙ্করের ভালোই ছিল। বললে, দিদি তোমার অংশ বুঝে পড়ে নাও।

সুপ্রভা হেসে বললেন, আমার আবার অংশ কি রে?

দৈবাৎ তুমি মেয়ে আর আমি ছেলে। পিতা একই। পিতার অন্যায়ের আমি প্রতিকার করতে চাই। বাড়ী আর ব্যাঙ্কে টাকা, এ দুটোর তুমি যা ইচ্ছে নাও।

তা হ'লে আর রইল কিরে, মুখপোড়া?

যা কিছু অস্থাবর।

বটে, আর তুই বুঝি ঘর সংসার করবিনে?

কঙ্কর বললে, কোন চিন্তা নেই, ঘর আমার ঘরে ঘরে, সংসার পাতবো পথে পথে। ঘর দোর তোমাকে ছেড়ে দিলুম, সময় দিলুম তিন দিন—বাড়ী খালি ক'রে দাও।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে সুপ্রভা দেবী ভীত হয়ে বললেন, আমি যে তোর জন্য মেয়ে ঠিক করেছি—এই ফাল্গুনেই—

কোন চিন্তার কারণ নেই, এই ফাল্গুন থেকেই সেই মেয়েটির একটি মাসোহারার বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। ভারতবর্ষে এখন চল্লিশ কোটি লোক, সুতরাং আমার বিয়ে না করলেও চলবে।

তুই কি সন্নিসি হতে চাস ?

না, আমি চাই লক্ষ্মীছাড়া হ'তে। একটি উৎকৃষ্ট লক্ষ্মীছাড়া। দয়া ক'রে উপদেশ দিয়ো না এবং অনুগ্রহপূর্বক খোঁজখবর নিয়ো না।

চাল চুলো খুইয়ে কি করবি তাহলে ?

একখানা উড়ো জাহাজ কিনবো, বনে জঙ্গলে শিকার ক'রে বেড়াবো, হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করব, দেশের কাজে নামবো, সিনেমার অভিনেতা হবো, পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবো,—মানে কিছুই করব না, কেবল একটু স্বাধীনভাবে বাঁচবার চেষ্টা করব।

তিন দিন পরে দেখা গেল সুপ্রভা কিছুই গ্রহণ করেন নি। তিনি স্বামীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এক সময় কঙ্করকে ডেকে বললেন, দেখছি সবই তুই নষ্ট করবি। আমার বলবার আর কিছু নেই তবে চরিত্রটা ঠিক রাখিস, এই কেবল অনুরোধ। বুঝলুম, সেই ছোট জাতের মেয়েটাই তোর মাথা খেয়েছে।

স্বামী বললেন, চাকরী না থাকলেই যে বেকার হয় তা নয়, ধনবান লোকও বেকার হ'তে পারে।

দুইজনে বিদায় গ্রহণ করলেন।

কঙ্কর সাহিত্যিক হ'তে পারলো না, কিন্তু বেপরোয়া হ'তে পারলো। সত্য কথা বলতে কি, বেপরোয়া হ'লেই তাকে মানায়। তার কথাবার্তা পাঁচটা ছেলের মতোই, কিন্তু আর পাঁচজনের মতো তার চরিত্রটা পুরাতনের উপরে রং চড়ানো আপাত আধুনিক নয়। তার কথাবার্তার সঙ্গে কাজের মিল নেই, কাজের সঙ্গে মিল নেই আদর্শের, এবং আদর্শের মিল নেই প্রাণের সঙ্গে। অর্থাৎ তার প্রাণধর্মটা কেবল নতুন খোঁজে। নতুন মানে আনকোরা নয়, নতুন মানে বিচিত্র,—যার সঙ্গে চলতি জীবনের কোনো সঙ্গতি নেই, যার সঙ্গে একটা অদ্ভুতের আত্মীয়তা ঘটে পদে পদে, যার প্রবল ঝাপটার বেগে কেবল

প্রচলনের ভিত্তি নিরন্তর ভেঙে পড়তে পারে। সংসার সে করবে না, তার মানে এ নয় যে, সে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে; তার মানে এ নয় যে, নারী ও সমাজ সম্বন্ধে তার একটা রক্তগত বৈরাগ্য; কিন্তু তার মানে এই যে, তার মধ্যে প্রাণ বৈচিত্র্যের যে ধ্বংসাত্মক আকর্ষণ সেটা পদে পদে ব্যাহত হ'তে পারে। পৃথিবীর নানা সাহিত্যের নানা গল্পের ভিতরে সে আবিষ্কার করেছে সমাজের চেয়ে মানুষ বড় এবং মানুষের চেয়ে বড হচ্ছে তার স্বভাবধর্ম। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"—এই চল্‌তি প্রবাদের বিকৃত অর্থটাই সবাই ক'রে থাকে। অনেক বড বড় সাহিত্যিক প্রকাশ্য ভাষায় গলাবাজি ক'রে এই ছত্রটির আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে থাকেন। এই ছত্রটা মুখস্থ থাকলে সস্তা সভাপতিত্বের চটকে বোকা জনসাধারণের কাছে হাততালি পাওয়া যায়। সাম্যবাদ থেকে আরম্ভ ক'রে অতীন্দ্রিয় সাহিত্যের ব্যাখ্যা পর্যন্ত এই ছত্রটার ছকে এনে ফেলা চলে। যেন 'মানুষ সত্য' এই কথাটা উচ্চারণ করলেই শ্রোতার রক্তে উত্তাপ সঞ্চার করা যায়। মানুষ যে রক্ত মাংসের মানুষ, ধনিকের দ্বারা উৎপীড়িত মানুষ, চাকরি না পাওয়া বেকার মানুষ, সাহেবের বুটের ঘা খাওয়া মানুষ—এই [illegible] ভাড়াটে সভাপতিরা বেশ আনন্দ পায়। কিন্তু মানুষ [illegible] ক নয় একথাটা বুদ্ধিমানরা কল্পনা করবে কখন? একটা [illegible] গুলি আত্মপ্রতিবাদশীল বৃত্তির একটা সমষ্টি একথা বুঝবে [illegible] টি সর্বত্যাগী পরম সত্যাশ্রয়ী রাষ্ট্রনেতা, তাকেও যে [illegible] খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করতে হয়, একথা ওরা [illegible] ভাবতে পারে না যে, একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় হিন্দুসভার [illegible] গুলি সনাতন হিন্দুধর্মী,—সেও সকালে ও রাত্রে ইংরেজ- [illegible] করে। এবং কঙ্করেরই এক দূর সম্পর্কের মাতুল যিনি [illegible] একজন হৃদয়বান্ কর্মী তিনিও যে বেশ স্বাধীনভাবে [illegible] প্রতি প্রতিরাত্রে প্রণয় জ্ঞাপন ক'রে থাকেন—এ ত'

...ার সবাই জেনেছে। যারা নাগাসন্ন্যাসী তারাও ত পরস্পরের আসনাধিকার নিয়ে খুন-জখম পর্য্যন্ত করে থাকে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—একথা যিনি বলেছেন তাঁর পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ আসক্তি ত' সর্বজনবিদিত। তাঁর এই সহজ স্বভাবধর্মকে যারা ব্যাহত করতে চেয়েছিল, এই বাণী ত' তাদেরই উদ্দেশে। সাধারণের অনেকে জানে, অন্তত জানার ভান করে যে, মানুষের উঁচুদরের মুক্তি হোলো চিরাচরিত সংস্কারের কাছে। অষ্টম এডোয়ার্ড এই সেদিন যখন একটি অজ্ঞাত নাম্নী পরস্ত্রীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসন ত্যাগ করলেন—তখন এই ভারতবর্ষের জনসাধারণ—এই রক্ষণশীল জনসাধারণ যারা সতীনারী ছাড়া নারীর আর কোনো পরিচয় ভাবতে পারে না—তারা রাজার ত্যাগ ও প্রেমের জন্য বাহবা দিলে। তারও চেয়ে এগিয়ে গেল বাঙ্গলা দেশের মেয়েরা। তারা এক সম্মিলিত বিবৃতি প্রকাশ করলে সংবাদ পত্রে। বললে, "হে রাজন্, যে প্রেমের মহিমা তুমি প্রকাশ করেছ আমরা তার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দুইটি পূর্বস্বামীর দ্বারা সম্ভুক্ত যে স্ত্রীলোকটির জন্য তুমি সিংহাসনকেও তুচ্ছ করলে, আমরা তার জন্য তোমাকে প্রেমের রাজা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদে অভিষিক্ত করছি। জগতে তুমি অতুলনীয়, ইতিহাসে তুমি অমর।" কঙ্কর ভাবলে, রাজার আভ্যন্তরীন ইতিহাসটা সঠিক জানা গেল না বটে, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের মনে[...]।বটা এতে বেশ জানা গেল। বাঙ্গালী মেয়ে বিচিত্র। তারা দশ বছরে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার তুলনা ইতিহাসেও নেই। বুদ্ধিমান পুরুষরা তাদের কপালে বহুকাল থেকে সতী আখ্যা দিয়ে এবং সন্তানের বোঝা চাপিয়ে মায়ের জাতি নাম দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল,—কিন্তু মেয়েরা ধরে ফেলেছে এই চাতুরী। আজ তারা প্রকাশ্যে পৈত্রিক সম্পত্তির দাবী জানাচ্ছে আইন সভায় এবং গোপনে জন্ম শাসনের বিবিধ বিজ্ঞাপন পরীক্ষা করছে। একদা বাঙ্গালা দেশের পুরুষ সাহিত্যিকরা পর্য্যন্ত সাহিত্যেও এই চাতুরীর খেলা খেলেছিল। স্ত্রীলোক

যেখানেই মাতৃত্বকে বরণ করেছে, পুরুষের হাতে মার খেয়েও যেখানে সে প্রেমের নামে পায়ের তলায় ভেঙে পড়েছে, যেখানেই সে স্বাধীন ভাবে পুরুষকেই আশ্রয় করতে চেয়েছে—সেইখানেই গ্রন্থকার পেয়েছেন হাততালি। কঙ্কর ভাবতে লাগলো, বাহাদুর বটে। শেষকালে পুরুষের দাসীত্ব স্বীকার করা, অথবা পুরুষকে দিয়ে দাসত্ব স্বীকার করানো,—প্রচলনকে এই যে মানিয়ে চালাবার একটা পৌরাণিক প্রচেষ্টা এর থেকে বাঙ্গলা দেশ মুক্তি পেলো না।

কঙ্কর যে সাহিত্যিক হ'তে পারলো না তার জন্য দেবী ভারতীকে ধন্যবাদ। যিনি সাহিত্য ও চারুকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি একজন কুমারী বারাঙ্গনা। সাহিত্যিক না হলেও কঙ্কর জানে, এ তত্ত্বের একমাত্র অর্থ এই যে, বহু জনকে রসবোধের আনন্দ পরিবেশন করার ভার যাঁর উপর, তাঁকে কেবল মাত্র সতী নারী হয়ে থাকলে চলে না, তিনি হবেন সর্বসাধারণের। যিনি দশভূজা শ্রীদুর্গা তিনি যেই হোন্—তাঁর জাত নেই, কারণ তিনি সর্বজাতির রক্ষাকর্ত্রী। কল্যাণের আয়োজন যেখানে বড়, সেখানে চরিত্র ও জাত্যাভিমানের প্রশ্ন নেই। মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির কোনো যৌনশুচিতা নেই। যিনি স্বয়ং গ্রন্থকার, তাঁর জন্মবৃত্তান্ত নীতিবিগর্হিত। পঞ্চপাণ্ডব, কর্ণ, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, ঘটোৎকচ, শ্রীকৃষ্ণ, এঁদের ইতিহাস কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? এই যে কঙ্করের অকৃত্রিম ... শ্রীমতী মীনাক্ষী—ইনি দ্রৌপদীর অপেক্ষা কোন্ অংশে কম? তিনিও রাঁধতে জানতেন ভালো, সুযোগ্য ধনুর্ধরকে তিনিও মাল্যদান করতে প্রস্তুত; তিনিও পুরুষের মত পুরুষ পেলে বনগমন করতে পারেন; তাঁর সমাজতন্ত্র, রাজনৈতিক ও সংশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতাবলী দ্রৌপদীর বক্তৃতার অপেক্ষা কম উত্তপ্ত নয়; বাংলা দেশে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা হ'লে তিনিও অসংখ্য সন্তানের জন্মদান করতে প্রস্তুত এবং বীর্যবান্ যুবক যদি বাঙ্গলা দেশে থাকে তবে মাত্র পাঁচজন কেন, মীনাক্ষী দেবী পঁচিশ জনের উৎপাত সহ্য করতে পারেন। তফাৎ এই, পৌরাণিক যুগে নারীর লজ্জা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা

হোতো, বৃদ্ধগণ পর্যন্ত সেই চাক্ষুষ দৃশ্য উপভোগ করতেন, কিন্তু আধুনিক মীনাক্ষীদের কালে সেই সুযোগটা নেই,—আজকের দিনে দুঃশাসনরা কেবল প্রেমপত্রের আকারে সতীগণের নিকট কুপ্রস্তাব জানায়। আসল কথাটা এই, মীনাক্ষীর পুরুষ-প্রীতি দ্রৌপদীর অপেক্ষা এতটুকুও কম নয়।

## তিন

এ প্রস্তাবনার পরে গল্পের আসর।

ঘটনার দিন দেখা গেল কল্‌কাতার এক চৌমাথায় কঙ্কর দাঁড়িয়ে, চোখে মুখে প্রতীক্ষার উদ্বেগ। বেলা দুটো। বাড়ীঘর সে হাতছাড়া করেছে, শারীরিক নিয়ম পালনের দৈনন্দিন তালিকাটা সে নষ্ট করেছে, অস্থাবর জিনিষ পত্র অনেকগুলো গেছে চোরাবাজারের দোকানে দোকানে। বেশ একটা অদ্ভুত বেকার জীবন। প্রাণধারণের গার্হস্থ্য উপকরণগুলো মানুষের অজ্ঞাতেই যেন তাকে শৃঙ্খলিত করে—সেই উপদ্রব কঙ্করের আর নাই। বেশ নিশ্চিন্ত জীবন। ইচ্ছাটাকে বেপরোয়া ছোটানো যায়, বাধা দেবার কিছু নেই, পিছনে প'ড়ে থাকবার আকর্ষণ নেই। অনেক আধুনিক পিছনে তাকায় না বটে কিন্তু পিছনই তাকে পিছন থেকে টানতে থাকে। এই ধরো, মাতৃস্নেহটা বাঘিনীরও আছে, বাঘিনীও হৃতবৎসা হ'য়ে কাঁদে, সন্তান বিপন্ন হ'লে সেও চীৎকার করে। সোজা কথা—প্রকৃতি বিজ্ঞান। আর প্রেম? সব জন্তুরই আছে সঙ্গমঋতু, বৎসরের বাকি সময়টা তারা সংযম পালন করে। সংযম নেই কেবল মানুষের, কোন ঋতুই তারা বাদ দেয় না—সমাজপতিরাও নয়, সুনীতি-সঙ্ঘের আচার্যগণও নন্। আর যেটা প্রেমের অর্থ সেটা মনোহর কল্পনা, চন্দ্রযোগে কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতি,

অথবা কিছুটা আধ্যাত্মিক রং চড়িয়ে তাকে মানুষের হৃদয়াবেগের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দেওয়া; এর চেয়ে যদি বেশী কিছু প্রকাশ পায় তবে হয় সেই পাগলের স্থান গারদে, নয়ত পুলিশের ফাঁড়িতে। সোজা কথা,—আকর্ষণ। ওরা যখন প্রেমে মশগুল প্রকৃতি তখন আপন কাজ করিয়ে নিচ্ছে অজ্ঞাতে,—যা খুশি ওরা প্রলাপ বলুক, জীবসৃষ্টি রক্ষা হোলেই হোলো। অস্ত্র তন্ত্রের কোন্ রহস্যে, শিরা-উপশিরার কোন্ এক অদ্ভুত চক্রান্তে পরস্পরের ভিতরে যন্ত্রের এক ঝঞ্ঝনা, সর্বপ্লাবী একটা আন্দোলন। প্রকৃতির গুণে মেয়েটি অঙ্গীকৃত হোলো, আর সেই প্রকৃতিরই গুণে পুরুষটির ভিতরে এলো অধিকতর আবেগ, প্রয়োগ করলো পৌরুষ। একে প্রেম বলো ক্ষতি নেই। একে লালসা বলো নিন্দা করব না। শুধু এই কথাটা কঙ্কর জানতে পেরেছে যে, পাশবিকতার প্রতিযোগিতায় মানুষ পশুকে চিরকাল হার মানিয়েছে; মানুষের মন আর বুদ্ধি তার পাশবিকতাকে সাহায্য করেছে অসংযমের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবার জন্য।

এই পাশবিক জীবনটাকে অতিক্রম করতে হবে। কঙ্কর ভাবলে, ঘর খোলা থাকলেই ঘরের টান, উপকরণ থাকলেই [illegible] কন্দ্র কোথাও নেই, সেইজন্য চিন্তা নির্লিপ্ত, বাঁচাটা নিরুদ্বেগ। সন্ন্যাসী নয়, কারণ তারা সংসার-পরিত্যক্ত, কিন্তু এ একরূপ দুর্দান্ত সম্ভোগ, সমগ্র মানব সংসারকে নিয়ে ভীষণ একটা জুয়া খেলা।

মোটরের হর্ণ-এর আওয়াজে তার চমক ভাঙলো। পথের ওপারে দেখা গেল, গাড়ীর ভিতর থেকে মীনাক্ষী হাত নাড়া দিয়ে তাকে ডাকছে। খররৌদ্র মাথার উপরে, লোকারণ্য রাজপথ, যান বাহনের অবিশ্রান্ত জটলা—এই নির্জনেই অন্তরঙ্গ মানুষের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগ। জনমানব নেই,—কলকাতার এমন কোনো বাগানে বড় বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা'ছাড়া জনতা বড় উদাসীন, আগ্রহহীন। কঙ্কর রাস্তা পার হয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মীনাক্ষী বললে, গাড়ীতে উঠে এসো আগে।

কঙ্কর বললে, মাথায় সিঁদুর কেন তোমার ?

চিরকাল কি আইবুড়ো থাকতে বলো ?

না, কিন্তু এই আট দিনের মধ্যেই—মানে, শেষ চিঠিতে আমায় ত' কিছু জানাওনি ?

মীনাক্ষী তার হাতখানা ধরে গাড়ীর ভিতরে তুলে নিল ! বললে, তোমাকে মানুষ ব'লে মনে করিনি। এই, চালাও।

কঙ্কর বললে, তোমার গায়ে এখনো বাসিফুলের সমারোহের গন্ধ। ব্যাপারখানা কি ?

মীনাক্ষী বললে, গা না শুঁকেই গায়ের গন্ধ ? ভয় নেই, বিয়ে যদি বা হয়ে থাকে এখনো বিয়ের জল পাইনি।

গাড়ীর গতির দিকে তাকিয়ে কঙ্কর বললে, চলেছ কোন দিকে ?

হাওড়া স্টেশনে।

কেন ?

আঃ—মীনাক্ষী[illegible]বল কৌতূহল ! যাবো চুলোয়, 'হনি মুনে'।

হনি মুনে ? কা'র [illegible] ?

মীনাক্ষী রাগ ক'রে বললে, হনি মুনে যাবার মতনও কি একটি ছেলেকে পাওয়া যায় না বাঙ্গলা দেশে ?

কঙ্কর হেসে বললে, যায় বৈ কি, আমরাই কি আর এত সামান্য ?

পোড়া কপাল আর কি !

কঙ্কর বললে, মীনাক্ষী, কত দিন পরে আমাদের আবার দেখা ! তোমার কিন্তু বেশ চেহারা হয়েছে।

বটে !—মীনাক্ষী বললে, সাড়ে তিন মাসেই তোমার এত বদল ?

উত্তরে কঙ্কর বললে, তিন মাস আগে রংপুর স্টেশনে সেই আমাদের গোপন সাক্ষাৎ—মানে মিলন হয়েছিল। তুমি তখন সবেমাত্র ব্রহ্মচর্য আরম্ভ করেছ,—

করবেন, আর কিছু দেরীতে, এখনো ঠিক সেই পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে জমে নি। অতিশয় সাধ্বী মেয়ে।

জুয়া খেলেন কেন?

একটু অনমনস্ক হবার জন্য। স্বামীটীর জন্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে, অর্থাৎ ভদ্রলোকটি বহুপ্রেমিক, সেইজন্য মহিলাটি মনোবেদনায় উদাসীন। কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যবহারে এবং মধুর আতিথেয়তায় সকলেই পরিতুষ্ট। তোমাকে দেখলে তিনি লুফে নেবেন।

কেন বলো ত? আমার যেন সন্দেহ হচ্ছে।

কঙ্কর বললে, অতি অন্যায় সন্দেহ, তিনি সৎসঙ্গ ও সদালাপের অতিশয় অনুরাগী। একান্ত ধার্মিকা তিনি, সেইজন্য বহু তরুণী তাঁর অনুগত। অনেক মেয়েই শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। মেয়েদের হিষ্টিরিয়া, মাথাধরা, অগ্নি-মান্দ্য, কার্যে অনিচ্ছা, এবং কবিতাপনা প্রভৃতি ব্যাধি তাঁর ওখানে যাতায়াত করলে অতি শীঘ্র নিরাময় হয়। তাঁর আশ্রয়টি তরুণীদের তীর্থ।

মীনাক্ষী উৎসাহিত হ'য়ে বললে, শুনে ভক্তি হচ্ছে, এই সব মহিলাই দেশ-নেত্রী হবার যোগ্য। তাঁর বয়স কত? চল্লিশের বেশী না কম?

কঙ্কর বললে, মানে?

মানে, তোমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ত' জানা দরকার!

ওঃ তাই বলো, ভুলে গিয়েছিলাম যে তুমিও মেয়েমানুষ। ঠিক বলতে পারিনে, পুরুষের চোখে যে-মেয়ের বয়স কুড়ি, মেয়েমানুষ তাকে দেখে বল্‌বে পঁচিশ। চলো, গিয়ে দেখতেই পাবে।

মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, চেহারা কেমন? সাবধান, আমার সঙ্গে যেন তুলনা করো না।

কঙ্কর বললে, তুমি অতুলনীয়, তিনি অসাধারণ।

তাঁর স্বামী কোথায় ?

তিনি কখনো স্বর্গে থাকেন, অপ্সরাগণ নৃত্যগীতাদিতে তাঁর মনোরঞ্জন করেন; অর্থের সন্ধানে প্রায়ই মর্ত্যে অবতীর্ণ হন, তৎপর সুরাসমুদ্রপথে পাতালে নেমে যান্—তাঁর অগম্য কোথাও নেই।

খাঁটি পুরুষ, সহজেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। কিন্তু স্ত্রীর ইহকাল পরকাল ?

স্বাধীন জেনানা, অসুবিধা কিছু নেই। এমন স্বপ্রতিষ্ঠ মহিলা বঙ্গদেশে দুর্লভ। তাঁর স্নেহের জাতিবিচার নেই। তাঁর আদর্শ নিয়েই হরিজন আন্দোলনের সৃষ্টি।

বৌবাজারের পাড়ায় এক ঠিকানা আবিষ্কার ক'রে কঙ্কর গাড়ী থামালো। অদূরে পথের বাঁকে দেখা গেল বাড়ীটা প্রকাণ্ড। পল্লীটি বেশ সম্ভ্রান্ত। আশে পাশে দেশী সাহেব পল্লীর আভাস পাওয়া যায়। মীনাক্ষী খুশী হয়ে বললে, একেবারে রাজবাড়ীতে এনে হাজির করলে যে ? তুমি সত্যি বাহাদুর ছেলে !

কঙ্কর গাড়ী থেকে নেমে গিয়ে দরজায় মৃদু আঘাত করলো। ভিতরে অস্ফুট আলাপ শোনা যাচ্ছিল, সম্ভবত আগন্তুকের আওয়াজেই সেটা থেমে গেল। কঙ্কর পুনরায় কড়া নাড়লো। মিনিট দুই প্রতীক্ষার পর দরজা খুলে এক বেয়ারা দেখা দিল।

কঙ্কর বললে মিসেস রয় আছেন ?

সে বললে, কি দরকার ?

দরকার আছে বৈ কি, ডাকো একবার, আমি চেনা লোক।

বেয়ারা তার অপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে বললে, না, তিনি বাড়ী নেই।

কঙ্কর হাসলো। বললে, খুশী হলুম, তুমি বেশ কাজের লোক। যখন তিনি সত্যিই থাকেন তখনই নেই বলতে হয়।—এই ব'লে সে একটি টাকা বেয়ারার হাতে গুঁজে দিল। বললে যাও, খবর দাও। বলো যে, অরেঞ্জ উইলিয়ম্‌স্ এসেছে।
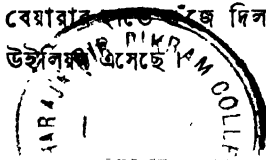
বেয়ারা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হোলো। কিন্তু মাত্র একটি মুহূর্ত, তারপরেই একখানি স্ত্রী-মুখমণ্ডল দরজার ফাঁকে প্রকাশিত হোলো—মুখে হাসির রেখা। সন্ধানী লোক সন্দেহ করতে পারে, তিনি এতক্ষণ দরজার পাশেই আত্মগোপন করেছিলেন। উভয়ে নমস্কার বিনিময় হোলো। কঙ্কর বললে, বেয়ারাটা বেয়াড়া নয়, ঘুষ দেবার সঙ্কেতটা শিখেছে। না শেখা থাকলে দরজায় পাঁচটা টোকা দিলেই আপনি অবশ্য চিনতে পারতেন।

মহিলা তাঁর অপরূপ গুঞ্জনকরা হাসি হেসে বললেন, অরেঞ্জ উইলিয়ম্, ভেতরে আসুন।

কঙ্কর বললে, সঙ্গে লোক আছে কিন্তু।

কে?—ব'লে ভয়ার্ত মুখে মিসেস রয় কঙ্করের মুখের উপরেই দরজা বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা করলেন, বললেন, না না, আমার এখানে আসতে দেবো না, আপনারা যান্।

ভয় নেই, আমার একটি মেয়ে বন্ধু।

ওঃ।—মিসেস রয় তৎক্ষণাৎ সাদর হাসিমুখে বললেন,আসুন, আসুন আমার সৌভাগ্য। না না, ভয় আমি পাইনি, ও কিছু না।

কঙ্কর গিয়ে ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে মীনাক্ষীকে নামিয়ে আনলো। মিসেস রয় হাত বাড়িয়ে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, কত শুনেছি তোমার নাম তোমার বন্ধুর মুখে। বাঃ কী সুন্দর তুমি। কী সৌভাগ্য আজ আমার।

আমারও সৌভাগ্য, মিসেস রয়। নতুন অভিজ্ঞতা। আপনার নির্ভুল পরিচয় আগেই পেয়েছি। আপনার অরেঞ্জ উইলিয়ম্ আমাকে নতুন বাজি জিতে এনেছেন।—মীনাক্ষী ভিতরে ঢুকে বলতে লাগলো, আমি সেই দলের মেয়ে যারা পুরুষ মানুষকে প্রশ্রয় দিয়ে তার নির্বুদ্ধিতাকে ভাঙিয়ে খায়। বাঃ কী চমৎকার আপনার ঘর। চেয়ারগুলো বসবার চেয়ে শোবার বেশি উপযুক্ত।

কিন্তু বেয়ারাকে ঘুষ দিয়ে আপনার দর্শন পাবার তাৎপর্য কি বলুন ত, মিসেস রয় ?

মিসেস রয়ের মুখে অতি অমায়িক সরল ও মধুর হাসি। তবে শেষ কথাটায় তাঁর-যেন একটু চাঞ্চল্য ঘটলো। তিনি তাকালেন কঙ্করের প্রতি কিছু বিপন্নমুখে। কঙ্কর বললে, তুমি দেখছি পাঁচ মিনিটেই সব খবর জানতে চাও। কল্‌কাতার জীবনরহস্য তোমার কল্পনার চেয়ে অনেক গভীর।

গলা পরিষ্কার ক'রে মিসেস রয় বললেন, কঙ্করবাবুর কথায় রহস্যই থেকে গেল। কিন্তু কিছু নয়। একা মেয়েছেলে এক পাশে থাকি তাই অনেকে উৎপাত করে। এই দেখো না, ক'দিন থেকে মাঝে মাঝে পুলিশের লোক গোয়েন্দাগিরি করতে আসে।

মীনাক্ষী বললে, ওঃ এইবার বুঝলুম। আচ্ছা, মোটরে ব'সে দেখলুম একজন সাহেব ছিলেন আপনার ঘরে তিনি কোথায় গেলেন ?

সাহেব নয়, সাহেব নয়,—হাঃ হাঃ হাঃ, আমার দূর সম্পর্কের বোনপো, স্থরেশ চৌধ্রি, বিলেত ফেরতা। ওর ছোট বোনকে এনেছিল সঙ্গে।—মিসেস রয় কঙ্করের দিকে কটাক্ষে চেয়ে হেসে খুন হয়ে গেলেন।

ইঙ্গবঙ্গ ফ্যাশনে ঘর দোর সাজানো। ঘরের বাইরে পরদার পাশ দিয়ে দেখা গেল দুই জন বাবুর্চি উঁচু উনুনে কি যেন রান্নার কাজে ব্যস্ত। বেলা বোধ হয় চারটে বাজে। একজন বেয়ারা এসে প্রশ্ন করলো, চা দেবো মা ?

আনো।—মিসেস রয় বললেন।

মীনাক্ষী ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বললে, ভালো ভালো ছবি টাঙানো আপনার ঘরে, প্রথমেই আমি আপনার রুচির প্রশংসা করছি মিসেস—

মিসেস রয় বললেন, ভগবানের ইচ্ছেয় কল্‌কাতার বিখ্যাত শিল্পিরা এখানে পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। এই যে, এই আলমারীতে রবিঠাকুরের প্রায় সব বই-ই পাবে।

মীনাক্ষী বললে, রবির কিরণ সর্বত্র, তাঁর বই না থাকা মানে অন্ধকারে বাস করা।—তা ছাড়া ওটা ফ্যাশনও বটে।—এই ব'লে সবাই বসলেন।

কিন্তু তাই ব'লে তরুণ সাহিত্যিকদের কোনো বই আমার এখানে পাবে না। ওদের সাহিত্যের দৌড় হেদোর মোড় থেকে কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত। বিয়ে হবার পর ওদের সাহিত্য আর কেউ পড়ে না।

কি আছে বলুন ত ওদের লেখায় ?

বয়স হয়েছে, ওদের নিয়ে আলোচনা করতে লজ্জা পাই। বড় বেশি তীব্র লেখে ওরা। ওরা সময় দিতে চায় না, প্রস্তুত হবার সময় দেয় না, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চায়। এই ধরো আমি ওদের বই যে পড়িনি তা নয়, প্রায়ই পড়ি, কিন্তু আর কাউকে পড়তে দিই নে। ওরা যেন সব বিশ্বাসের ভিত্ত ভেঙে দেয়।—মিসেস রয় বলতে লাগলেন, মেয়েদের সতীত্বকে ওরা বিজ্ঞানের ছাঁচে ফেলে গবেষণা করতে থাকে। ওরা মা বাপকেও খাতির ক'রে চলে না —এই যে চা এনেছে, আমি হাতে ক'রে তোমাদের খাবার এনে দিই।

মিসেস রয় বেরিয়ে গেলেন। বেয়ারার উপস্থিতিতে ইংরেজিতে দু'জনে আলাপ শুরু হোলো।

কঙ্কর বললে, কেমন লাগছে ?

মীনাক্ষী জবাব দিল, ইন্‌টরেস্টিং! বয়স চল্লিশের নিশ্চয় বেশি।

নিশ্চয় পঞ্চাশের বেশি নয়। দেখলে,কেমন চমৎকার সাহিত্য সমালোচনা.

মীনাক্ষী বললে, তরুণ সাহিত্যিকদের ওপর কী ভীষণ রাগ! বোধ হ তাদের লেখায় ওঁর প্রকৃতি ধরা পড়ে। এই বয়সেও পাতা কেটে চুল বাঁ মুখে টয়লেট, পায়ে হাল ফ্যাশনের স্যাণ্ডাল্, ঘাঘরার ঢঙের শাড়ী পরা—

কঙ্কর বললে, তোমার মনে বড় পাপ!

না, না—পুরুষ ভোলাবার জন্য সাজসজ্জা নয়, নিজেকে মধুর ক'রে তো আয়োজন।

সে প্রবৃত্তি কা'র না আছে? তোমার নেই?

সকলেরই আছে মানলুম। কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়সের ভদ্রমহিলার সাজ-সজ্জায় যদি আদিরসের সঙ্কেত থাকে, আর মুখে যদি তিনি তরুণদের মস্তক চর্বণ করেন তবে সেইটিই সকলের বড় দুর্নীতি।

কঙ্কর বললে, তুমি তরুণ সাহিত্যিকদের গাল্ দাও কেন?

গাল্ ত দিই নি, পরিহাস করি।

কেন করো?

মীনাক্ষী হাত বাড়িয়ে কঙ্করের নাকের ডগাটা দুই আঙুলে চিম্‌টে বললে, তারা আমার ছোট ভাইয়ের মতন, তাদের আমি ভালবাসি।

বেশ, বেশ, বেশ, খুব খুশী হলুম—এই ত' চাই—বলতে বলতে হাসিমুখে মসেস রয় পুনরায় ঘরে ঢুকলেন।

কঙ্কর বললে, দেখুন একবার মীনাক্ষীর কাণ্ডটা। কথায় কথায় ওর হাত ঠে। মেয়েদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করব—বাঙলা দেশে এখনো এমন াইন তৈরী হোলো না।

মিসেস রয় বললেন, আইন হলেও উপায় নেই কঙ্কর, মেয়েরা চিরদিনই ামাদের নাকের ডগা ধ'রে চালাবে।—আরে, এই যে সুনয়নী, এসো, এসো—জ এত সকাল সকাল যে? আচ্ছা, শুনবো পরে। কই, স্বামীটিকে কোথায় ়খে এলে?

একটি মেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, আমাকে পৌঁছে দিয়ে তিনি 'লে গেলেন। সিনেমার ফেরৎ নিয়ে যাবেন।

মিসেস রয় বললেন, ভালো করেছ,—আজকালকার সিনেমায় গল্পের চেয়ে ভ্যতাই বেশী—স্ত্রীর সঙ্গে ব'সে দেখতেও লজ্জা করে। বাস্তবিক, এই াসাবিত্রীর দেশ থেকে সিনেমা আর তরুণ সাহিত্য কবে যে নির্বাসিত হবে ভাবছি। বসো সুনয়নী, এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই সেই

কঙ্কর যাঁর কথা সেদিন হচ্ছিল—বাপের শ্রাদ্ধের মন্ত্রের বদলে রবিঠাকুরে 'মরণ' কবিতাটি প'ড়ে দিল, আর মাথা ন্যাড়া না ক'রে ব'লে দিল, আমাদে পারিবারিক শাস্ত্রে মস্তকমুণ্ডন নিষেধ। আর ইনি মীনাক্ষী দেবী এম-এ ইনি তরুণ সাহিত্যিকদের একজন আদর্শ নায়িকার যোগ্য—সত্যবাদিনী, প্রি ভাষিণী, চরিত্রবতী। এই যে, চা খাও। মীনাক্ষীকেই বলি, এই মেয়েটিকে দেখছ ভাই, এ মেয়েটি ফোর্থ্ ইয়ারে পড়ে, চমৎকার রান্না, সেলা শিল্প—অথচ এরই মধ্যে ঘড়ির কাঁটা ধ'রে স্বামীর অফিসের ভাত রেঁধে দেয় তারপরে ধরো ইংরেজি অনার্সের পড়াশুনো—দায়, ধাক্কা, অভাব অভিযোগ-সমস্তই মাথা পেতে নিয়ে আছে। একেই বল্‌ব আধুনিক মেয়ে, একে বল্‌ব লক্ষ্মী মেয়ে।

মীনাক্ষী বললে, সিনেমা আপনার ভালো লাগে না?

সুনয়নী বললে, ভালো হ'লে ভালো লাগে বৈ কি।

ভালো মন্দর বিচার কি আপনিই করেন?

কঙ্কর বললে, তিন জন স্ত্রীলোক উপস্থিত, এর মাঝখানে আমার মতা কিছুই নেই। তবে এই কথাটা জানিয়ে রাখি, মেয়েরা চল্‌তি নীতির ক্রীতদা তাদের মুখে আর্টের বিচার বেমানান। কেবল এই কথাটা বলুন সহজবোধ্য প্রণয়কাহিনী,—যার উপরভাগে অসভ্যতা নেই অথচ তলার চাপা অশ্লীলতার ইঙ্গিত আছে—এমন গল্পই আপনাদের প্রিয়।

সুনয়নী বললে, আমাদের কি আর কিছু প্রিয় হ'তে পারে না, কঙ্করবাঃ

পারে বৈ কি। যথা ঠাকুর দেবতার অসভ্যতা, রামসীতার খেলো জল, সতীনের ঈর্ষা, সখীর চোখ মচ্‌কানো নাচ, নাট্যকারের ভাঁড়ামি, সন্নঃ ভেলকি—আর নায়িকার মুখে দুটো সমাজবিদ্রোহের চল্‌তি বুলি।

মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, আর একটা বাদ পড়লো। বার দুই 'মা'

াতস্বরে চীৎকার।—এই ব'লে সে উঠে দাঁড়ালো। পুনরায় বললে, আপনারা াবাদ করুন আমি ততক্ষণ একটু ভোল ফিরিয়ে আসি।

মিসেস রয় গলা বাড়িয়ে বললেন, ওহে যোগেন্দ্র, দিদিমণিকে স্নানের ঘরটা াখিয়ে দাও। সুনয়নী, তুমি একটু বিশ্রাম করো, আমি কঙ্করের সঙ্গে এই— 'চার মিনিট—।

সুনয়নী উঠে পাশের ঘরে চ'লে গেল। তখন প্রায় সন্ধ্যা। মীনাক্ষী ানের ঘরে ঢুকে গুন গুন ক'রে গান ধরেছে। মিসেস রয় বাথরুমের দিকে ঙ্গত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললেন, কে ওটি?

চাপা গলায় সহাস্যে কঙ্কর বললে, ওটি মানবী, ষড়রিপুর দাসী।

ভ্রূ তুলে চোখ বুজে মিসেস রয় হাসলেন।

ম কটা অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে ঘরের এতক্ষণকার সকল কথা, সকল ...াচনা, সকল কেতাদুরস্ত সভ্যতা সমস্তই যেন ডুবে গেল। মিসেস রয় াসের ভিতর থেকে সিগারেটের প্যাকেট্ ব'ার করলেন। তারপর একটা ারেট্ কঙ্করের হাতে দিয়ে ও নিজে একটা ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, আনলে থেকে?

ঙ্কর বললে, উনি নিজেই এসেছেন। ওঁর চলবার পা ও চালাবার বুদ্ধি আনার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বাস করিনে।—মিসেস রয় সিগারেটে পুনরায় টান দিয়ে বললেন, ার কমিশন কত?

ঙ্কর হেসে বললে, গায়ে গায়ে শোধ!

! আচ্ছা, এইবার বলো, সুনয়নীকে কেমন লাগলো! তোমার জন্যই নালুম যোগেনকে পাঠিয়ে, তা জানো ত?

ার বললে, ধন্যবাদ। আরো দুদিন আপনি এই চেষ্টা করেছিলেন। পরোপকারের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার জয় হোক।

ঘটকালিতে স্বয়ং প্রজাপতিও আপনার কাছে হার মানবেন। তারপর গলা নামিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে সে বললে, কত টাকা লাগবে আপনার প্রণামী ?

এমন সময় দরজায় খুট্ ক'রে শব্দ হোলো। মিসেস রয় নীরবে পা টিপে উঠে কঙ্করের হাত ধ'রে তুললেন। দ্রুত ফিস ফিস ক'রে বললেন, যাও, সুনয়নী একলা আছে। বেশী নয়, দশটা টাকা দিয়ো, আর চাকরের বক্‌শিস। যাও শিগগির, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ো।

কঙ্কর চ'লে গেল পাশের ঘরে। এদিকে তখন মিসেস রয় বাইরের দরজায় গিয়ে কান পাতলেন। টক্-টক্-টক্, তিনটে টোকার শব্দ পেয়ে তিনি মুখে হাসির রেখা টেনে দরজা খুলে মুখ বাড়ালেন। আগন্তুক সাহেবী পোষাকপরা বাঙালী যুবক। মৃদুকণ্ঠে উভয়ে ইসারায় অভিনন্দন জানালেন। মিসেস রয় বললেন, এসো। A good sport for you.

যুবক ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, কোথায় ?

আজ কিন্তু সুনয়নী আসেনি।

জড়িতকণ্ঠে যুবক বললে, আনানো যায় না ? ভারী আশা ছিল যে—

মিসেস রয় বললেন, অপেক্ষা করো, ক্ষতিপূরণ ক'রে দেবো। একি, পেটে যে হুইস্কি পড়েছে ? জনি ওয়াকার, না হোয়াইট লেবেল্ ?

দুই-ই। কই, আনুন আপনার ক্ষতিপূরণ ? swear by God, fifteen in my pocket.

মিসেস রয় হাত পেতে বললেন, Advance please.

পনেরটি টাকা যুবকটি বা'র ক'রে দিল। পরে হেসে সে গানের একটা ধুয়ো ধরলো, 'am engineer, engine-ye-near! Tra-la-la-la......

মিসেস রয় পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতেই মীনাক্ষীর মুখোমুখী হলেন। মীনাক্ষী বললে, কঙ্কর কোথায়, মিসেস রয় ?

ওঃ—কঙ্কর ? সুনয়নীর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছে রাস্তায়, এখুনি আসবে।

একটু এসো ত মীনাক্ষী এঘরে,—এই যে, এ আমার ভাসুর পো, মিষ্টার ডাট, আলাপ করো, বেশ ছেলে! ডাট্, এর নাম মীনাক্ষী—দেখ দেখি, বন্ধুত্ব করতে পারো কিনা? আমি একটু যাচ্ছি চারতলায়, একটা ডেলিভারি কেস রয়েছে। ঘণ্টাখানেক,—হ্যাঁ, এর মধ্যেই—।

*

* *

এ ঘরে সোফায় ব'সে রয়েছে সুনয়নী। সামনে কঙ্কর দাঁড়িয়ে। ঘরের চতুর্দিক বন্ধ।

কঙ্কর প্রশ্ন করলো, বলো সত্যি ক'রে তোমার বিয়ে হয়েছিল? বিয়ের দাম আমার কাছে এক কড়াও নয়, আমি কেবল জানতে চাইছি মাত্র।

সুনয়নী সভয়ে স্বীকার করলো, না, হয়নি।

তুমি কলেজে পড়ো?

না।

বন্ধ দরজার বাহিরে কিসের একটা শব্দ হোলো। তারপরই চুপচাপ। কঙ্কর সেইদিকে চেয়ে বললে, তোমার নাম কি? সত্যি বলো? বলো, দেরী ক'রো না—

সুনয়নী বললে, লাবণ্য।

বাড়ীতে কে কে আছে? বলো—লজ্জা করো না—

মা, বিধবা বৌদি, দুটি ছোট ভাই বোন;—আঃ এত আপনার প্রশ্ন কেন? আসুন? আমাকে বুঝি ফিরে যেতে হবে না?—এই ব'লে সে কঙ্করের হাত ধ'রে টানলো।

কঙ্কর তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিল। তারপর বললে, মিসেস রয়কে জানতুম, কিন্তু এতটা জানা ছিল না। শোনো, একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি দশ টাকা দেবো মিসেস রয়কে, তুমি কত পাবে তার মধ্যে?

দু'টাকা।

দু'টাকা! মাত্র? আচ্ছা, এই নাও তোমাকে দশ টাকাই দিলুম।—কঙ্কর তার হাতে একখানা নোট গুঁজে দিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলো, তোমাদের আর্থিক অবস্থা কেমন, লাবণ্য?

কৃতজ্ঞতায় এইবার সহসা সুনয়নীর দুই বড় বড় চোখে জল ভ'রে এলো। বললে, খুব গরীব আমরা আমাকেই সংসার চালাতে হয়। আপনি এত কেন দিচ্ছেন?

কঙ্কর হেসে জবাব দিল, এই প্রথম আর এই শেষ দেওয়া, সেই কারণে। এটা যদি নাটক হোতো তবে বলতুম, ছোটবোনকে এমনি ক'রে নিঃস্বার্থভাবেই দিতে হয়,—কিন্তু এটা গল্প। যাও, রাত হয়েছে, বাড়ী চ'লে যাও, এর পর যেতে তোমার কষ্ট হবে। এই পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। মিসেস রয়ের সঙ্গে আটটা টাকার ব্যবস্থা আমি ক'রে যাবো, তোমার চিন্তা নেই।

দরজা খুলে কঙ্কর বাইরে এসে দাঁড়ালো। দেখা গেল এঘরে অর্ধশায়িত এক সাহেবী পোষাক পরা যুবকের দিকে চেয়ে মীনাক্ষী হাসছে।

কঙ্কর কাছে এসে চুপি চুপি প্রশ্ন করলো, এটি আবার কে? Your latest?

মীনাক্ষী বললে, হ্যাঁ, আমার মালঞ্চের নব মালাকর।

প'ড়ে আছেন কেন?

দশপ্রহরণধারিণীর শাস্তিতে অসুর নিপাত।

বেঁচে আছেন ত?

দেখি দাঁড়াও।—এই ব'লে উঠে মীনাক্ষী তার স্যাণ্ডালপরা সুন্দর একখানি পা তুলে মিস্টার ডাটের থুৎনী নেড়ে দিয়ে পা নামিয়ে নিল। তারপর হেসে বললে, পনেরো টাকার প্রেম এর বেশি হয় না। চলো, প্রার্থনা করি, মিসেস রয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, এবার আমরা এগোই।

দুজনে রাস্তায় নেমে এলো। রাত তখন প্রায় ন'টা। কঙ্কর প্রশ্ন করলো, ব্যাপার কি বলো ত?

মীনাক্ষী বললে, ব্যাপার হচ্ছে আমরা একটা ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেছিলুম। মোটর থেকে নেমেই বুঝতে পেরেছিলুম জায়গাটা বেয়াড়া। কলঘরের ফাঁক দিয়ে সবটা দেখলুম। মিসেস রয়ের সিগারেট্ খাওয়া, সুনয়নীর ঘরে তোমার যাওয়া, মাতালের হাতে আমাকে জমা দিয়ে পালানো। বেচারি মিষ্টার ভাট্, আমার হাতের ঠেলা খেয়ে কপাল ফুটো হয়ে রক্তারক্তি।

কঙ্কর বললে, সর্বনাশ, তুমি খুন ক'রে এলে?

মরেনি, অজ্ঞান হয়ে আছে।

খুনের দায়ে যদি পুলিশে ধরে?

তা'তে খুশী হবো। কাগজে কাগজে ছবি আর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, হিন্দুসভা থেকে অভিনন্দন,—আর ওই লোকটার দেহের যথাস্থানে হবে বেত্রাঘাত। একদিনেই নেত্রীস্থানীয়া।—মীনাক্ষী বলতে লাগলো, তারপর তোমার সুনয়নী কি বললেন?

কঙ্কর বললে, বললে তার নাম সুনয়নী নয়।

খুবই স্বাভাবিক। জীবনটাকে উল্‌টে দিতে পারে আর নামটা পাল্‌টাতে পারে না? লাবণ্য কি বললে?

তুমি কি ক'রে জানলে ওর নাম?

ওর বাঁ-হাতের আংটিতে লাবণ্য লেখা ছিল। ভদ্রঘরের মেয়ে, আমি দেখে নিয়েছি।

ওটাও কি গায়ে লেখা ছিল?

হ্যাঁ, ভদ্রঘরের মেয়ের চেহারায় নানা আলোছায়া কিন্তু পতিতার চেহারা চিরকাল সব দেশেই এক রকম।

আর ভদ্রঘরের পতিতারা?

সেও ত' দেখে এলে মিসেস রয়কে। চলো, চলো, ওদের কথায় আর কাজ নেই। বলো, কোন্ দিকে যেতে চাও।

কঙ্কর বললে, চলো হাবড়া স্টেশনে।

চলো।

একখানা ফীটন্ গাড়ীতে দু'জনে চ'ড়ে বসলো। কঙ্কর বললে, হিন্দু মুসলমানের মিল কখন্ হয় জানো? রাত্রে! চৌরঙ্গীর মোড়ে, ধর্মতলার ফিরিঙ্গিপাড়ায়, জানবাজারের অলিতে গলিতে,—থাক্, সেকথা শুনে আর কাজ নেই। তোমার সঙ্গে মন খুলে কথা কওয়া যায় না, বিপদ এই যে, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে।

মীনাক্ষী বললে, তাতে তোমারই সুবিধে। লোকে ভাববে আমি তোমার চরিত্র সংশোধনের ভার নিয়েছি।

কঙ্কর বললে, আচ্ছা, তুমি লোকলজ্জা মানো, মীনাক্ষী?

মানলে কোনো সুবিধে আছে? মনোমতো স্বামী পাওয়া যায়?

না, লোকলজ্জা মানে সামাজিক—

সমাজ মেয়েদের মনে ত নেই!—মীনাক্ষী বললে, মানুষ নিয়ে আমাদের কারবার নয়, আমরা রস পেলেই খুশী। আমরা যখন কুলত্যাগ করি তখন পালাই, যেখানে সমাজ আর লোকলজ্জা দুই-ই নেই—অর্থাৎ অকূলের দিকে। কিন্তু পুরুষের মনে সমাজ-সৃষ্টির টান্, তারা এক কূল ভেঙে আর এক কূল গড়ে। তারা ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে এনে নিজের বাড়ীতে রেখে তাকে শাড়ি পরায়, মাতৃভাষা শেখায়।—আর আমরা? বিয়ে ক'রে চ'লে যাই পৃথিবীর যে কোনো দিকে। আত্মীয় পরিজনের সম্পর্কটা কাঁচি দিয়ে কেটে পালাই। বাঁশি একবার বাজলেই হোলো, ব্যস—কূল, মান, লাজ, ঘর বাড়ী—সব ভেঙে দিয়ে—

তোমার মাথা!—কঙ্কর বললে, ওই ছাখো কুলত্যাগিনী মিসেস রয়! ওই ছাখো অতি নোংরা জীবন যাপনের মাঝখানেও সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা। পুলিশের ভয় নয়, সমাজের ভয়—পাছে সমাজ এসে তার দরজায় হানা দেয়।

তোমার পিণ্ডি।—মীনাক্ষী বললে, এই দ্যাখো আমার সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা নেই, তোমার মতো অসচ্চরিত্র তরুণের সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছি। মিসেস রয়ের মনে আছে সুখের সন্ধান, বিলাসের কল্পনা। টাকা পয়সায় তার মোহ, সম্ভোগে তার আনন্দ—তাই সে নির্বিঘ্ন জীবন চায়। ধনবতী হওয়া তার স্বপ্ন। আমার মতন মেয়ে এত ছোট নয়। আমি অর্থের চেয়ে অনর্থকে কামনা করব। এক হাতে যা নেবো অন্য হাতে ছুড়ে ফেলে দেবো। সস্তা সমাজ বিদ্রোহ, স্বাধীন প্রণয়, মনোমতো স্বামী নির্বাচন,—এবং পরিশেষে নারীত্বের জয়গান, দেশজোড়া হাততালি, এসব আমার দু'চোখের বিষ। আমি এদের সকলের ওপরে। পুরুষ এসে আমার পায়ে ধরবে, কিম্বা আমি গিয়ে পুরুষের পায়ে পড়বো—এই কুৎসিত আদর্শ, স্ত্রীপুরুষের এই চরম অসম্মানকে আমি স্বীকার করব না। আমি চাই বর্জন ও গ্রহণের সহজ স্বাধীনতা। দায়িত্ব নেই জীবনে, এমন জীবন আমি খুঁজে বেড়াবো পথে পথে।

কঙ্কর হেসে বললে, প্রকৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি হবে কেমন ক'রে? পুরুষ পাখী ত ডিম পাড়ে না?

হাবড়া পুলের উপর দিয়ে গাড়ী চলেছে। মীনাক্ষী বললে, শোনো, এই ফীটন্ গাড়ীর মধ্যে সমাজ নেই, তবু মনে মনে আমাদের একটা সমাজ আছে বৈকি। তাকেই শোনাবো, তোমাকে নয়। তা'কে চুপি চুপি এই কথা বলতে চাই, আমরা প্রাচীনের উত্তরাধিকারী কিন্তু পুরাতনের ক্রীতদাস নয়। ভবিষ্যৎ মানুষের দিকেই আমার চোখ, অতীত ও বর্তমানের নয়। সেই ভবিষ্যৎ মানুষ প্রকৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতি চায় না, কিন্তু প্রকৃতিকে আয়ত্বে আনতে চায়। এক লক্ষ শৃগালকে জন্মদান করা অপেক্ষা একটি সিংহ শিশু অনেক বড়। সন্তানের দায়িত্ব চাপিয়ে স্ত্রীলোককে ভোলানো সনাতন চাতুরী, কিন্তু মূর্খ স্ত্রীলোকরা একথা বোঝে না যে, সন্তান ধারণকে ইচ্ছাধীন না করলে তারাই

বঞ্চিত হবে এই পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দে। মা হয়ে বাঁচার চেয়ে নারী হয়ে বাঁচা অনেক বড়। মায়ের আসন গৃহমন্দিরে, কিন্তু নারী হোলো বিশ্ববিজয়িনী।)

কঙ্কর বললে, তোমার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের বক্তৃতা থামাও। স্টেশন এসে গেছে।

গাড়ী ভাড়া চুকিয়ে তারা স্টেশনে নেমে অনুসন্ধান ক'রে জানলো, রাত বারোটায় একখানা লোকাল্ গাড়ী ছাড়বে। এখন কিছু দেরী আছে।

দু'জনে আলোচনা ক'রে স্থির করলো, লোকাল্ ট্রেন যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত তারা যাবে—তারপর তারা উঠবে কোনো স্টেশনের ওয়েটিং রুমে,—যদি রাত বাকি থাকে তবে তারা ওয়েটিং রুমেই রাত কাটাবে, না হয়ত প্লাট্‌ফরমের কোনো বেঞ্চে নিভৃতে ব'সে প্রণয় ব্যাপারের অলীকতা সম্বন্ধে আলোচনা করবে। সকাল হ'লে পরের গাড়ীতে ফিরবে কল্‌কাতায়।

রাত কম হয়নি। হাওড়া স্টেশনের জনতা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে এসেছে। দক্ষিণ দিকের ওয়েটিং রুমের কাছে বেঞ্চে গিয়ে মীনাক্ষী ব'সে পড়লো। বললে, মিসেস রয়ের বাড়ীর জলযোগ হজম হয়ে গেছে। যাও, খাবার আনো।

কঙ্কর বললে, তুমি একলা থাকবে এখানে?

আমি তোমার বিবাহিত স্ত্রী নই যে, উদ্বেগের কারণ আছে।

তবু মেয়েমানুষ—চোর, ডাকাত, গুণ্ডা—এই ধরো, স্ত্রীধর্ম, সতীত্ব, সম্ভ্রম—

সব গেলেও আমি ত থাকবো!—যাও শিগগির, ক্ষিধে পেয়েছে।—ব'লে মীনাক্ষী হাসলো।

কঙ্কর বললে, তোমার ওপর পাশবিক অত্যাচার ঘটলে আমার কিন্তু সইবে না।

মীনাক্ষী চোখ পাকিয়ে বললে, ওই সব বাঙ্গলা দৈনিকের ভাষা ছাড়ো।

ওটা মোটেই পাশবিক অত্যাচার নয়, সম্পূর্ণ মানবিক আর স্বাভাবিক। জ্ঞান হ'লে বুঝবে সাধারণ মানুষ পশুর চেয়ে অনেক নীচে।

কঙ্কর চ'লে গেল।

স্টেশনটা কঙ্করের কাছে চিরকাল অদ্ভুত লাগে। সকলের গতি ভঙ্গীতে যেন একটা আদিম আগমন ও নির্গমনের সঙ্কেত। রেল লাইনগুলি যেন অপরিচয়ের পথ ধ'রে অজ্ঞাত রহস্যের দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করতে থাকে। বাঁশীর আওয়াজ যেন কেবলই বিস্ময় থেকে বৈচিত্র্যের দূর দূরান্তর পথে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। গতিই জীবন, যেন ছুটছে সব চারিদিকে—দুর্দান্ত সৃষ্টি, দুরন্ত প্রলয় যেন দুর্বার গতিতে অশ্রান্ত ছুটে চলেছে। কঙ্কর যেন সাম্প্রতের সূক্ষ্ম বিন্দুর উপরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখে নিল এক মুহূর্তে। তার চিন্তার কোনো সামঞ্জস্য নেই, তার কল্পনার ঐক্য সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন—তবু এমনি করেই সে যেন সব জিনিসের মহিমা খুঁজে পায়। ইঞ্জিন খানার ভিতরে আগুন, জল আর কয়লা ছাড়িয়েও ওর চেহারার মধ্যে কোথায় একটা অতিকায় প্রাণী দেখতে পায়। ভীষণ দুইটা অজগরের মতো দুইটা রেল লাইনের বুকের উপর দিয়ে সেই অতিকায় জন্তু যেন আঁচড়ে আঁচড়ে চলতে থাকে। এটা অর্থহীন, এটা হাস্যোদ্দীপক, তবু এটাকে বলতে হবে রসকল্পনা, এটাকে বলতে হবে মনের একটা অসাধারণ স্পর্শাতুরতা। {মানুষের আচার ব্যবহারে যদি সঙ্গতি থাকে থাক্, কিন্তু কথালাপে তার খেয়ালখুশির স্বাধীনতা থাকবে না কেন? মানুষের কল্পনা সকল সময়ে কেন সঙ্গতির পথ ধরে চলবে? সমস্ত কাব্য সাহিত্যের মূলেই ত মানুষের এই চিন্তার অসঙ্গতি—যার সঙ্গে বাস্তবিকতার কোনো যোগ-সূত্র নেই। জীবনে যা প্রকাশ সেটুকু ত' সহজ আর সামান্য, কিন্তু যা অপ্রকাশিত রইল সে ত' বিপুল, সে ত' বিশাল ও জটিল।}

কঙ্কর কল্পনা করলো, এই স্টেশনে এই মানুষগুলিকে নিয়ে প্রকাণ্ড এক যৌথ পরিবার—এরা সবাই বিচ্ছিন্ন, আবার সবাই একত্র গ্রথিত, এদের পিছনে

রয়েছে যেন একটা পরম নির্দেশ, প্রবল এক নির্লিপ্ত তান্ত্রিক। একে ঈশ্বর বলো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, একে বিজ্ঞানের পরমা শক্তি বলো বিবাদ করবো না,—তবুও একটা কিছু আছে। আগুন আর জল এই দুয়ের সংমিশ্রিত শক্তিতে বেগ সঞ্চারিত হোলো কেমন ক'রে? গর্ভের ভ্রূণ মানুষের আকার পেল কোন্ নিয়মে, পৃথিবী ওল্টায় দিনান্তে কোন্ বিস্ময়কর চক্রান্তে, বীজের ভিতর থেকে অঙ্কুর জাগে কিসের তাড়নায়? বলো ঈশ্বর, বিবাদ করবো না। আর এই যে মীনাক্ষী, আর সে—দুজনের আকর্ষণ বিকর্ষণে বিজ্ঞানকে খুঁজে বার করো আপত্তি নেই, কিন্তু দুজনের ভিতরে এই যে প্রচণ্ড জীবন-বিপ্লবের প্রবৃত্তি—এর নিয়ামক কে? কেন তারা ছুটে চলতে চাইছে অনির্দেশের দিকে—যেদিকে মরুভূমির শূন্যতাটাই বড়, যেদিকে ফলশালিনী শস্যক্ষেত্র কোথাও নেই। সম্ভ্রান্ত ঘরে তাদের জন্ম, সংশিক্ষার পারিপাশিকতায় তারা বড় হয়ে উঠেছে—তবু এই ধ্বংসের বীজ, বিপ্লববাদের স্ফুলিঙ্গ তাদের মধ্যে সঞ্চার ক'রে দিল কে? একে আজগুবী বলা চলতে পারে, বাজে উপন্যাস ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে পারো—তবু ত' পাওয়া গেল না সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ।

গলার আওয়াজে কঙ্করের চমক ভাঙলো। পিছন থেকে আহ্বান এলো, হ্যালো, কমরেড!

মুখ ফিরিয়ে কঙ্কর বললে, হ্যালো, কমরেড দেবেন চাটুয্যে? আরে, গায়ত্রী দেবী যে? এখানে কোথায় যাওয়া হবে?

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বললে, যাওয়া হোলো না তাই চ'লে যাচ্ছি! দেরাদুন এক্সপ্রেস ফেল্ করলুম, তাই বাসায় ফিরছি।

দেশভ্রমণে যাবার ইচ্ছে ছিল নাকি?

না, কাল দুপুরে আসানসোলে আমাদের পার্টি মিটিং।—কাল ভোরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই দেখছি।

কঙ্কর হেসে বললে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তবে সাম্যবাদী ? না জাগিলে সব ভারত ললনা—

গায়ত্রী বললে, আপনি ত' আমাদের চেয়েও চরমপন্থী,—আপনাকে ত' আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

কঙ্কর বললে, রাজনীতিক দল বড় ভয়ানক জিনিস। কাজের চেয়ে কথা বেশি, কথার চেয়ে বেশি ঝগড়া, এবং ঝগড়ার চেয়ে বেশি দলাদলি। আজকাল আবার দলাদলিকে ছাড়িয়ে গেছে ষড়যন্ত্র !

দেবেন বললে, এইটেই ত' প্রাণের লক্ষণ। এই সব নানা ধাতুকে নিয়ে পরীক্ষা ক'রে যে সত্যি ছাঁচে ঢালতে পারে তাকেই বলে নেতা।—তারপর এত রাত্রে এখানে কেন ?

কঙ্কর বললে, লোকাল ট্রেনে ভ্রমণে যাবো। মীনাক্ষী সঙ্গে আছে।

সত্যি ?—বলতে বলতে গায়ত্রী উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

দেবেন হাসিমুখে বললে, সর্বনাশ, আবার সে কলকাতায় এসেছে ? এবার তার মাথা খাবে দেখছি। কোথায় সে ?

গায়ত্রী বললে, চলুন আমাদের সঙ্গে। থাক্ আপনার ভ্রমণ।

দেবেন বললে, ভ্রমণের টাকাটা দয়া ক'রে পার্টি ফণ্ডে দিয়ো, ভ্রমণ ক'রো মনে মনে। চলো আমাদের বাসায়, এত রাত্রে আর তোমাদের জাহান্নমে যেতে হবে না।

তারা কঙ্করকে ধ'রে নিয়ে ওয়েটিং রুমের দিকে চললো।

ওয়েটিং রুমের কাছে এসে দেখা গেল কতকগুলি লোক ভীড় করেছে, তাদের মাঝখানে জন চারেক খাকি পোষাকপরা পাহারাওয়ালা ও ইন্‌স্‌পেক্টর। তাড়াতাড়ি ভীড় ঠেলে তিন জনে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। সবিস্ময়ে তারা দেখলো, একটি কচি শিশুকে বুকে নিয়ে মীনাক্ষী সকলের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছে। একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক পুলিশকে উদ্দেশ ক'রে বলছেন, ভুল

আমার হয়নি সাহেব, একঘণ্টা ধরে দেখলুম ছেলেটাকে কা'রা ওয়েটিং রুমের একপাশে ফেলে রেখে চ'লে গেছে—মা বাপ নিরুদ্দেশ—কোথাও জনমানব নেই—একা শিশু; এই দেখেই ত আমি পুলিশে খবর দিলুম। তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ নেই মা, কিন্তু তাই ব'লে ভানুমতীর খেল্ ত আর নয়। এ ছেলে কাদের?

মীনাক্ষী কঙ্করদের দেখে শিশুকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, কই, দুধ আনোনি?—আচ্ছা, এরা কি পাগল নাকি? এই ভদ্রলোককে পুলিশে ধরিয়ে দাও ত?

কঙ্কর এক মুহূর্তে সমস্তটা লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা বিপদ যা হোক। সরুন আপনারা। কচি ছেলেটাকে উপলক্ষ্য ক'রে ছেলের মাকে বেশ ক'রে দেখে নিচ্ছেন, কেমন? ভারি এক তামাসা পেয়ে গেছে সব। মশাই, আপনি ত দেখি খুব ধর্মভীরু, আপনি নিজে যাকে বাবা ব'লে জানেন তিনিই যে আপনার বাবা—সেটাও ত জনশ্রুতি! পুলিশ ডেকে প্রমাণ করতে চান যে ছেলেটা আমাদের নয়? আপনার কি মাথা খারাপ? বরং পারেন ত পুলিশ আপিস থেকে একটা গরু ধরে আনুন, ছেলেটা দুধ খায়নি অনেকক্ষণ। থানায় আবার ধর্মের ষাঢ় বেশী, গরু কম।

দেবেন বললে, কত দুঃখে একটা ছেলে হয়,—আপনি অমনি বিনামূল্যে ছেলেটাকে পুলিশে পাঠাচ্ছিলেন?

মীনাক্ষী বললে, ছাখো দেখি ভাই! গাড়ীখানা ফেল করলুম, তাই ছেলেটাকে ভেতরে শুইয়ে অমনি একটু বাইরে এসে জিরোচ্ছি—ওমা আমার কপালখানা, পিল পিল ক'রে সেপাই এসে ঢুকলো। বলি, কি হবে মা! যাও না সব, মরণ আর কি—মা বাপের বিয়ে দেখছ সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? —সরে যাও একটু, ছেলেটাকে খাওয়াই।—এই ব'লে সে বুকের আঁচলের মধ্যে শিশুর মাথাটা টেনে নিল।

ভদ্রলোকটিকে সান্ত্বনা দিয়ে পুলিশেরা মুখটিপে হেসে চলে গেল। তিনিও গেলেন তাদের পিছনে পিছনে। আর কেউ দাঁড়িয়ে থাকিতে সাহস করলো না।

গায়ত্রী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছিল। এবার এগিয়ে এসে বললো একি পাগলামি, মীনাক্ষীদি ?

মীনাক্ষী হেসে বললে, গণতন্ত্রের যুগ রে, এটাকে সবাই ভাগ ক'রে নেবো।

কঙ্কর বললে, আমি বাপু ওর বাবা হ'তে পারব না।

মীনাক্ষী দাঁতে দাঁতে চেপে বললে, তোমাকে কারো বাবা হ'তে হবেও না কোনোদিন।

দেবেন বললে, কিন্তু একি কাণ্ড, মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, খেলাটা জমানো গেল, আর কিছু নয়।

## চার

শহরের এক প্রান্তে—যেদিকটায় নূতন শহর আর পথ ঘাট কেটে নূতন বসতি গ'ড়ে উঠছে। পাড়া প্রতিবেশী এখনো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ওঠেনি—এমন একটা পল্লীর মধ্যে অতি সস্তা বাড়ী ভাড়া নিয়ে দেবেনের গৃহস্থালী। বাড়ীটি ছোট, একতলা—কিন্তু তারই মধ্যে বন্দোবস্ত নিখুঁৎ। বাড়ীটির একটি ঘরে এক বৃদ্ধা থাকেন, তিনি সম্পর্কে দেবেনের দিদিমার বোন। নূতন অতিথি কেউ এলে তাঁর কৌতূহল জাগে না, কেবল তার নাম জানলেই তিনি খুশী। নবাগত দুটি মানুষ, একজনের নাম কঙ্কর, অপরজনের মীনাক্ষী, এই তাঁর কাছে যথেষ্ট, জাতি গোত্র কুলশীল তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন।

পার্টি মিটিং করবার জন্য দেবেন তার পরদিন সকালে আসানসোল র... হয়েছিল। ফিরতে তার দুদিন লাগলো। ফিরে এসে দেখলো হাওড়া স্টে... কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি নেই, মীনাক্ষী নিজে গিয়ে সেটাকে রেখে

শিশুমঙ্গল আশ্রমে। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ মীনাক্ষীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, সন্তানকে কি এইভাবে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া উচিৎ? মীনাক্ষী যে শিশুর মা নয় একথা তাঁরা বিশ্বাস করতে চাননি। মীনাক্ষী বিরক্ত হয়ে নারী হাসপাতালে গিয়ে নিজের শরীর পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তারী রিপোর্ট আনে। দেখা যায় মীনাক্ষী সত্যভাষিণী। অতঃপর শিশুটিকে ও তার সঙ্গে একশত টাকা শিশুর কল্যাণের জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিয়ে চ'লে আসে।

খেলাটা দু'দিনের, কিন্তু খেলাটা চরম। মনস্তত্ত্বের পরীক্ষায় জানতে পারা গেছে, মীনাক্ষীর মনে শিশুর কোন দাগ পড়েনি। মীনাক্ষী মায়ের জাতি, এই কথাটার ভিতরে স্ত্রীলোককে দাসী বানিয়ে তোলার একটা অপচেষ্টা প্রথমেই চোখে পড়ে। আশ্চর্য, নারীগর্ভজাত পুরুষ চিরদিনই চরম অসম্মান ক'রে এলো এই নারীকে; তার সব চেয়ে বড় অস্ত্র হোলো স্ত্রীলোককে 'মায়ের জাতি' ব'লে খোঁটা দেওয়া। মীনাক্ষীর মন খুঁজলে এতটুকু চিত্ত বৈলক্ষণ্য পাওয়া যাবে না, স্নেহ ত' দূরের কথা। নিষ্ঠুরপ্রকৃতি সে নয়, কিন্তু স্বভাবের মধ্যে তার অন্ধতা নেই। শিশুটিকে সে মানুষীর সন্তান হিসাবে হাবড়া স্টেশনে বুকে তুলে নেয়নি, তখন তার সেই মানসিক মেজাজের মুহূর্তে কুকুর ছানাকেও সে বুকে তুলে নিতে পারতো,—তার কাছে জীবের প্রাণময়তাটাই বড়, মানুষের ছানা অথবা কুকুরের ছানা তার কাছে প্রধান নয়।

সপ্তাহ খানেক কাটলো এ বাড়ীটায়। দেবেন একজন ছে' রক্ষ সমাজতন্ত্রী নেতা, সুতরাং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছেলের দল এ' ক যাতায়াত করে। গায়ত্রী তার সহধর্মিণী, সুতরাং তারও হাতে আছে নিখিল-বঙ্গ-মহিলা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকাত্ব—অতএব দু'চারজন তরুণী ে যাওয়া করেন বৈ কি। মীনাক্ষী সহজেই এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হোে ছেলেরা তাকে বাহবা দিল।

নূতন সমাজটার বৈচিত্র্য কম নয়। সদ্য কারামুক্ত কয়েকটি তরুণ তরুণী—যারা দেশের কাজ করতে গিয়ে কূল কিনারা পায়নি, অথবা যারা গৃহশৃঙ্খলার মধ্যে মানিয়ে চলতেও শেখেনি। মীনাক্ষী বেশ সহজেই অনুভব করতে পারলো, এই সব ছেলেমেয়েদের ভিতরে কেমন একটা জীবনজোড়া অভিযোগ, একটা নিরুদ্দিষ্ট আক্রোশ। হ'তে পারে সেটা রাজশক্তির বিরুদ্ধে, হ'তে পারে সেটা চল্‌তি সমাজরীতির বিপক্ষে। কিন্তু অসন্তোষটা যে সত্য, এ তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচার আচরণের ভিতর দিয়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। সমাজের যন্ত্রটা যখন সোজা দিকে ঘুরপাক খায় তখন বিপরীত ধাতুবিশিষ্ট মানুষ তার থেকে ছিট্‌কে পড়তে থাকে, তারা তাল মিলাতে পারে না। এদের মধ্যে কেউ বাধিয়েছিল শ্রমিক ধর্মঘট, কেউ লাগিয়েছিল কলহ কোন নামজাদা দেশনেতার বিপক্ষে, কেউ কলেজে জাতীয়তা প্রচার করতে গিয়ে অধ্যক্ষ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়েছে, কারো দেশসেবায় এসেছে প্রবল নিরুৎসাহ, কেউ বা অহিংস অসহযোগনীতিকে আন্তরিক অপছন্দ করে। আর যারা আছে তাদের বিবাদ [illegible]হস্থালীর আদর্শের সঙ্গে। তারা মানবে না অভিভাবকদের, শ্রদ্ধা প্রকাশ করবে না গুরুজনের প্রতি,—তারা ভাঙতে চায় সব, কিন্তু দুঃখ ঘোচাতে চায় [illegible] কারো। তারা দয়া করতে চায় না দরিদ্রকে, ঘৃণা করতে চায় [illegible]নাঢ্যদের। কেউ গৃহবিতাড়িত, কেউ সমাজ পরিত্যক্ত, কেউ প্রণয় [illegible]খ্যাত, আবার কেউ বা দারিদ্র্যের জ্বালায় আত্মহত্যা না ক'রে এই [illegible]ন্ত্রী দলে এসে নাম লিখিয়েছে। মীনাক্ষী মাঝে মাঝে লক্ষ্য করে, [illegible]তকগুলি ক্ষুধার্ত পাগলের দল এসে একটা অদ্ভুত মাতনে মেতে চায়।

[illegible]রা কিছু কাজ করে তারাও বেকার। কেউ ছোট খাটো স্কুলের মাস্টার, [illegible]কোন সাপ্তাহিক কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কেউ কোনো সিনেমার অস্থায়ী [illegible]নেতা, কেউ ইনস্যুওরেন্স ক্যানভ্যাসার, কেউ বা কোন ঔষধ বিক্রেতা

এজেণ্ট। যে সব দুচার জন ছেলেমেয়ে মফঃস্বল থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিল, ভারতবর্ষকে স্বাধীন না দেখে আর তারা ঘরে ফিরবে না, তাদের মধ্যেও কয়েকজন আছে, যারা কোনো কোনো ধনী দেশনেতার আশ্রয়ে আশ্রিত। মা, দিদি, বৌদিদি, মাসিমা প্রভৃতি সম্পর্ক পাতিয়ে তারা কল্‌কাতায় উদরান্ন সংস্থান করে। এই বাড়ীটা তাদের একটা প্রধান মিলন কেন্দ্র। এই বাড়ীর সমাজতন্ত্রে সকলের সমান অধিকার—এই চেহারাটা মীনাক্ষী প্রথমেই লক্ষ্য করেছে। কোথা থেকে চা আসে, কে আনে আহার সামগ্রী, কে এসে কখন রাঁধতে বসে, কে বা বাসন মাজে, ঘর ধোয়—তার কোন ঠিক নেই। দেবেন নিমন্ত্রণ করে,গায়ত্রী রাঁধতে ব'সে যায়, বাইরের অপরিচিত ছেলে মেয়েরা এসে পরিবেষণ আরম্ভ করে—কিন্তু খরচটা যে কা'র তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। দেবেন একখানা দৈনিক কাগজের সহ-সম্পাদক,—তিরিশ টাকা তার মাসিক দক্ষিণা, তার মধ্যে বাইশ টাকা যায় বাড়ী ভাড়ায়; বাকি থাকে আট টাকা,—আট টাকায় মাসে অন্তত দেড়শো লোককে খাওয়ানো যায় ব'লে মীনাক্ষী বিশ্বাস করতে পারে না। তবে আনন্দের কথা এই, আহার জোটে না অনেক দিন। অবারিত আতিথেয়তা ও নিমন্ত্রণ—কিন্তু সে কেবল রাজনীতি আলোচনার জন্য, বুর্জোয়া ও ক্যাপিট্যালিস্টদের নিয়ে পরিহাস করার জন্য,—কিন্তু আহারাদির কথাটা চাপা প'ড়ে থাকে। অনেক সময় দেখা গেছে একটা কাগজের ঠোঙায় এলো কতকগুলি আলু আর চা'ল—চালগুলি বিভিন্ন শ্রেণী চা'লের সংমিশ্রণ। খোঁজ নিয়ে জানা যায় এই চা'ল আর আলু পার্টি রক্ষ জন্য ভিক্ষার দ্বারা সংগৃহীত। কিন্তু এত আনন্দে সকলে সেই অন্ন গ্রহণ ক যে, দারিদ্র্য ও ভিক্ষার সকল মালিন্য ও লজ্জা নিঃশেষে মুছে যায়।

মেয়েরা যারা আসে তারা দুই শ্রেণীর। একদলের মাথায় ঘোমটা ে এবং আর একদলের কপালে এয়োতির চিহ্ন। ঘোমটা যাদের নেই তা ন্ধ মীনাক্ষীর কৌতূহল কম, তাদের বুকের ভাষা দেবতারাও জানে না, ি

কপালে যাদের সিন্দুর তাদের অনেকে স্বামীর চরিত্রের দুর্নীতিতে বিরক্ত, কেউ অসতীপনার অভিযোগে বিতাড়িত, কেউ করপোরেশনের প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, আবার কেউ বা দারিদ্র্যের দায়ে গৃহহীনা।

এমনি করেই মীনাক্ষীর একটি সপ্তাহ কেটে গেল। এই এক সপ্তাহে কেমন একটা বে-আইনী করুণরস তার মনের মধ্যে জমে উঠেছে। যাদের চালচুলো নেই, যারা বেয়াকুব, যারা কোনো খাপের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না তাদের প্রতি তার একটা অহেতুক ও অযৌক্তিক বিবেচনা। এই কারুণ্যবোধ কেন? এর কৈফিয়ৎ দেবে এমন মনস্তত্ত্বের পণ্ডিত কে? তবু সহজ কথায় ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, ওদের সকলের বুকের ভিতরকার যে সম্মিলিত অগ্নিকুণ্ড, তারই একটা স্ফুলিঙ্গ মীনাক্ষীর মনের মধ্যে পাওয়া যায়। ওরা যে সুরে গান গায় তারই একটি রেশ, একটি কম্পন মীনাক্ষীকে যেন চঞ্চল ক'রে তোলে। ওরা নির্বোধ হ'তে পারে, অকর্মণ্য ও অযোগ্য ব'লে মানুষের সমাজ থেকে ওরা বিতাড়িত হ'তে পারে,—কিন্তু তবু ওদের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার, কিছু দুঃখবরণ করতে পারলে মনটা যেন তৃপ্তি পায়। কেন তার এই অন্যায় মমতা? যারা সংসারে শক্তিমান, যারা চিরস্থায়ী অধিকার কায়েমি রেখে নির্বিঘ্নে দিন কাটায় তাদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ আনে, সেই সব ছেলেমেয়ের প্রতি মীনাক্ষীর একটি অসঙ্গত সহানুভূতি। যাদের প্রাণের মধ্যে ভাঙনের প্রবৃত্তি, যারা মানুষের বিচারে কোন কাজেই আসতে পারলো না, ফুটো নৌকো যাদের ঘাটায় এসে কুল পায় তারা কেন মীনাক্ষীর প্রিয় হয়ে ওঠে?

কঙ্কর বললে, তুমি ত সৃষ্টি আর অপসৃষ্টির বাইরে, প্রেম আর নিষ্ঠুরতা এই ই অনুকূল আর প্রতিকূল তোমার জীবনে অস্বীকৃত, তবে কেন তোমার এই ত্তবিকার? এরা সংসারের জঞ্জাল। যারা কাজে লাগবার তারা সংসারের না কর্তব্যে নিযুক্ত,—এরা তাদের কারখানায় কুড়নো আবর্জনা, তাই এরা ই পায়নি।

মীনাক্ষী বললে, বিশ্বাস করি বৈ কি সে কথা। তবু কঙ্কর, তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো, কাজে লাগবার যোগ্যতাই মানুষের পরম পরিচয় নয়—আরো কিছু বাকি থাকে, আরো কিছু কথা রয়ে যায়।

কঙ্কর উত্তেজিত হয়ে বললে,তুমি যে শীঘ্র ফুরিয়ে যাবে তার প্রমাণ তোমার এই উক্তি। আমি জানি তুমি সংসারে অনেক মার খেয়েছ, কিন্তু কঠিন হ'তে পারোনি কেন? ✓আমি অধঃপতিতকে সইবো, দুর্বলকে বরদাস্ত করব না। ইস্পাত নোংরা হলেও সে হাতুড়ির ঘা সহ্য করে কিন্তু মাটির পুতুলকে আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করলেও সে সামান্য আঘাতে চুরমার হয়। মীনাক্ষী, সাবধান, তুমি অহল্যার মতন পাষাণী হয়ে আছো বোধ হয় এই প্রত্যাশায় যে, কোনো এক রামচন্দ্রের পা ধ'রে বাঁচবে। যে যুদ্ধ বাধায় কেবলমাত্র বিরূপ শক্তির সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করতে, তাকে রাস্তায় রাস্তায় খদ্দর বেচতে বলো; সেই দুর্বল যেন বিক্রমের চটকদার আস্ফালন না করে।

মীনাক্ষী হাসিমুখে কঙ্করের মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, খাওয়া হয়েছিল আজ?

ঝট্‌কা দিয়ে কঙ্কর তার হাতখানা সরিয়ে দিল। বললে,তার মানে? আমার কথা তুমি স্বীকার করো না?

করি বৈ কি।

তবে? তুমি কী বলতে চাও?

হাসিমুখে মীনাক্ষী পুনরায় বললে, কি জানো, সকল রকম চিন্তা, কল্পনা আর আদর্শের চেয়ে পেটের ভাত অনেক বড়।

কঙ্কর বললে, নিশ্চিন্ত পেটের ভাত মানুষকে অমানুষ ক'রে তোলে, তা জানো?

জানি বৈ কি, যেমন আমরা দুজন। আমি সে কথা বলছিনে।—মীনাক্ষী মধ্যে [illegible] লাগলো, তোমার কথাতেই সায় দিচ্ছি, আগে পেট ভ'রে খেতে দাও,

তারপরে তাকে যুদ্ধে পাঠিয়ো। যারা ঘরের অন্নের সংস্থান না ক'রে যুদ্ধের পাঁয়তাড়া ভাঁজে, তারা যুদ্ধে মরে, কিন্তু যুদ্ধ জয় করে না।

কঙ্কর বললে, অন্ন সমস্যার সঙ্গে সমস্ত সমস্যা জড়ানো এ তুমি মানো না?

তাই আমি মানি। তবু যারা অন্ন খুঁটে খেতে জানে না তাদের আমি কি বলব?

তারা সমাজবিপ্লব আনে, তারাই আনে রাষ্ট্রবিপ্লব, তারা পৃথিবীর মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়। এরাই হচ্ছে সেই মহামানুষদের শিশু-প্রতিনিধি। আজ এরা আবর্জনা, কাল এরাই শাসন শক্তি; আজ এরা উপেক্ষিত, আগামী কাল এরাই আগামীকালের রাষ্ট্রগুরু। এদের কোনো অনুগ্রহ ক'রো না, স্নেহ দিয়ে এদের ভোলাতে চেয়ো না, নির্মমভাবে এদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দাও। এদের অস্থি দিয়ে দধীচির বজ্র তৈরি হোক, এদের কঙ্কাল স্তূপীকৃত হয়ে প্রবাল দ্বীপের জন্ম হোক—ভাবীকালের মানুষ সেখানে নতুন ফসল ফলাবে।—এই ব'লে কঙ্কর বেরিয়ে চ'লে গেল।

চমৎকার বক্তৃতা! খবরের কাগজে ছাপা হ'লে তার দৈনিক নীট বিক্রয় সংখ্যা অন্তত এক লক্ষ হ'তে পারতো। তবু এই বক্তৃতার মধ্যে মীনাক্ষী উৎসাহ খুঁজে পেলো না,—নির্মমভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে তার মন উঠলো না। কঙ্করের শেষ উপমাটা সাহিত্যরসের দিক থেকে তার মন্দ লাগেনি। নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করলে কঙ্কর হয়ত একদিন রবিঠাকুরের চার লাইন আশীর্বাদ পেতে পারতো। তবু মীনাক্ষী নিরুৎসাহ হাসিমুখে একা ঘরে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

আজ এবাড়ীতে রান্না হয়নি। গতকাল পর্যন্ত কিছু মুড়ি আর দু'চারখানা পাউরুটীতে কয়েকজনের এক রকম ক'রে চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু এই উপবাসের ভিতরেও তাদের মাঝখানে কোনো অসন্তোষের উত্তাপ নেই। পাশের ঘরে দেবেন আর গায়ত্রীকে ঘিরে একদল সমাজতন্ত্রী তরুণ-তরুণী অবিশ্রান্তভাবে

আধুনিক রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা আলোচনা ক'রে চলেছে। তার মধ্যে হাসি আছে, গল্প আছে, পরিহাস আছে, খদ্দর আর অহিংসার উপরে বিদ্রূপ আছে,—নেই কেবল অন্নচিন্তা।

চিত্তবিকার,—তা হবে, তবু এই চিত্তবিকারকে আজ এই অপরাহ্ণকালে মুগ্ধ মনে মীনাক্ষী উপভোগ করতে লাগলো। ওদের একজনের প্রতিও তার পক্ষপাতিত্ব নেই, একজনও তার হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারেনি। ওদের মধ্যে অনেকেই অর্বাচীন, অনেকেই কেবলমাত্র বুদ্ধিহীন উচ্ছ্বাসকে সম্বল ক'রে ওখানে এসে জটলা পাকায়—কিন্তু এই নির্জন ঘরে ব'সে ওদের সম্মিলিত জীবনের একটা বঞ্চিত দুঃস্থ চেহারা মীনাক্ষীর চোখের উপরে ভাসতে লাগলো। ওদের ভিতরে বিড়ম্বিত মানবতার প্রমত্ততা নেই, আছে কেবল একপাল শিশুর চপলতা,—ওদের কাছে আদর্শবাদ প্রচার করার চেয়ে ওদের আহার ও স্নেহ দিয়েই শান্ত করতে হয়।

মীনাক্ষীর বুকের একটা কোণ যেন টনটন করতে লাগলো।

## পাঁচ

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গায়ত্রী বললে, কমরেড মীনাক্ষীদি দেখছি কদিন থেকে অন্নপূর্ণাব আসন দখল করেছেন। এই সব ভূত ভোজন করিয়ে লাভ কি ?

মীনাক্ষী বললে, কমরেডদের 'জালায়। যতই ওদের ক্ষিধে পায় ততই ছোটে রাশিয়ায়। সব যেন এক একটি ক্ষুদে লেনিন। তাই বলি পেট ভ'রে খা সব, খেয়ে দেয়ে মুখখানা একটু ক্ষান্ত দে।

গায়ত্রী বললে, তোমার ধমকে ওদের মুখে আর কথা নেই, পাড়া ছেড়ে সব পালায়। এবার জব্দ হয়েছে খুব। দেবেন বলছিলো, মীনাক্ষীর দাপটে পলিটিক্স এবাড়ী থেকে বুঝি বনবাসে যায়। কই, তিন দিন ধ'রে কঙ্করকে দেখছিনে কেন? ঝগড়া করেছ বুঝি?

না রে ভাই, বাক্‌সর্বস্ব পুরুষ মানুষ মেয়েদের দুচোখের বিষ। সেদিন গিয়েছিলুম তেড়ে, এক পাটি জুতো প'রেই পালিয়েছে। ওরা কাপড় পরে কাছা দিয়ে গিরো দিয়ে; মানে, বুদ্ধি ওদের বড় আল্‌গা, তাই বেঁধে রাখে। আমরা কাপড় পরি গা জড়িয়ে, আমাদের বুদ্ধির চিহ্ন সর্বাঙ্গে। কোথায় গেছে, আসবে যখন খুশি।

আচ্ছা, মীনাক্ষীদি?

কি বল্‌।

কঙ্করকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারো না। সত্যি কিনা বলো ত?

সত্যি, কিন্তু কি বলতে চাস?

গায়ত্রী হেসে বললে, প্রেম!

মীনাক্ষী বললে, প্রেয়সীর প্রে, আর মঙ্গলের ম! কঙ্কর যে প্রেয়সীর মঙ্গল চাইবে এত বড় অধঃপতন তার হয় নি।—এই বলে মীনাক্ষী হেসে উঠলো।

তবে কি চায়? অমঙ্গল?

না, সে আমার মঙ্গল অমঙ্গল কিছুই চায় না। তার আগেই আমাকে সে পেয়েছে।

গায়ত্রী প্রশ্ন করলো, কিন্তু তুমি ত' ধরা দেবার মেয়ে নও?

মীনাক্ষী বললে, ধরা ত' দিইনি। ধরা কোনোদিন দেবো এও ত' বলিনি।

বুঝলুম না, মীনাক্ষীদি?

তরকারির পাত্রটা নামিয়ে মীনাক্ষী বললে, খুব সোজা। ভালো-বাসাটা

কিছু নয়, ভালো লাগাটাই আসল। ভালো যদি লাগে, স্বামী সন্তান সংসার ঐশ্বর্য সব প্রেমময়, যদি না লাগে তবে একলা চালাও তোমার ফুটো নৌকো।

গায়ত্রী বললে, প্রেমময় বললে কেন?

ওর মানে সুন্দর! প্রেম না থাকলে সংসারটা নীরস আখের ছিবড়ের মতন লাগতো।

ভালো লাগে তোমাদের পরস্পরকে?

অত্যন্ত। তাই ভয় হয়। দুজনের একই সুর। দুজনেরই চড়া সুর। তাই ভয় করে।

ভয় কেন? গায়ত্রী প্রশ্ন করলো।

যদি ভাঙে তাই ভয়। আমরা স্ত্রী পুরুষ হয়ে বরং থাকতে পারবো কিন্তু স্বামী হয়ে থাকা অসম্ভব।—মীনাক্ষী বলতে লাগলো, ইলেকৃট্রিকের আলো জ্বলে—একটা তার পজিটিভ, একটা নেগেটিভ। সব ক্ষেত্রেই তাই। একজন যদি ছন্নছাড়া হয় আর একজনকে হ'তে হবে শান্ত—এই বিপরীত ধাতুর একত্র মিলনেই মঙ্গল, সৃষ্টির থাকে ছন্দ। দুইজনই বিক্ষুব্ধ, মানে, দুই ইস্পাতের ঠোকা-ঠুকিতে অগ্নিকাণ্ড; আর দুইজনই মাটির পুতুল—মানে উভয়েরই অধঃপতন। আমরা দু'জন মানে দুখানা তলোয়ার,—দুই তলোয়ার যখন আস্ফালন করে দর্শকরা তখন দেয় হাততালি। আমাদের মিলন নেই, কিন্তু বিচ্ছেদও নেই। অমঙ্গল আমরা চাইনে কিন্তু মঙ্গলেরও পরোয়া করিনে।

গায়ত্রী বললে, আর ভবিষ্যৎ?

মীনাক্ষী হেসে উঠলো, বললে আমাদের মন এত জরাজীর্ণ হয়নি যে ভবিষ্যৎ ভাব্‌বো। এক নদীর নাম পদ্মা, অপরের নাম ব্রহ্মপুত্র—খরস্রোত দুয়েরই। তারা যদি মিলতে পারে ভালো, না যদি মেলে তবুও তারা বিপুল ভবিষ্যতের মহিমার দিকে ছুটে চলে। তারা দুজনেই যায় অকূলে।

গায়ত্রী বললে, কবিত্ব!

মীনাক্ষী বললে, যারা জানোয়ার তাদের কল্পনা নেই, তাই তাদের জীবন কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা আর মৈথুনের সমষ্টি, কিন্তু মানুষের আছে কল্পনা তাই তারা জনগণের দুঃখ ঘোচাবার জন্য সাম্যবাদ প্রচার করে; সাম্য, স্বাধীনতা আর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তবিপ্লব আনে, তারা যায় দুর্গম মেরু আবিষ্কার করার জন্য, তারা গড়ে নতুন সমাজ। আমাদের কল্পনা আরো অগ্রসর, তাই আমরা কিছুকেই স্বীকার করিনে— আমরা অভিযান চালিয়েছি—অনড় জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে।—প্রেমে আমাদের স্বস্তি নেই, মৈথুনে আনন্দ নেই, সংসার রচনায় শান্তি নেই! একে আমার বক্তৃতা বলো, আধুনিক শিক্ষার কুফল বলো, একে বলো আমাদের চারিত্রিক শুচিতার অভাব,—তবু চেঁচিয়ে বল্‌ব কঙ্করকে যে আমার ভালো লাগে তার কারণ তার চওড়া বুকের ছাতি, কোঁকড়া চুল, কচি মুখ, আর কঠিন দুখানা হাত আছে ব'লে নয়; এও নয় যে তার বলিষ্ঠ দুই বাহুর কঠিন পীড়নে আমি আঙুরের গোছার মতন গলে যাই,—কিন্তু তাকে ভালো লাগার কারণ,সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, জাত আর সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। সে এক প্রকাণ্ড তপস্বী, একজন মহৎ শিল্পী। পুরনো ঈশ্বরকে ভেঙে সে গড়তে চায় নতুন ঈশ্বর, সৃষ্টির হৃদ্‌পিণ্ডে নতুন রক্ত সঞ্চার করতে চায়। কঙ্কর আমার গ্রাহ্যের বস্তু নয়, কিন্তু কঙ্করের ভাবমূর্তিই আমার প্রিয়তম। কঙ্কর আমার কাছে সুন্দর, সে দেবতা ব'লে নয়, কিন্তু সে একটা প্রবল অনাসৃষ্টি—তাই আমার কাছে সে সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ যখন অনন্ত রহস্যময় হলেন তাঁর নাম রাখলুম ঘনশ্যাম, তিনি যখন সুদর্শন চক্র হাতে নিয়ে সংহারমূর্তি ধরলেন, তখন তাঁর পায়ে লুটিয়ে বললুম, হে রুদ্র, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার এই সংহারলীলার মধ্যেই যেন কল্যাণকে বুঝতে পারি।

গায়ত্রী এবার হাসিমুখে বললে, মীনাক্ষীদি, তোমার এই অসুখ সারতে সময় নেবে। এই ব'লে সে চ'লে গেল।

ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রশাবকের দল যেমন বাঘিনীকে ঘিরে বসে, তেমনি ক'রে মীনাক্ষীকে ঘিরে এই লেনিন আর ট্রটস্কির দল রান্নাঘরে খেতে ব'সে যায়। বেশির ভাগই থালার বদলে খবরের কাগজ পেতে ভাত খায়। চায়ের পেয়ালায় ডাল, প্লেটে তরকারি, বাঁ হাতে বেগুন ভাজা, ভাতের মাথায় ঝোল,—কিন্তু তাতেই তাদের যেমন আনন্দ, তেমনি কলরব। সোভিয়েট্ রাশিয়ার বিপ্লবের দিনে নিশ্চয়ই মেট্রনরা বিপ্লবীদের ঠিক এমনি ক'রেই খাওয়াতো। সুব্রত বলে, তরকারী সুস্বাদ হয়েছে তুমি রেঁধেছ ব'লে, শুন্‌ছ মীনাক্ষী ?

এবাড়ীতে সবাই তুমি, সবাই কমরেড্। মীনাক্ষী বললে, সোভিয়েট রাঁধুনির চেয়েও ভালো ?

অনবদ্য! লেনিনের বক্তৃতাও এত মিষ্টি নয়! তরকারির গুণের চেয়ে তোমার হাতের ছোঁয়ার অনেক দাম।—এই ব'লে সুব্রত ব্যাঘ্রের মতো মীনাক্ষীর দিকে তাকায়। তার তরুণ বয়সের বড় বড় দুই চক্ষু ক্ষুধায় যেন জল জল করতে থাকে।

মীনাক্ষী বলে, মাথা হেঁট ক'রে খাও, আমার মুখ দেখলে তোমার পেট ভরবে না, সুব্রত।

পরিহাস ক'রে তখনই সুব্রত বলে, পেটের ওপরে শরীরের যে-অংশ সেটা কিন্তু ভরবে কানায় কানায়।

মীনাক্ষী বললে, শুনছ দেবেন, তোমার কম্‌রেডটিকে সামলাও। এর পর হয়ত আমাকে একলা পেয়ে হাউমাউ ক'রে প্রণয় নিবেদনই ক'রে ফেলবে।

দেবেন বললে, ভয় কি, তুমি ত সাম্যবাদিনী!

সর্বনাশ! এটা ত' আর মহাভারতের যুগ নয় যে, দ্রৌপদী কেষ্ট ঠাকুরকেও বলবেন অন্তর্যামী। আমি জানি, স্বয়ং লেনিন সাহেবও এমন সাম্যবাদ পছন্দ করতেন না। সুব্রত, লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে থেকো না, মুখ তুলে বলো, হে কমরেড্ মীনাক্ষী, আমি তোমাকে ফেয়ার কমরেড্ করতে চাই। আমি তার

উত্তরে বলবো, হে ষ্ট্রংগার কমরেড্, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রতে পারলে বাধিত হতুম। বুঝলে সুব্রত, ঝঞ্ঝাটটা তাড়াতাড়িই সেরে ফেলো।

ব্যাঘ্রশাবকরা হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

প্রমীলা নামক একটি তরুণী ব'লে উঠলো, সুব্রত বোধ হয় মনে করেছে পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া সোজা, মীনাক্ষীদির মন পাওয়া অনেক কঠিন।

সুব্রত বললে, সকলে মিলে আমাকে লজ্জা দেবে মনে ক'রো না। প্রণয়জ্ঞাপন করলেই মেয়েদের মন পাওয়া যায় না তা আমি জানি।

গায়ত্রী বললে, তবে কিসে পাওয়া যায় বলো ত, সুব্রত ?

মানে, করিৎকর্মা হ'তে হয়,—কঙ্করের মতন ধাপ্পা দিতে হয়।

মীনাক্ষী কৌতুক কটাক্ষ ক'রে বললে, কিন্তু ধাপ্পা দিতে গেলে যে কিছু বুদ্ধির দরকার।

সুব্রত যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বললে, ধাপ্পায় কিছুদিন মুগ্ধ করা যায়, চিরকাল নয়।

সর্বনাশ!—দেবেন বললে, চিরকালের কথাটা এসে পড়লো কেন রে ? চিরকাল যে কিছুই থাকে না, এমন কি ইংরেজের আত্মসম্মান পর্যন্ত না। চিরকালের কথাটা এনো না, কমরেড।

সুব্রত বললে, মেয়েরা ফাঁকি ধরতে জানে না।

মীনাক্ষী বললে, একটু জানে বৈ কি, নৈলে হাসছি কেন ? গলার আওয়াজে মনের চেহারাটা দেখতে পাই তাই ত' পাঁচজনকে চালিয়ে বেড়াতে পারি।

কথাটায় সুব্রত একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মুখখানা গম্ভীর ক'রে বললে, ফাঁকি ধরতে তারা একটুও জানে না। মনে করেছিলুম খবরটা চেপেই যাবো—

সকলে উৎসুক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালো।

সুব্রত বললে, পরশু দুপুরবেলা আসছিলুম মেট্রোর সামনে দিয়ে। কঙ্ক

দেখলুম একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটির সাজসজ্জা যেন একটা বীভৎস অশ্লীলতা প্রকাশ করছে। •আমাকে ভুল বুঝো না তোমরা। তরুণ তরুণী সিনেমা দেখতে যাবে এ দৃশ্য বরদাস্ত করার উদারতা অবশ্যই আমার আছে। কিন্তু যা দেখলুম সেটাকে আর যাই হোক, সভ্যতা বলা চলে না। দিনের বেলা—ফুটপাথের ওপর—চারিদিকে লোকারণ্য—তার মাঝখানে দুজনের কী কুৎসিত হাসি, কী কদর্য ঢলাঢলি! একে তোমরা বলবে আধুনিক যুগ, একে তোমরা বলো স্বাধীন প্রণয়?

মীনাক্ষী বললে, আমার বিশ্বাস দুজনে মদ খেয়েছিল।

অতটা আমি বলতে চাইনে—হয়ত সেটা সত্য নয়!

তবে ঢলাঢলিটা কি রকম? বালীগঞ্জী বুর্জোয়াদের বাড়ীতে যেমন হয়?

না, ঠিক অতটা নয়! কেন আমি মিথ্যে বল্‌ব?

মীনাক্ষী চোখ মট্‌কে বললে, প্যারিসের নাচঘরে রাত্রে যেমন হয় শুনেছি, সেই রকম কি?

সুব্রত মুখের একটা শব্দ ক'রে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তা হলে বুঝতুম এ দেশের মেয়েদের প্রাণ আছে, ছেলেদের ভিতরে ভোগ করার বিক্রম আছে।

তবে ঠিক কি রকম? টেম্‌স্‌ নদীর টানেলের আশ্রয়ে বিমান আক্রমণকালে যা ঘটতো শুনেছি, সেই রকম কি? লজ্জা কি, বলো?

এই ধরো না কেন, হাত ধ'রে হাসাহাসি উঁচু গলায়। এটা ত' আর এখনো বিলেত হয়ে ওঠেনি।

দেখে তোমার ঈর্ষা, না ঘৃণা হোলো, সুব্রত?

ঈর্ষা হোলো এই কারণে যে, আমি আজও এতখানি উচ্ছৃঙ্খল হ'তে পারিনি। ঘৃণা হোলো এই কারণে যে, সকল মেয়েকেই সে এইভাবে প্রতারণা করে।—সুব্রত বললে, শেলীর উচ্ছৃঙ্খলতাকে বুঝতে পারি, কিন্তু বায়রণের কামুকতাকে আমরা সকলেই—

মীনাক্ষী গলা পরিষ্কার ক'রে বললে, সুব্রত, তুমি আমাকে তাতিয়ে তুলতে চাও। কিন্তু মনে রেখো শেলীর ভিতরে ছিল একটি কোমল কিশোরী বালিকা, আর বায়রণ ছিল পুরুষ,—পুরুষ কেন মহাপুরুষ। শেলী কেঁদেছে আকণ্ঠ ঐশ্বরিক বেদনায়, কিন্তু বায়রণ মনে মনে ঘৃণা করেছে নারীকে, সমাজকে, জাতিকে, ঈশ্বরকে। শেলীর মৃত্যু হয়েছিল প্রকৃতির কোলে, আর বায়রণ মরেছিল অসুরের মরণ! তুমি যাকে কামুকতা বলছ আমি তাকে বল্‌ব প্রবল আত্মসংহার। 'পুরুষ তখনই অসাধারণ, বহু মেয়ে যখন তাকে কামনা করে।' তুমি আমাকে খোঁটা দিতে চাও আমি জানি, তাই তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলি, সবাই তাকে চায় ব'লেই সে আমার কাম্য। যাকে কেউ চায় না সে-দরিদ্রকে আমি সহ্য করিনে। যার মনে রঙ আছে সেই সবাইকে রঙীন ক'রে তোলে!

সুব্রতর মুখখানা একটু বিবর্ণ দেখাতে লাগলো। সকলেরই মুখে চাপা হাসি আর কৌতুক কানাকানি। মাঝ থেকে সেদিনকার খবরের কাগজপাতা আহারের আসরটা বেশ জমে উঠেছিল।

তবু শেষকালে উঠে যাবার সময় সুব্রত তার শেষ মন্তব্যটা প্রকাশ না ক'রে স্থির থাকতে পারলো না। বললে, সকলে যাকে চায় তাকে চাওয়ায় একটা কাঙালপনা আছে, মনে রেখো মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী জবাব দিল, কিন্তু প্রার্থনা যার সত্য হয় সেই পায় ঠাকুরের দয়া।

ভয় নেই, দয়াই পাবে, অধিকার পাবে না।

হেসে মীনাক্ষী বললে, নিজের কথাটা নিজেই তুমি মনে রাখলে খুশী হবো।

সেদিন উঁচুদরের একটা মহতী সভার আয়োজন যেন কে টবেলা থেকে বিষয়টা ছিল, সমাজতন্ত্র ও ভারতবর্ষ। পশ্চিম ভারতের একজন যারা খুব সাম্যবাদী ছিলেন সভাপতি। সকলেরই লক্ষ্য ছিল কলিকাতার বিশেষ মার পার্কের দিকে। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় সভা। গান্ধীজীর একজন ভক্তশিষ্য—যিনি এক বিখ্যাত পাটকলের ক্রোরপতি মালিক—তিনি সভা উদ্বোধন করবেন।

বাড়ীতে বুড়ি দিদিমা ছাড়া আর কেউ না থাকলেই মানানসই হোতো। কিন্তু মীনাক্ষীকেও থাকতে হয়েছিল। মেয়েরা রহস্যময়ী, অনেক সময় যাবার ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া তাদের ঘটে না, শারীরিক কারণের অছিলায় তারা শিষ্ট হয়ে বন্দিনী সাজে। শুয়ে শুয়ে মীনাক্ষী ট্রটস্কি সাহেবের 'জীবনের সমস্যা' নামক বইখানির পাতা ওল্‌টাচ্ছিল। এমন সময় বাইরে শব্দ পাওয়া গেল। অতি পরিচিত পায়ের শব্দ, সুতরাং বইখানা পাশে রেখে মীনাক্ষী পরিহাস ক'রে বললে, 'বহুদিন হোলো কোন্ ফাল্‌গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়,—'ওঃ তুমি, সুব্রত? কি খবর, সভায় যাওনি?

যাকে আশা করা গিয়েছিল সে নয়। তবু যাই হোক, মীনাক্ষী উঠে বসলো। অনেকটা বিরক্তির সঙ্গে অনেকখানি সৌজন্য প্রকাশ ক'রে বললে, সভায় গিয়ে বেশ ক'রে গলাবাজি ক'রে এলে ভালোই ত' হোতো?

সুব্রত বললে, তার চেয়ে বড় কাজ আমার বাকি ছিল, তোমার কাছে এসে ক্ষমা চাওয়া।

মীনাক্ষী বললে, অর্থাৎ?

অর্থাৎ আমাকে তুমি যা মনে করো আমি তা নই।

আমি যদি তোমাকে খুব ভাল ছেলে মনে ক'রে থাকি, সুব্রত?

সুব্রত বললে, তাহলে বুঝবো যে তুমি আমাকে বিদ্রূপ করছ। তোমার অপমান বরং সয়, কিন্তু বিদ্রূপ অসহ্য।

মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, তার কারণ?

'পমানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া সহজ কিন্তু বিদ্রূপ গিয়ে এমন
মীনাক্ষী ঘাত করে যেখানে দুর্বলতা।
চাও ! হেসে মীনাক্ষী বললে, তোমাকে অপমান আর বিদ্রূপ—দুটোই করতে চাইনে। তুমি ত' আমার কোনো ক্ষতিই করোনি, সুব্রত? যাদের আমি কোনদিনই কোন উপকার করতে পারিনি তাদের অনেকেরই ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তুমি তাদের মধ্যে একজন। আমি জানি তুমি আমার ক্ষতি করবে না, যেহেতু আমার ক্ষতি করা যায় না—তবুও তোমার প্রতি বিরূপ হবো কেন বলো? স্ত্রীলোকের জীবনে সকলের বড় যে-গৌরব, ভালোবাসা—তাই তুমি আমার প্রতি প্রকাশ করতে চাও, আমি জানি কারণে অকারণে অনেকদিন থেকে তুমি আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াও ছায়ার মতন, মেয়ে মানুষ হয়ে সেদিক থেকে আমি কেমন ক'রে চোখ ফিরিয়ে থাকবো বলো দেখি?

সুব্রত বললে, ভয়ে ভয়ে এসেছিলুম তোমার এখানে, এমন মধুর ব্যবহার যে পাবো আশা করিনি। সেদিন তোমাকে অনেক কঠিন কথা বলেছি, মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী বললে, কিছু লাগেনি, কেন জানো? আমার কিছুতেই লাগে না। গায়ের চামড়া শক্ত ব'লে নয়, মনের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না সেই কারণে।

সুব্রত নত মস্তকে কিছুক্ষণ ব'সে রইল। কিন্তু নীরবে ব'সে থাকা সম্ভব নয়। বাড়ীটা একরূপ নির্জন, সময়টা মধুর আলাপের উপযোগী, মীনাক্ষী আনমনা,—এমন অবসর তরুণের জীবনে অল্পই পাওয়া যায়। মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, সুব্রত, বছর ছয় সাত আগে আমি একটা ছেলেমানুষী কাণ্ড ঘটিয়েছিলুম—সে ভারি মজার—

সুব্রত মুখ তুলে তাকালো। মীনাক্ষী বলতে লাগলো, তখন সবেমাত্র আই-এ পাশ করেছি, অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। মনে করলুম আমার যোগ্য সৎপাত্র যখন দুনিয়ায় পাওয়াই যাবে না তখন দুঃখ ক'রে লাভ নেই,—আমি দেশের কাজে নামবো।

তারপর ?—সুব্রত বললে।

আগের কথা একটু ব'লে নিই।—মীনাক্ষী বললে, ছোটবেলা থেকে ছেলেদের সঙ্গেই আমার বেশি ভাব, ছেলেদের খুব ভালো লাগতো। যারা খুব চতুর তারাই সব চেয়ে বোকামি প্রকাশ করতো, আর তাই নিয়েই আমার ছিল আনন্দ। যতদূর মনে পড়ে ছোটবেলা এক আধজন ছাড়া কারো সঙ্গে আমার ছোঁয়াছুঁয়ি হয় নি, ওসব আমি জানতুম না। প্রকৃতিদেবীর দুর্দান্ত তাড়নায় শৈশবে ও কৈশোরে বুদ্ধি বিবেচনাহীন নানা ঘটনা ঘটে যায়—সেই জন্য ওগুলো মনে দাগ কাটতো না—।

সুব্রত ফস ক'রে বললে, এসব আমার কাছে স্বীকার করার মানে জানো ?

জানি বৈ কি, তুমি যদি এর থেকে নিজের কিছু শিক্ষা পেয়ে যাও মন্দ কি ?

শিক্ষা নিতে এলুম তোমার কাছে এই নির্জন সন্ধ্যা বেলায় ? আচ্ছা যাকগে, বলো শুনি।

মীনাক্ষী বললে, কিশোর কালের পর যখন সর্বাঙ্গে তারুণ্যের তরঙ্গ দেখা দিল, রক্তের মধ্যে এলো একটা অদ্ভুত চেতনা। চৈত্রের আগুনের হাওয়ায় যেমন কাঁচা ডালিমের প্রাণতন্ত্রে রং ধরে, যেমন ক'রে তার মধ্যে মধুরের সঞ্চার হয়, আমি ঠিক তেমনি একটা অদ্ভুত রসের কাঁপনে সারাদিন থর থর করতুম। হেসোনা সুব্রত, ঠিক সেই সময় এই তোমাদের মতনই এক ভ্রমরকে পাওয়া গেল। তার পাখায় যে-গুঞ্জন শুনলুম, তার সুরের সঙ্গে মিলে গেল অশোক গাছের কাঁপনের তাল। তখন রঙের উত্তাপে ঝলসানো আকাশের সঙ্গে আমার কানাকানি চলেছে। মনে মনে বললুম, 'যে-কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে, সে-কাঁদনে সেও কাঁদিল ; যে-বাঁধনে মোরে বাঁধিছে, সে বাঁধনে তারে বাঁধিল!'—মনে করো সুব্রত, তখন আমি আই-এ পাশ করা মেয়ে, জ্ঞান বেশ হয়েছে,—আর কিছু না হোক মানবসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণটা গোপনে বই থেকে প'ড়ে নিয়েছি। ডক্টর মারি স্টোপসের বইখানা প'ড়ে তিন চার জন সহপাঠিনীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র

করছি,হ্যাভলক্ এলিস পড়বো কিনা। ঠিক এমনি সময়ে সে 'এসেছিল মন হরিতে মহা পারাবার পারায়ে, ধরিবে কি ধরা দিবে সে, আপনারে গেল হারায়ে।'

সুব্রত বললে, চমৎকার তোমার কবিতার চরণগুলো, যে লিখেছে, সে রবিঠাকুরের চেয়েও ভালো লেখে।

মীনাক্ষী বললে, তুমি যখন জানো না তখন ইচ্ছে করছে নিজের নামেই চালিয়ে দিই। কঙ্করের এক কবি বন্ধু রবিঠাকুরের পুরনো কবিতা উল্‌টে নিয়ে পদ্য লিখতে বসে। তাতেই তার খ্যাতি। তরুণ পাঠকরা বলে, রবিঠাকুরের পর বাঙ্গলা দেশে এই প্রথম রিয়লিস্ট্ কবি।

তার উত্তরে শান্তিনিকেতনের প্রাচীন বনস্পতি কি বলেন?

অনেক গোপন তদ্বির আর মিনতির পরে তিনি দু'ছত্র আশীর্বাদ লিখে পাঠান্—'তোমার কবিতায় নবাঙ্কুরোদ্‌গমের সম্ভাবনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে।' সেই চিঠি পকেটে নিয়ে ছোকরা কবি সাপ্তাহিকের সম্পাদক হয়ে বসেছে। এখন সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, এবং সাহিত্যিক মহলে রবিঠাকুরের সাহিত্যের নির্ভীক সমালোচনা করতে বসে। সবাই বলে, আসছে বারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে ওকে সাহিত্যশাখার সভাপতি করা হোক। ওই সভাপতি হবার যোগ্য।

সুব্রত হেসে বললে, এরাই বুঝি কঙ্করের বন্ধু।

মীনাক্ষী বললে, এই বোকারা তার বন্ধু হ'লে হয়ত তুমি খুশী হ'তে, কিন্তু এরা বন্ধু নয়—এদের নিয়ে সে পুতুল খেলা করে। আচ্ছা, তারপর শোনো আমার প্রণয়োপাখ্যান! পক্ষীরাজের পিঠে চ'ড়ে এলো শূন্যপথে তরুণ রাজকুমার। তারপর সে একটা দারুণ ওলোটপালট—তরুণ সাহিত্যিকদের উপন্যাস আর গদ্য কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলুম। অবশ্য জরটা ছাড়লো মাস ছয়েকের মধ্যেই। প্রকাশ থাকে যে, অনেকখানি অশ্রু বিনিময় হয়ে গেল কিন্তু একটিও চুম্বন বিনিময় হোলো না। অর্থাৎ প্রাণের গদ্গদ অনেকখানি চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সুব্রত কৌতুক ক'রে বললে, বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস করা কঠিন, কারণ আমার সেই তদানীন্তন প্রাণেশ্বর ছিলেন একজন উঁচুদরের রোমান্টিক। কিন্তু অল্পদিনই পরেই মদীয় পিতৃদেব তাঁকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার ক'রে বসলেন। প্রাণভয়ে সে বেচারা আমার কাছে একদিনের মধ্যেই বিদায় গ্রহণ করলো। অনেকদিন পরে সে তার এক দূর সম্পর্কের অনুজার প্রতি আসক্ত—এই খবর আমার কানে এলো। আর আমিও তখন, 'তাহাকেও বাদ দিয়ে দেখি বিশ্বভূবন মস্ত ডাগর'!—এই আমার অন্যতম প্রণয় কাহিনী—বুঝলে সুব্রত?

সুব্রত করুণ কণ্ঠে বললে, আমাকেও কি তুমি সেই দলে ফেলতে চাও?

মীনাক্ষী বললে, তুমি সঠিক উত্তর পেলে খুশী হবে?

নিশ্চয়ই, পুরুষ মানুষ সকল সময়েই নগদ বিদায় চায়।

তবে শোনো।—মীনাক্ষী বললে, আমার কথা বাদ দিই, কারণ আমি গৃহস্থ মেয়ে নই,—নগণ্য গৃহস্থালী আমার ঘৃণার বস্তু। কিন্তু যারা সত্যকারের গৃহস্থ, ভদ্র সম্ভ্রান্ত যেসব পরিবারকে সংসারের লক্ষ্মীরা মাথায় ক'রে নিয়ে থাকেন, যাঁরা করুণায় মমতায় বিবেচনায় পরার্থপরতায় গার্হস্থ্য জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন —তাঁদেরও পরীক্ষা ক'রে দেখো, তাঁদেরও প্রাণের মধ্যে একটা স্থায়ী আমানত আর একটা চল্‌তি হিসাব খোলা আছে। অতিথি, সজ্জন, বন্ধু, পরিচিত, নিমন্ত্রিত—এরা তাঁদের প্রাণের চল্‌তি হিসেবের কোঠায় পড়ে। তুমিও আমার সেই চল্‌তি হিসেবের মধ্যে আছো, সুব্রত।

সুব্রত যেন কোথায় আঘাত পেলো। বললে, আর তোমার স্থায়ী আমানত কাদের নিয়ে?

ঘরের মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছিল। কিন্তু জানলার কাছে থাকার জন্য মীনাক্ষীর শরীরের উত্তরাংশে আকাশ থেকে দ্বাদশীর চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্যটা এসে পড়েছে। সুব্রত সেই দিকে মুগ্ধ ও ব্যথাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

মীনাক্ষী হাসলো। বললে, এদিকে এগিয়ে এসো, তোমার মুখের ভাব-পরিবর্তনের রেখাগুলো বুঝতে পারছিনে।

ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে সুব্রত এগিয়ে গেল। বললে, এই আমি চেয়েছিলুম মীনাক্ষী, তুমিই আমাকে এগিয়ে আসতে বলবে। এই আমার সকলের বড় স্বপ্ন।

মীনাক্ষী বললে, আরো এগিয়ে এসো মাথার কাছে। মাথাটা বড় ধরেছে, একটু কপালটা টিপে দাও।

সুব্রত উল্লসিত কণ্ঠে বললে,তবে না তুমি আমাকে এই কথাটা মনে রাখতে বলেছিলে, আমি দয়াই পাবো অধিকার পাবো না ?

জবাবে মীনাক্ষী হাসলো।

হাত কাঁপছে, মীনাক্ষী।—সুব্রত বললে, সমস্ত জীবনের মূলে ভূমিকম্প হচ্ছে। এই তোমাকে প্রথম স্পর্শ করলুম।

এইটুকুতেই ভূমিকম্প ? দেখি তোমার হাতখানা ?—নাঃ ঠিক আছে, এখনো নাড়ি ছাড়েনি ! নাও, মাথাটা একটু টিপে দাও।

কম্পিত কণ্ঠে ঢোক গিলে সুব্রত বললে, মাথা ধরলো কেন তোমার, মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী বললে, ওটা মেয়েদের শরীর-শাস্ত্রের কথা, অমন হয় প্রায়ই, প্রকৃতির নির্দেশ। কৈশোরে মেয়েদের মাথা ব্যথা আরম্ভ, প্রৌঢ়ত্বে শেষ ! —যাক্ এইবার তুমি তাহ'লে অধিকার পেয়েছ, সুব্রত ?

ভাঙাগলায় সুব্রত বললে, সম্পূর্ণ নয়।

হাসিমুখে মীনাক্ষী বললে,আচ্ছা,এই আমি চোখ বুজে রইলুম, তুমি আমার মাথাটা চিবিয়ে খাও। সুব্রত, মাথাটাই সব, বাকিটা কিছু না। আমি যদি এখানে পাগ্‌লা গারদে থাকতুম তুমি এ বাড়ী মাড়াতে না। এইবার শোনো, আমি কি বলতে চাই। তুমি নিশ্চয় জেনে রেখো সুব্রত, আমিও মাছ ধরতে

ভালবাসি। কিন্তু তাকে খেলিয়ে তুলতে চাইনে, একটানেই তুলতে চাই। তোমাকে আজ এই সন্ধ্যাকালে আমার খুব ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে কিছু দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে ফেলি।

সুব্রত বললে, আমি তাহ'লে ধন্য হবো।

মীনাক্ষী বললে, নিতান্ত পশু না হ'লে আমি পুরুষকে অপমান ক'রে তাড়াইনে, আর অপমান করতে আমি খুব ভালো জানি। সুব্রত, তোমাকে আমি ভালোবেসেছি তাই তোমার কাছে আমার অনেক প্রত্যাশা।

হুকুম করো?

আগে বলো তোমার কে কে আছেন?

বাবা, দুই বোন, তিন ভাই, এক মামা, দুই কাকা,—আর পিসিমারা।

সবাই এক সঙ্গে থাকো?

হ্যাঁ, কেবল মামারা বাদ।

তোমার মা নেই, না সুব্রত?

মা ছোটবেলা থেকেই নেই।

মীনাক্ষী একটুখানি চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, সুব্রত?

সুব্রত তার উপরে ঝুঁকে পড়লো। মীনাক্ষী বললে, আমার বুকের ওপর কান পেতে দেখো ভেতরে কোথাও আন্দোলন নেই, শুধু প্রাণের স্পন্দনটুকু আছে, বিশ্বাস করতে পারো?

পারি। মনে হচ্ছে পাথরের গায়ে হাত বুলিয়ে চলেছি। তুমি মাটি, না পাথর, মীনাক্ষী?

মীনাক্ষী বললে, দুটোর একটাও আমি নই, আমি কেবল মাত্র বাঙ্গলা দেশের মেয়ে। আমার বুকের মধ্যেই আছেন তোমার মা, বোন, পিসি, স্ত্রী, প্রণয়িনী। আমার বুকের মধ্যেই আছে তোমার কল্যাণ, তোমার সংহার।

এত ঐশ্বর্য আমার মধ্যে রয়েছে তাকে গ্রহণ না ক'রে তুমি আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চাও কেন, সুব্রত ?

সুব্রত বললে, তুমি কি বল্ছ আমি বুঝতে পারছিনে, মীনাক্ষী। আমি কি তোমার কোন ক্ষতি করছি ?

ক্ষতি সামান্য, ক্ষতি আমার হয় না। কিন্তু আমার প্রাণ তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক চাইছে তাকে তুমি এত সহজে পদদলিত করবে, সুব্রত ?

কী সম্পর্ক, মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী বললে, সহজ কথায় বলবো। সেই সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা যৌনশুচিতার ওপর। সমস্ত আত্মীয়তা আর ভালোবাসার ওপরেও যে সম্পর্ক অম্লান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! বাঙালী মেয়ের দেহের শুচিতাকে মলিন করা খুবই সহজ, কিন্তু তুমি যে আমার কাছে ছোট হয়ে যাবে সেই নৈরাশ্যই আমাকে ধ্বংস করবে! কমরেড, তুমি কি আমার সেই বিপুল ক্ষতি কামনা কর মনে মনে ?

সুব্রতর হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল। ভগ্ন কণ্ঠে ধীরে ধীরে সে বললে, আমি যেন তোমার কথাটায় মনে মনে অপমানিত বোধ করছি।

বিশ্বাস করো অপমান তোমাকে করিনি। এই একা ঘরে তুমি আর আমি। তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করছি আমার এই সুন্দর দেহকে আমি কেবলমাত্র ভোগের জন্য পথে টেনে আনিনি।—মীনাক্ষী বললে, আমারো সবাই আছে, আমিও সব পেতে পারতুম, কিন্তু একটা অসাধারণ জীবন যাপন করার জন্য আমি সব ছেড়ে এসেছি। নাটক-নভেলে তুমি নিশ্চয় নারী-বিদ্রোহ প'ড়ে থাকবে, তারা আধুনিক নাম নিয়ে চলে, কিন্তু সেই পুরনো বাড়ীতে চুনকাম ক'রে নতুন ব'লে চালানো। আমার মধ্যে প্রাচীন আছে কিন্তু জরা নেই, প্রবীন আছে কিন্তু বার্ধক্য নেই। সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ে আমি নই, আমি সেই আবহমান কালের নারী। নিজের গৌরব আমি প্রচার করছিনে, কিন্তু অনেক ছেলে আমাকে চেয়েছে,—দেখেছি তাদের সেই চাওয়ার

মধ্যে সেই পুরনো কথা, সেই পুরনো কামুকতা নতুন পোষাকে·ঢাকা ; একই লালসার বিভিন্ন সাজসজ্জা।

সুব্রত বললে, এটাও আবহমানকালের, মনে রেখো। যদি একে তুমি অস্বীকার করো বুঝবো তুমি অসুস্থ, জানবো তোমার মধ্যে স্বভাবের বিকার ঘটেছে। বলবে সত্যি ক'রে, কঙ্করের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ?

সত্যিই বল্‌ব। তার মধ্যে আমি বিচিত্রের সন্ধান পাই। আলোয়-ছায়ায় ভালোয়-মন্দয় সত্যে-মিথ্যায় সে অপরূপ।—না না, মানুষ মাত্রেই এমন নয়। অকল্যাণ আর অধঃপতনকে নিজের জীবনে এমন সত্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে অনেকেই পশ্চাদ্‌পদ হবে। নিচের দিকে যখন সে নামে একেবারে অতলে চ'লে যায়, ছুটে যদি চলে একেবারে যায় চরম শেষের দিকে, আর যদি ওপর দিকে উঠতে তার মন যায় তবে সে গিয়ে পৌছয় উর্ধ্বতমলোকে। মানুষকে ভেঙে নতুন ছাঁচ গড়বার তার অদ্ভুত শক্তি।

সুব্রত বললে, তুমি তার কে ?

মীনাক্ষী বললে, কেউ নয়, সহধর্মিনী মাত্র। যাকে বলে, বজ্রদণ্ডের সঙ্গে বিদ্যুৎ-লতা। তাকে স্বীকার করিনে কিন্তু সাহায্য করি। সে যখন সর্বনাশ ক'রে চলে, আমি তার ব্যাখ্যা ক'রে যাই, এই মাত্র।

সুব্রত উঠে দাঁড়ালো গা ঝাড়া দিয়ে। দরজার দিকে এগিয়ে এসে বললে, ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছি তোমার কাছে, আর ব'লে যাচ্ছি ভুল আমার ভাঙলো। এই বিশ্বাস নিয়ে চলে যাচ্ছি তুমি কারো নয়, কোনোদিন কেউ তোমাকে সম্পূর্ণ পেতে পারবে না। তোমার এই ভয়ানক আত্মস্বাতন্ত্র্যের জন্যই তোমার চির নির্বাসন। আশ্রয় তোমার কোথাও নেই। তোমার ওপর কোন আক্রোশ করব না, বরং মনে হচ্ছে যেন অন্ধকূপ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলুম। তোমার বন্ধুত্বের এইটুকু দান নিয়েই আমি চ'লে যাচ্ছি, মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, এসো ভাই, কম্‌রেড।

## ছয়

কঙ্কর এসে হাজির হোলো দুপুর বেলায়। মীনাক্ষী তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললে, গঙ্গাস্নান ক'রে এসেছ ত ?

বটে !—কঙ্কর বললে, খোঁচাটা তোমার বুঝলুম। স্নান ক'রে এসেছি বটে, তবে গঙ্গায় নয়—সমুদ্রে।

মানে ?

মানে, গিয়েছিলুম গঙ্গাসাগর, পুণ্য সংগ্রহ করতে।

হাসিমুখে মীনাক্ষী বললে, তোমার পুণ্য সংগ্রহ শুনলেই আমার ভয় করে। নিশ্চয় কোথাও বিষ ছড়িয়ে এলে। একটুখানি পুণ্যের চারিদিকে বহু পাপের বাসা। যেমন কালীঘাটের মন্দিরের চারিপাশে পতিতাদের আড্ডা। খুব নোংরা ঘেঁটে এসেছ ত ?

কঙ্কর বললে, খুব বেশি নয়। সামান্য নোংরা সমুদ্রের ঢেউয়েই ধুয়ে গেছে। এসেছি নতুন মানুষ হয়ে।

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে মীনাক্ষী বললে, গতিক ভালো নয়, বোধ হয় জাত খুইয়ে এসেছ। কই, চেহারাও ত' ভালো দেখছিনে, যেন উড়ু-উড়ু ভাব—চোখে কেমন যেন ঢুলু ঢুলু ঘুম,—সর্বাঙ্গে যেন রসের ভাবাবেশ। ব্যাপার কি বলো দেখি ?

কঙ্কর বললে, চরিত্র নষ্ট ক'রে এসেছি।

ওরে বাবা, আবার বড় বড় কথা! চরিত্র একটা কিছু থাকলে অবশ্যই এতদিনে নষ্ট করতে! নেই বলেই ত' আমি খুশী। যদি থাকতো তবে

তোমার চরিত্র রক্ষা করতে করতেই আমার প্রাণান্ত ঘটতো। এখন সহজ ক'রে বলো দেখি ব্যাপারখানা কি?

চেনো দেখি ভালো করে? দেখতে পাও মাথায় মোহন চূড়া আর পরণে পীতধড়া? হাতে বাঁশের বাঁশরী?—কঙ্কর ভঙ্গী ক'রে দাঁড়ালো।

মীনাক্ষী বললে, এখানে কেউ নেই তাই ক্ষমা করলুম তোমাকে। মোহন চূড়া? নাপতের পয়সা জোটেনি যে চুল কেটে দেয়। পরণে ত সেই আমার শাড়ির পাড় ছেঁড়া কাপড় আর সেই এক টাকা এক আনা দামের পৌরাণিক পিরান—বাঁশীর বদলে ক্যাভেণ্ডার সিগারেট,—মরি মরি, শ্রীরাধিকার রুচি দেখলে বমি আসে।

কঙ্কর বললে, চোখ থাকলে চিনতে পারতে, দেখতে পেতে সাগর থেকে ফিরেছি কিন্তু তরঙ্গগুলো এনেছি বুকের মধ্যে ধ'রে। ওঃ চোখ দুটো অমনি বড় বড় হয়ে উঠছে, ওই কুৎসিত মেয়েলী কৌতূহল চোখ থেকে মুছে ফেলো তবে বল্‌ব।

মীনাক্ষী চোখ পাকিয়ে বললে, বয়সে ছোট না হ'লে তোমাকে বেশ একচোট ধমক দিতুম।

কঙ্কর বললে, তোমাকে আর কেয়ার করিনে। ধমক শোনবার মানুষ পেয়ে গেলুম।

কে তিনি? আদম, না ইভ্?

ইভ্ গো, তোমার দিদিমা।

বয়স কত?

মেয়েরা সব বয়সেই মনোমোহিনী। চোদ্দ থেকে বিয়াল্লিশ!

চেহারা?

মেয়ে মানুষ, এই পর্যন্ত।

রূপ?

'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা!'

ভঙ্গী?

'দ্বিধায় জড়িতপদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে!'

আবেদন?

কঙ্কর বললে, "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

মীনাক্ষী বললে, জীবিত, না মৃত?

ভয়ানক জীবিত! টুঙ্ ক'রে টোকা দিলে ঝনঝন শব্দ হয়।

তবে বুঝলুম তোমার মনে বসেনি, রঙ্ ধরেছে। প্রথম পালা শেষ করেছ?

মানে?

মানে—কটাক্ষ, নিশ্বাস, মৃদু হাসি, চলন ভঙ্গী, ইঙ্গিতাত্মক আলাপ—এই সব?

কঙ্কর বললে, অনেকটা এগিয়েছে।

তবে আর কি, একটা উপন্যাস আরম্ভ ক'রে দাও? যেটুকু পেরেছ সেটুকুর ওপর রং ফলাও, আর যেটুকু পারোনি তাই নিয়ে কান্নাকাটি করো। ওতেই জনপ্রিয় উপন্যাস হবে ভয় নেই। থার্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েরা বাহবা দেবে!

না, মনে করেছি কবিতা লিখবো। সে আমার কবিতা! তার মধ্যে কাহিনীর চেয়ে স্বপ্নটাই বড়,—ইতিহাসের চেয়ে মহাকাব্য। বস্তুর চেয়ে ব্যঞ্জনা।

মীনাক্ষী বললে, এই বিবরণের কতখানি সত্যি আর কতখানি কল্পনা? এটা তোমার সাহিত্যিক অভিভাষণ নয় ত?

কঙ্কর বললে, তোমার সন্দেহের জন্য ধন্যবাদ। মেয়েদের রূপ হচ্ছে পুরুষের একটা কল্পনার ক্ষেত্র—এইমাত্র। প্রকৃতির আকর্ষণ বিকর্ষণ যত বেশি, পুরুষের মুখে ততই মেয়েদের স্তবগান। যে-পাখীটা ডিম পাড়ে সে অত শত বোঝে না,

কিন্তু যেটা পাড়ে না সেটাই ওর পাশে ব'সে দীর্ঘ কণ্ঠে গান ধরে। একটা কোকিল ডাক ছেড়ে বসন্তকালের কাব্যের ঘুম ভাঙায়, কিন্তু অন্য কোকিলটা সাড়া দেয়—এই মাত্র।

মীনাক্ষী বললে, তোমার রোমান্টিক আলাপ শুনলে ভয় করে, উদ্দেশ্যটা কি বলো ত?

হাসিমুখে কঙ্কর বললে, বনবিহঙ্গ এসেছে খাঁচার পাখীর কানে বনের কাহিনী শোনাতে।

উদ্দেশ্য?

অতি পরিষ্কার। নোঙর তোলো।

কোথায় যাবে?

কঙ্কর বললে, প্রশ্নটায় যেন তোমার অবনতির ইসারা শোনা যাচ্ছে। যাবো চুলোয়।

হেসে মীনাক্ষী বললে, চলো।

ও, তবে তুমি প্রস্তুত হয়েছিলে?

নিশ্চয়! নিয়ে যাবার কিছু নেই, কিছু হারাবার ভয় নেই।

কঙ্কর বললে, ওদের কাছে বিদায় নিয়ে যাবে না?

মীনাক্ষী বললে, সাম্যবাদশাস্ত্রে আছে,—এস লক্ষ্মী, যাও বালাই।

কোথাও প্রাণের সুর নেই?

বিন্দুমাত্র না।

এতগুলি কম্‌রেডদের মধ্যে কেউ তোমার প্রিয় নয়?

কম্‌রেড এখানে একটিও নেই।

মানে?

মীনাক্ষী বললে, আছে একদল ছেলেমানুষ।

কঙ্কর বললে, সে কি, যাবার সময় নিন্দে ক'রে যাচ্ছ?

না গো, ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ জানিয়ে যাচ্ছি।

তোমার টাকাগুলো কোথায় গেল ?

মুখ তুলে মীনাক্ষী বললে, দেশের কাজে দিয়েছি !

তাই নাকি ? খবরের কাগজে ত কই গোপনে খবর পাঠাওনি ?

তাহ'লে বুঝতেই পাচ্ছ যে সংব্যয় হয়েছে !

পাশের ঘরে রাশিয়ার বর্তমান অবস্থা নিয়ে যখন প্রবল কলরব চলছে সেই সময় দুজনে দুপুর রৌদ্রে'পথে বেরিয়ে পড়লো। কিছুদূর এসে কঙ্কর বললে, এত সহজে তুমি এলে দেখে ভয় পাচ্ছি, কোন্‌দিন এমনি সহজে হয়ত আমাকেই ছেড়ে যাবে।

আশ্চর্য নয়।—মীনাক্ষী বললে, সাবধানে থেকো। এটা মনে করা চলবে না যে, আমাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আমাদের দুজনের মাঝখানে আর একজন আছে, তুমি ধরো তার বাঁ-হাত, আমি ধর্‌বো তার ডান হাত।

কে সে ভাগ্যবান ?

মীনাক্ষী বললে, ভগবান !

কঙ্কর বললে, তার বয়স কত ?

চিরতরুণ।

ওরে বাবা, চেহারা কেমন ?

পরম সুন্দর।

নিবাস ?

সর্ব জীবে।

পেশা ?

সৃষ্টি, স্থিতি লয়।

জাত ?

অজ্ঞাতকুলশীল।

চরিত্র ?

মীনাক্ষী হেসে বললে, অতিশয় চতুর। ভীষণ কৌশলী। দরিদ্রের ঘরের চাল বর্ষায় ফুটো ক'রে দেয়, যারা ভক্ত তাদের পথে বসায়, মায়ের একটিমাত্র ছেলেকে হত্যা ক'রে মদমত্ত নিষ্ঠুরের হাতে তুলে দেয় রাজদণ্ড, লোভীকে দেয় প্রশ্রয়, পাপ আর অন্যায়ের হাতে তুলে দেয় বিজয়-পতাকা।

কঙ্কর বললে, তবে ত লোকটার চরিত্র ভাল নয়? অথচ তারই হাত ধ'রে তুমি চলতে চাও কেন ?

হাত ধ'রে চললে সে খুশী হয়।

কারণ ?

হাত ধরলেই সে সঙ্গে সঙ্গে চলে তখন আর দেখতে পাবে না তার চাতুরী। ডাকলে কাছে আসে না কিন্তু ধরলেই ধরা দেয়। চলার সঙ্গে সে চলে কিন্তু থামলেই সে হারায়। যারা চলে না তারা তা'র হাতে মরে।

কঙ্কর বললে, তোমার ভগবদ্ভক্তি দেখে আশ্বস্ত হচ্ছি। বুড়ো হ'লে ক'রে খাবার একটা উপায় রইলো। এসো এই দিকে।—ব'লে সে ডান দিকে ফিরলো।

এখানে কোথায় ?

বললুম না যে, এখানে আছে আমার কবিতা? এই যে এই বাড়ী। একতলায় কয়েক ঘর ভাড়াটে, আর বাড়ীওলা থাকেন ভিতরে। এস।

মীনাক্ষী চুপি চুপি বললে, তোমার বর্ণনার সঙ্গে মিলবে ত ?

কঙ্কর বললে, সম্পূর্ণ মিলবে কেমন ক'রে? 'অর্ধেক মানবী তুমি আধেক কল্পনা।' মেয়েমানুষের মানেই এই, ধরা ছোঁয়ার বাইরেই তাদের বাসা। তারা কতকগুলো রাসায়নিক বস্তুর একটা জটিল সংমিশ্রণ। খানিকটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড হৃদয়রসের জারকে ভেজানো, ছুঁলে একটু নেশা লাগে এই মাত্র।

একতলাতেই দু'জনে উঠে এসে দাঁড়ালো। বাড়ীটা তখন কি নিরিবিলি,

হয়ত অনেকে দিবানিদ্রায় মগ্ন। কঙ্কর একটা দরজায় কান পেতে ভিতরে কি যেন ফিস ফিস আলাপ শুনলো। মীনাক্ষী বললে, ভেতরে কা'বা?

ঠোঁট উল্‌টে কঙ্কর হাসলো। বললে, মনে করেছিলুম ভৈরবী বুঝি একাই জীবন যাপন করেন। ভুল ভাঙলো।

মীনাক্ষী বললে, ব্যাপারখানা কি?

'আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া।' মীনাক্ষী, প্রেমের ব্যর্থতার একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে সুই-সাইড্।

মীনাক্ষী বললে, স্ত্রীলোকের মনোভাব না জেনে যারা আগেই অনুরাগ প্রকাশ করে, তারা আকাশে প্রাসাদ গড়ে। তাদের প্রথম ওষুধ হচ্ছে পুলিশের বেত তাদের শরীরের স্থানবিশেষে! তোমার কবিতাটি তোমাব প্রতি কতদূর —মানে, কতখানি অগ্রসর, আগে জেনেছ?

কঙ্কর বললে, তোমার মাথা! অনুরাগের খবর জানতে হয় না, অনুভব আর অনুভবের ভেতর দিয়েই হয় হৃদয়-বিনিময়ের আনা গোনা। ভালোবাসার শিক্ষা তোমার হয়নি, তাহলে বুঝতে ভালোবাসতে পারাটাই বোধ হয় শিক্ষার সকলের বড় অঙ্গ, কাল্‌চারের সকলের বড পরিচয়।

মীনাক্ষী বললে, বয়সে তুমি এক বছরের ছোট সুতরাং এক বছর আমার পিছু পিছু থাকো যদি তোমার কিছু উন্নতি হয়। ওরে মূঢ়, বক্তৃতার দ্বারা প্রেমের প্রচার হয় না, পুঁথিগত তত্ত্ব আওড়ালে মানুষের মন ভোলে না, উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। পরমহংস বলো, টলষ্টয় বলো, গান্ধী বলো— ওই নজীরটা চিরস্থায়ী দাঁড়িয়ে আছে বলেই রবিঠাকুরের 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা কম। এতে কাব্য আছে, পরমাত্মিক কল্পনার সৌন্দর্য্য আছে, শুচিশুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞানের প্রকাশ মহিমা আছে—কিন্তু নেই কোন্‌টা বলো দেখি, কাঠবিড়ালী?

কিন্তু উত্তরটা শোনবার ধৈর্য মীনাক্ষীর নিজেরই রইল না, সে এগিয়ে এসে

দরজার কড়া নাড়লো। দরজা খোলাই ছিল, ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের জবাব এলো, আসুন।

মীনাক্ষী আগে ভিতরে ঢুকলো। পিছনে কঙ্কর। দেখা গেল একটি মেয়ে মাদুর পেতে ব'সে এতক্ষণ পড়াশুনা করছে। পরণে তার বিধবার সাজ, চোখে চশমা। কঙ্কর হেসে বললে, মনে করেছিলুম আর কেউ আছে আপনার এখানে। পড়ছিলেন বুঝি?

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। মীনাক্ষীকে দেখে বললে, কি আর করি। দীর্ঘ দিন, সময় কাটে না। বসুন আপনারা।

মীনাক্ষী বললে, আপনার পড়ার ব্যাঘাত হোলো।

কিছু না, পড়া ত' আছেই। আপনার কথা জেনেছি কঙ্করবাবুর কাছে। আপনি থাকবেন এখানে সেই আনন্দে আছি। এ ঘরে আপনার অসুবিধে হবে না ত?

মীনাক্ষী বললে, কিছু না, বরং আপনার অসুবিধে হবে কি না ভাবছি। আমি রাত্রে হঠাৎ এক এক সময় উঠে বিছানপত্র মাথায় ক'রে ঘুরে বেড়াই। মাঝে মাঝে শিয়াল ডাকার অভ্যাস আছে।

সে কি রকম?

কি জানি, ছোটবেলাকার অভ্যাস। এই ভয়ে মা বাবা আমার কাছে শুতে চাইতেন না। আপনার নাম কি?

ইন্দুমতী।

কঙ্কর বললে, আমি এখুনি গিয়ে ঘরের আসবাবপত্র কিনে আনছি, আপনাদের বিশেষ অসুবিধে হবে না। কাজকর্মের জন্য একটা লোক এনে দেবো, সেই রাঁধবে।

মীনাক্ষী মাদুরের উপর সটান শুয়ে প'ড়ে বললে, একটা হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলে কেমন হয়? রান্না, বাসন মাজা, এসব বড় নোংরামি।

ইন্দুমতী বললে, নোংরামি একটু সহ্য করতে হয় বৈ কি। নৈলে এত খরচ কঙ্করবাবু পাবেন কোথায় ?

মীনাক্ষী চোখ মটকে বললে,'কোনো চিন্তা নেই ইন্দুদেবী, উনি ঠিক যোগাড ক'রে আনবেন। বিয়ে-না-করা ছেলেকে কিছুদিন শোষণ করাই যাক্ না, মন্দ কি ?

কঙ্কর বললে, দেখছেন ইন্দুদেবী, আমাকে পথে না বসিয়ে আর উনি ছাড়বেন না। একটা মুক্তির উপায় আমাকে ব'লে দিতে পারেন আপনি ?

ইন্দুমতী মুখখানা গম্ভীর ক'রে ব'ললে, আমার কি দরকার বলুন, আমি ত' আপনাদেরই আশ্রিত। তবে একথা আমি বল্‌ব, সত্যি কথা আমি সকলেরই মুখের ওপর বলতে পারি,—যার কাছে উপকার পাবো তার ক্ষতি কবার চেষ্টা না করাই উচিত।

কঙ্কর বললে, ঠিক বলেছেন। আপনাকে আগেই জানিয়ে রাখি, এই যে মহিলাকে দেখছেন—চেহারাটা ওঁর অবশ্য ভদ্রমহিলারই মতন,—উনি আজ কিছুকাল থেকে আমাকে পাকড়াও করেছেন। উদ্দেশ্য যে ভালো এমন কথা বলতে পারব না, উদ্দেশ্য যে মন্দ তার প্রমাণও কিছু-কিছু পেয়েছি। উনি কিছু লেখাপড়া জানেন, গোটাকয়েক ইংরেজী শব্দ ওঁর মুখে মুখে ফেরে। ওঁর পূর্ব পরিচয় আমার জানা নেই, কতকগুলো আঁস্তাকুড মাডিয়ে এসেছেন তাও আমি বলতে পারব না,—উনি আমার জীবনের ওপর চডাও হয়ে আমাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছেন। ওঁকে আজ আপনার কাছে এনেছি তার মানে আমি কোথাও ওঁকে ঘাড় থেকে নামাতে চাই। আপনি আমার দুরবস্থার একটা প্রতিবিধান করুন, নৈলে আমি মারা যাবো।

তার কণ্ঠস্বরে সত্যের সংস্পর্শ পেয়ে ইন্দুমতী যেন কিছু বিচলিত হোলো। আডচোখে একবার মীনাক্ষীর দিকে সে তাকালো। দেখলো নিতান্ত নির্লজ্জার মতো একটা পুরুষ মানুষের পাশে আলুথালু অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। মা বাপ

ছোটবেলা একটু লজ্জাসরমও শিক্ষা দেয়নি। ইন্দুমতীর সম্বন্ধে মুখের কাছে ব'সে কেউ এরূপ বললে সে আত্মহত্যা করতো।

মীনাক্ষী মুখ ফিরিয়ে কাঁদো। কাঁদো গলায় বললে, আর তুমি যে আমার কূল ভেঙে অকূলে ভাসিয়েছ ?

কঙ্কর বললে শুনলেন ত ইন্দুদেবী ? আচ্ছা, উনি যদি মেয়েমানুষ হয়ে ঠিক থাকতে না পারেন তবে আমার কি দোষ বলুন ত ? আমরা দুজনে আজ আপনার কাছে এসেছি, আপনি একটা কূল কিনারা ক'রে দিন।

মীনাক্ষী মুখে কাপড় গুঁজে হাসি চেপে ছিল। এইবার বললে, আমার তুমি সব নষ্ট করেছ, আমি এখন যাবো কোথায় ? আমি বিষ খাবো, মরবো, মাথা খুঁড়বো।

ফস ক'রে ইন্দুমতী বললে, লেখাপড়া জেনে আপনার মুখে এসব কথা মানায় না, মীনাক্ষী দেবী। পুরুষ মানুষের দোষ কি ! অবিশ্যি আপনাদের কথায় থাকবার অধিকার হয়ত আমার নেই, তবু পোড়ামুখে সত্যি কথাই বলি, উনি ত আর আপনাকে বেঁধে নিয়ে আসেন নি ?

কঙ্কর বললে, দেখছেন ত, কথায় কথায় উনি বলেন আমি ওঁর সব নষ্ট করেছি। কোমরভাঙা বাঙ্গালী মেয়ে ছাড়া এমন কথা আর কে বলে বলুন ত ? তুমি যদি এতই ভঙ্গুর তবে এসেছিলে কেন মরতে ? নষ্ট তোমার হয়েছে, আর আমার হয় নি ? তোমার নষ্ট যদি হয়ে থাকে তবে সে সামান্য, তুমি সেটা আবার শুধরে নিতে পারো কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কত বড় ক্ষতি হলো বলো দেখি ? আমার কত বড় আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, আমি কি না হতে পারতুম। আমাকে কেন্দ্র ক'রে কত লোক হয়ত মানুষের মতন মানুষ হ'তে পারতো। একটা প্রকাণ্ড সমাজ-ব্যবস্থার ভার আমি নিতে পারতুম, পৃথিবী আমার কাছে কতখানি উপকৃত হতে পারতো। আর তুমি ? তুমি হ'তে পারতে কেরানির বউ, একপাল রুগ্ন ইঁদুরছানার জননী, আর তোমার খরচ যোগাতে গিয়ে কেরানির

মাথা হেঁট হতে থাকতো। পরের অন্ন ব'সে ব'সে খাওয়া, পরের আশ্রয়ে গায়ের জোরে থাকা, আর বছর বছর সন্তান প্রসব ক'রে গৃহস্থকে বিপন্ন করা, এই ত' বাঙ্গালী মেয়ের একমাত্র পরিচয়।

ইন্দুমতি বললে, বিবাহ করেছিলেন ?

কঙ্কর বললে, ওদের আবার বিবাহ, আপনিও যেমন ! হয়ত করেছিল, হয়ত করেনি। ক'বার বিয়ে করেছিল তাই বা কে জানে ! এই সব মেয়ের সংখ্যা আজকাল অনেক বেশি, বুঝলেন ইন্দুদেবী ? স্ত্রী স্বাধীনতার নাম ক'রে বেরিয়ে কল্‌কাতায় রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র-মহলের মাথা খেয়ে বেড়ায়। কিছুদিন হয়ত করলে স্বদেশীপনা, তারপর মাষ্টারী, তারপর নার্সগিরি, তারপর বীমার দালালী,—এই করতে করতে বয়সের জৌলসটা গেল, তারপর হয়ত গিয়ে পড়লো কোন্ আঘাটায়। চরিত্র ব'লে কোনো পদার্থ নেই, নীতিবোধ ব'লে কোনো বালাই নেই। একখানা শাড়ি, একটুক্‌রো সাবান, একজোড়া রূপোর ঝুম্‌কো, এক কৌটা পাউডার—এই সব সামান্য জিনিষের জন্য ওরা না পারে হেন অপকর্ম নেই। যারা একটু চতুর তারা সঙ্গীত-ভবনে গিয়ে গান শেখে কিংবা সিনেমাওলাদের সঙ্গে আলাপ জমায়। গলাটা কিংবা চেহারাটা চলনসই হ'লে তরুণ মুরুব্বি জুটতে দেরি হয় না—তারপর বুঝতেই পাচ্ছেন ! একটা জুলিয়েট্ অমন পাঁচ সাতটা রোমিয়োর কান ধ'রে ঘুরিয়ে বেড়ায় !

বটে !—ব'লে মীনাক্ষী উঠে বসলো। বললে, ওহে নীতিবাগীশ সমাজপতি, ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘোরে কারা জুলিয়েটদের পেছনে পেছনে ? লেখাপড়া জানা বেকারদের দেখোনি রাস্তায় রাস্তায় ? ইংরেজ মেয়ের ন্যাংটা নাচ দেখতে কারা টিকিট কাটে ফার্স্ট এম্পায়ারে ? পূর্ব পরিচয় তোমাদের নেই কিছু ? আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে পা ধুয়ে এসে তোমরাই ত ঘরে ওঠো, তখন অপরাধ ধরে কা'র বাবার সাধ্য ! কোমর ভাঙা বাঙ্গালীর মেয়ে,—কোমর ভাঙা তোমরা নও ? সাহেবী বুলি দুটো কপ্‌চালে ধন্য হও, পুলিশে তাড়া করলে আঁচলের তলায়

গিয়ে আশ্রয় নাও, বাইরে সব জায়গায় মার খেয়ে এসে ঘরের মধ্যে স্ত্রীলোককে শাসাও। নিজের দুটো উদরান্ন সংস্থান করতে পারো না, বেকার ব'লে বুক চাপড়াও দেশ জুড়ে। কেরানি হবার জন্যে জন্মাও, কেরানি হয়ে মরো। পোড়াকপাল তোমাদের, তাই মা-বোন মান খুইয়ে চাকরি খুঁজতে বেরোয়। লজ্জা করে না? ঘরের মেয়েকে যখন গুণ্ডায় ধ'রে নিয়ে যায় তখন আদালতে গিয়ে জুড়ে দাও নাকিকান্না! পৌরুষ তখন থাকে কোথায়? দেখে অবাক হয়ে যাই বাঙালী ছেলের গলায় মেয়েরা মালা দেয়। অল্পবয়স ব'লেই মালা পাও, পুরুষ ব'লে পাওনা। বেশি ঘাঁটিয়োনা, তাহলে অনেক কথা বল্‌ব।—এই ব'লে মীনাক্ষী আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। রাগে ইন্দুমতীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগলো।

কঙ্কর বললে, শুনলেন? এরই নাম বাঙালী মেয়ে। যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে। আমি কেন ওর এত উপদ্রব সইবো বলুন ত?

ইন্দুমতী তার সমস্ত মনোভাব গোপন ক'রে বললে, সইবেন ব'লেই ত' ওকে এনেছেন।

অত্যাচার করলেও?

ওর অত্যাচার হয়ত আপনার গায়ে লাগবে না।

একটু সদ্বিবেচনা আশা করব না?

ইন্দুমতী করুণ চক্ষে তার দিকে তাকালো। কঙ্করের প্রতি মমতায় যেন সেই দৃষ্টি বিগলিত। বললে, আপনি ব্যস্ত হ'লে ত' চলবে না, একটা যা হোক ব্যবস্থা করতেই হবে। কই, বাজারের দিকে যাবেন বললেন যে?

কঙ্কর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, ওই যা ভুলে গেছি! এই যাই, আপনাদের সব জিনিষপত্র এনে দিই।

আপনি একা পারবেন না। চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।—এই ব'লে ইন্দুমতীও উঠে দাঁড়ালো।—পুরুষ মানুষকে অত কষ্ট দিতে নেই।

আমিও কিছু কিছু কেনাকাটা করতে পারব। আর এক কথা বলে রাখি, আপনি কিন্তু খাবেন এখানে আজ রাত্তিরে, আমি রান্না করব। না, না, কোনো কথা শুনতে চাইনে, আমি হাতে ক'রে আজ আপনাকে খাওয়াবো।

আচ্ছা, তা হ'লে খাবো। আপনাকে সত্যিই বলি, আমি অনেকদিন ভালো ক'রে খেতে পাইনি, কেই বা খাওয়াবে বলুন? স্বার্থপর জগৎ!

ইন্দুমতী ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো অর্থাৎ অনেক আগেই সে একথাটা অনুভব করেছে। কেবল 'আসুন' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটি মুহূর্ত, তারপরেই হেঁট হয়ে কঙ্কর চাপা গলায় বললে, কেমন লাগ্‌লো? যাই ওর সঙ্গে?

মীনাক্ষী হাসি মুখে বললে, যাও, বেশ ভালো অভিনয় জমেছে। ছন্দে, ব্যঞ্জনায় তোমার কবিতাটি অনবদ্য।

যাই বলো, খুব চরিত্রবতী মেয়ে। সর্বাঙ্গে ব্রহ্মচর্যের ঔজ্জ্বল্য। দেখলে ভক্তিও হয়, রসও জাগে।

মীনাক্ষী বললে, চেহারাটা ভালো।

আমাকে যত্ন করবার জন্যে খুব ব্যগ্র।

মন্দ কি, প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা!

দরজার বাইরে গলার আওয়াজ পেয়ে কঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুজনে চ'লে যাবার পর মীনাক্ষী চুপচাপ ব'সে রইলো। ঘরের ভিতরে আসবাব পত্র নেই কিন্তু এই অভাবের মধ্যেও ইন্দুমতীর পরিচ্ছন্ন হাতের চিহ্ন ঘরময় সুস্পষ্ট। সামান্য একটি বিছানা, একটি ছোট তোরঙ্গ, একখানি মাদুর। একখানি ভিজা থান ও একটি জামা ঝোলানো। এক কোণে রান্নার সামান্য তৈজসপত্র। দেখে মনে হয় উপযুক্ত গৃহস্থালী পেলে মেয়েটি উঁচুদরের গৃহিণী হ'তে পারতো।

ঘরের বাইরে সাধারণত যাতায়াতের পথ। এর মধ্যে অনেকবার পুরুষ

মানুষের গলার সাড়া পাওয়া গেল। অনেকের কৌতূহলী দৃষ্টি এরই মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। অস্পষ্ট কথাবার্তা যেন এই ঘরখানাকে উপলক্ষ্য ক'রে একবার শোনা গেল।

মুখ তুলে মীনাক্ষী একবার দেখলো একটি বউ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। সে প্রশ্ন করলো, দরকার আছে কিছু ?

নাঃ—ব'লে বউটি চলে গেল।

একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে সেই আবহমানকালের সুস্পষ্ট সন্দেহ আর অহেতুক ঘৃণা। তিনি বললেন, মাথার ওপর কেউ নেই বুঝি ?

মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, যিনি সকলের মাথার ওপর থাকেন তিনি আছেন। আপনি কে ?

আমরা গেরস্থর মেয়ে বাছা। এই তোমাদের দেখতে এলুম। পোড়া চোখে কতই দেখলুম।—এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

মিনিট কয়েক পরে একটি তরুণী এসে দাঁড়ালো।

মীনাক্ষী বললে, এবার কিন্তু টিকিট কিনে আমাকে দেখতে হবে, বুঝলে ?

মেয়েটি তার দিকে অবাক হয়ে তাকালো।

মীনাক্ষী তাব মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, এমন জন্তু বুঝি আগে দেখোনি ?

বাবারে, কী রূপ আপনার ? এই ব'লে তরুণীটি চ'লে গেল।

জানলা দিয়ে একটা পাকানো কাগজের কুটী এসে মাদুরের কাছে পড়লো। রংপুরের কথা মীনাক্ষীর মনে প'ড়ে গেল। হাতে নিয়ে কাগজটার ভাঁজ খুলে সে পড়তে লাগলো, প্রিয়তমে, তোমাকে আজ দুপুর হইতে দেখিয়া আমি পাগল হইয়াছি, তোমার পায়ের তলায় পড়িয়া যদি আমার প্রাণের ব্যথা জুড়াইতে পারিতাম তবে ধন্য হইতাম। আমাকে নিরাশ করিও না। আমার এই প্রেম

ব্যর্থ হইলে কালীঘাটে গিয়া হাঁড়িকাঠে গলা দিব। আমাকে দয়া করিয়া তোমার শ্রীচরণে ঠাঁই দিলে আমি তোমার ছাড়া-কাপড় কাচিয়া দিব, জুতা পরিষ্কার করিব, তোমার হুকুমের চাকর হইব। চিঠি লিখিয়া জানলার বাহিরে ফেলিয়া দিলে আমি যথাসময়ে পাইব। তোমার ঘরে একটি বিধবা আছে, সে আমাকে পাদুকা দ্বারা প্রহার করিবে বলিয়া শাসাইয়াছিল, আশা করি তুমি এরূপ ব্যবহার করিবে না। আমার নিবিড় আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। ইতি— রূপমুগ্ধ বিরহী।'

ইন্দুমতীর লেখবার কালি-কলম নিয়ে মীনাক্ষী চিঠি লিখতে লাগলো, প্রাণেশ্বর, তোমার জন্য এতকাল বসিয়াছিলাম। আমার জন্য সব করিবে বলিয়াছ, কিন্তু বিবাহ করিবে কিনা তাহা জানাও নাই। এই চিঠির শীঘ্র জবাব দাও, দশ মিনিট সময় দিলাম। বিবাহ করিলে কি খাওয়াইবে এবং কত গহনা দিবে তাহা অবিলম্বে লিখিয়া আবার জান্‌লা দিয়া ছুড়িয়া মারো, আমি তোমার আশায় বসিয়া রহিলাম। আমার যে-রূপটুকু আছে তাহাতে আমি অন্ততঃ দশ হাজার টাকার গহনা, তোমার মতো সুযোগ্য স্বামী, চৌরঙ্গীতে একখানা বাড়ী, পঞ্চাশ হাজার টাকার ইন্‌স্যুরেন্স পলিসি, একখানা মার্সীডিজ বেন্‌জ্‌ মোটর ইত্যাদি পাইবার অধিকারিণী। আশা করি এই সামান্য দানে তোমার আপত্তি নাই। তোমার উত্তর অবিলম্বে পাইলে তবে আমি পরের চিঠিতে তোমার 'নিবিড় আলিঙ্গনের' প্রতিদান ইত্যাদি স্বর্গীয় প্রেমের আনুষঙ্গিক উপকরণগুলি হিসাব করিয়া পাঠাইব। ইতি—

তোমার শ্রীচরণের দাসী।

দুই ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রেও মীনাক্ষী তার চিঠির উত্তর পেলো না।

ঘর বসতি জিনিষপত্র কিনতে কিনতে বেলা প'ড়ে এলো। ইন্দুমতী মীনাক্ষী নয়, সুতরাং তার হিসাববোধ আছে। কতগুলি ধানে কতগুলি চাল

হয় সে মুখে মুখেই ব'লে দিতে পারে। ভাঁড়ারের হাঁড়িকুঁড়ি, বেনেমসলা রাখার টিনের কৌটা, ডাল বাছাইয়ের কুলা—একটি একটি হিসাব ক'রে সে কঙ্করকে অবাক ক'রে দিল। এ ছাড়া শয্যাদ্রব্য। মশারি, বালিশ, ওয়াড, তোষক, শতরঞ্জি, শীতলপাটি। বালতি, বাসন, চায়ের সরঞ্জাম, বঁটি, কাটারি, শিলনোড়া পাঁচটা মুটের মাথায় বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র চাপিয়ে ইন্দুমতী বললে, আজকের মতন এতেই হবে, কাল আবার নতুন ফর্দ ক'রে রাখবো।

কঙ্কর বললে, আরো বাকি রইলো ?

ওমা, তা রইলো না ? ইন্দুমতী হাসিমুখে বললে, ঘরকন্না ত' আগে করেননি, এইবার করুন। আমি সব আপনাকে দুদিনে শিখিয়ে পড়িয়ে দেবো। বুদ্ধিশুদ্ধি একটু ভালো করুন দেখি লক্ষ্মী ছেলের মতন,—আমার খুব বাধ্য হয়ে চলবেন।

একটা প্রশ্ন কঙ্করের মুখে এলো, কিন্তু সে কথা বললে না, চুপ ক'রে রইলো।

ইন্দুমতী বললে, বাসায় ত মীনাক্ষী রয়েছেন, মুটেরা ঠিকানা নিয়ে চ'লে যাক্ পথ চিনে, আপনি পরে যাবেন।

আর কি কিছু কিনবেন এখন ?

কত কেনবার আছে, ওরা যাক্। আমি ওদের ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, আপনার ফিরতে একটু দেরি হবে।

ইন্দুমতী ঠিকানা লিখে পথ থেকে মুটেদের বাসায় পাঠিয়ে দিল। তারপর বললে, আসুন এইদিকে একটু নিরিবিলি। বাস্তবিক, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম। কি জানেন, বাঁচতে গেলে আপন মানুষ যদি বা ত্যাগ করে, ঘরকন্নার জিনিষপত্র কিছুতেই ছাড়ে না, ওগুলো নিশ্চয়ই চাই। আমি দেখুন সন্ন্যাসি মানুষ, একখানা পেতলের সরায় একমুঠো ফুটিয়ে আমি দিন চালিয়ে দিতে পারি, বিধবার জীবনে কিছুই লাগে না!

কঙ্কর চলতে চলতে বললে, আপনার স্বামী কতদিন মারা গেছেন?

ইন্দুমতী বললে, মনেই পড়ে না। মারা গেছেন দশ বছর আগে, বেঁচে ছিলেন মাত্র ছমাস। আমি তাঁর সঙ্গে বাস করিনি?

কেন?

হাসিমুখে ইন্দুমতী বললে, সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। আপনি বড় দুষ্টু।

কঙ্কর বললে, তাঁর কথা বলতে যদি ব্যথা পান তবে আমি অবশ্য শুনতে চাইনে।

ব্যথা কিছু নয়। তবে আপনাকে সত্য কথাই বলি, তাঁর কাছে যেতে আমার ভালো লাগতো না। ছ'টা মাস আর কদিনই বা বলুন। বেচারি হঠাৎ একদিন মারা গেলেন।

কঙ্কর বললে, আপনি যে গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন আপনার বাড়ীতে কিছু বলেনি?

ইন্দুমতী বললে, ভাসুরের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গিয়েছিলুম, পাড়ার মেয়েরা সঙ্গে ছিল।

কিন্তু আপনি ফিরে যাবেন ব'লে সবাই ত' অপেক্ষা ক'রে আছেন!

তারা জানে, আমি বাপের বাড়ী চ'লে গিয়েছি। যদি খবর পায় সেখানেও যাইনি তবে নিশ্চয় জানবে আমি তীর্থ করতে বেরিয়েছি। ইস, হাঁটতে আপনার কষ্ট হচ্ছে, একটু বিশ্রাম করবেন?

কঙ্কর বললে, আপনার স্বামী কিছু রেখে যাননি?

না। রেখে গেলেও আমি নিতুম না।

কেন?

কোন্ অধিকারে নেবো বলুন, আমি ত' তাঁর সংসার করিনি?

কঙ্কর আবার একটা নিষ্ঠুর প্রশ্ন মনের মধ্যে দমন করলো।

তুজনে একটা বাগানে ঢুকলো। ইন্দুমতী বললে, কিছুই আমার নেই তবু আর পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাইনে, বুঝলেন কঙ্করবাবু? যা পারি নিজেই করব। নিজে লেখাপড়া শিখে নিজের ব্যবস্থা করব।

তা'হলে আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে।

সে ত' হবেই। এই ধরুন, আপনাকে যখন পেলুম আপনি নিশ্চয় আমার ব্যবস্থা করবেন। আমার সামান্য খরচ। এই ঘরভাড়াটা, ভাঁড়ারের খরচ, আর ক'খানা বই কাগজ। বড় তুর্দিনে আপনি এসে দাঁড়ালেন। যদি আপনি না আসতেন তবে এত জিনিষপত্রই বা কিনতে যাবো কেন বলুন। মনেও করবেন না ওসব কেবল আমি একলা ব্যবহার করব।

কঙ্কর বিপন্ন বোধ ক'রে নীরবে রইল। একটা ফাঁকা জায়গায় একখানা বেঞ্চের কাছে এসে ইন্দুমতী বললে, আসুন না একটু বসি। আজ আপনি আমার হাতে কি-কি রান্না খেতে চান্ বলুন?

আমার কোনো বাছবিচার নেই—কঙ্কব বললে, যা আপনি রাঁধবেন।

আলাপটা দীর্ঘতর করবার জন্য ইন্দুমতী বললে, আচ্ছা, মীনাক্ষীর সঙ্গে কি আপনার একটুও বনিবনা হয় না?

কেন বলুন ত?

না, তাই বলছি। ঝগড়াঝাঁটিই ত' আপনাদের মধ্যে লেগে আছে! ভাব বুঝি একটুও নেই?

কঙ্কর কেবল জবাব দিল, উনি ঠিক সাধাবণ মেয়ের মতন নয়।

ইন্দুমতী বললে, মেয়েমানুষ মেয়েমানুষকে বেশি চেনে, আপনি অসাধারণ ওঁর মধ্যে দেখলেন কোথায়? এ নিশ্চয় আপনার চোখের নেশা।

কঙ্কর বললে, আমাদের তুজনেব চোখে নেশার ভাগ কম। আর এটা অবশ্য দৃষ্টির প্রভেদ।

আমি যদিও আপনাদের দুজনের মতন পণ্ডিত নই, তবে আমি এর পরিণাম ভালো দেখছিনে। সেইজন্যেই বলি, ভবিষ্যতে অনুতাপ করার চেয়ে এখন কি এর প্রতিবিধান করা ভালো নয় ?

কি করব বলুন ত ?

আপনি বড়লোক, আপনার মন উদার। বহু লোকেরই আপনি হয়ত উপকার করেছেন, মীনাক্ষীরও একটা উপায় ক'রে দিতে পারেন না ?

কি উপায়, বলুন ?

আপনি এমন ক'রে কতদিন ওঁকে বয়ে নিয়ে বেড়াবেন বলুন দেখি ? আপনার এই নতুন বয়সে, সমস্ত জীবন এখনো প'ড়ে রয়েছে, মা বাবা আপনার নেই, নিজের কথাও ত' আপনাকে ভাবতে হবে। আপনার ব্যবস্থায় মীনাক্ষীও সুখী হবে, তার দিকেও ত' আপনার একটু চাওয়া উচিৎ ?

কেন ?

ইন্দুমতী হাসলো। বললে, বা রে, আপনি বুঝি তাকে ফাঁকি দিয়েই পালাতে চান্ ?

কঙ্কর বললে, তার ত' কিছু নিইনি যে ফাঁকি দেবো !

সে ত' আপনারই জন্যে ছেড়ে এসেছে !

মোটেই না !

আপনি তাকে ভালোবাসেন না ?

বিন্দুমাত্র না।

কিন্তু সে হয়ত আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে !

জানিনে। কেবল এই জানি প্রাণ এখনো সে দেয়নি। আমার জন্য প্রাণ দেওয়াটা প্রাণের বাজে খরচ।

ইন্দুমতী বললে, আপনার জন্যে কি কেউই প্রাণ দিতে পারে না আপনি মনে করেন ?

কঙ্কর হাসলো। বললে, আমার প্রাণের এত দাম আছে ব'লে আমি মনে করিনে।

নিজের দাম নিজে কি কেউ জানে, কঙ্করবাবু?

কঙ্কর চুপ ক'রে রইলো। একটু পরে বললে, চলুন উঠি।

ইন্দুমতী উঠলো না, বসেই রইলো। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, আমি আপনার কাছে একটি প্রস্তাব করি।

কি?

আপনি মীনাক্ষীর একটি ভালো বিয়ে দিন্। অত রূপ, অত গুণ, ও কি কেবল মিছিমিছি নষ্ট হবে? আপনি ওর অনেক বড় বন্ধু, এ উপকার আপনাকে করতেই হবে।

যদি সে বিয়ে না করতে চায়?

আলবৎ করবে। আমি তাকে বুঝিয়ে বল্‌ব। না করলে বুঝবো সে আপনার ভালো চায় না।

হাসিমুখে কঙ্কর প্রশ্ন করলো, তার বিয়ে হ'লে আপনি আনন্দিত হন্?

হই দু' কারণে।—ইন্দুমতী বললে, প্রথমত তাকে নিয়ে আপনার যে-উদ্বেগ আর অশান্তি সেটা আপনার ঘাড় থেকে নেমে যায়, আর দ্বিতীয়ত মীনাক্ষীর একটা কিনারা হয়। একজন মেয়ে দিন দিন শুকিয়ে ঝ'রে পড়ছে আপনিই বা এই দৃশ্য কি ক'রে বরদাস্ত করবেন?

কঙ্কর বললে, আপনি নিজেও ত' শুকিয়ে যাচ্ছেন! এর পরে হয়ত আপনি একদিন বিয়ে করতে চাইবেন এবং তার ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে।

বেশ হবে, আপনি বাঙলা দেশের মেয়েদের একধার থেকে সদ্‌গতি ক'রে যাবেন।—এই ব'লে ইন্দুমতী হাসতে লাগলো।—আমি কিন্তু অত সহজে আপনার ঘাড় থেকে নামছিনে। এ মীনাক্ষী নয় যে এক কথায় লাখ কথা আপনাকে শুনিয়ে দেবে, আমাকে মারলেও আমি কথা কইব না।

কঙ্কর বললে, তাহলে আপনি ভয়ানক লোক, গান্ধীভক্তদের চেয়েও বিপজ্জনক।

ভয় নেই, আপনাকে এতই ভালো চোখে দেখেছি যে, আমি আপনাকে কোনোদিন বিপদে ফেলবো না। আমি জানি আপনি আমাকে ফেলে চ'লে যাবেন না, আমিও কথা দিলুম আজ থেকে আপনার যোগ্য হবার চেষ্টা করব। তার আগে বলুন আপনি আমার বাধ্য হয়ে চলবেন?

আমি ত' আপনার অবাধ্য হইনি।

অবাধ্য হলে আপাকে শাস্তি দেবো।

কি শাস্তি দেবেন?

আপনাকে বেঁধে রাখবো—এমনি ক'রে—এই ব'লে তরুণী বিধবাটি তার হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুল কামনা দিয়ে কম্পিত একটি হাতে কঙ্করের একখানা হাত চেপে ধরলো। বললে, এই আপনার শাস্তি, যান্ ত' দেখি কোথায় পালাবেন?

কঙ্কর একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললে, চলুন এইবার উঠি।

ইন্দুমতী বললে, মীনাক্ষীর জন্যে আপনার বুঝি মন কেমন করছে? পাগলের মতন যা বললুম আপনি বুঝি সব তাকে ব'লে দেবেন?

কঙ্কর বললে, নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যদি বলি তাহ'লেও তাঁর ভাবান্তর ঘটবে না।

তাঁর ঈর্ষা হবে না?

ঈর্ষা তাঁর নেই।

ইন্দুমতী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বললে, আপনি ঠাট্টা করছেন আমাকে। মেয়েমানুষের ঈর্ষা নেই? ঈর্ষার মানেই যে মেয়েমানুষ। ঈর্ষাই ত' তার আসল পরিচয়।

কঙ্কর বললে, মীনাক্ষীর ঈর্ষা নেই।

কিন্তু তিনি আপনাকে ছাড়বেন কেন?

তিনি ত' আমাকে ধরে রাখেননি।

আপনারা একত্র থাকেন ত?

একত্র আমরা থাকিনে। যদি বা কখনো থাকি তবে মাঝখানে অনেক বড় ফাঁক থেকে যায়।

ইন্দুমতী বললে, কিন্তু লোকে যদি সন্দেহ করে যে, আপনারা দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসেন?

কঙ্কর বললে, আপনাকে সত্য কথাই বলি। ভালোবাসা কি বস্তু এ আমরা জানিনে। দুজনে অনেক সময় আমরা ভাববার চেষ্টা করেছি কিন্তু কূল পাইনি। যখনই এগিয়ে গেছি তখনই দেখেছি প্রকৃতি আমাদের দিয়ে একটা ভয়ানক খেলা খেলে নিতে চায়,—আমরা প্রশ্রয় দিইনি, প্রশ্রয় কোনদিন দেবো না। এ ছাড়া আমাদের মধ্যে কৌতুক আছে, কৌতূহল আছে, আকর্ষণ আছে,—কিন্তু এদের নাম ভালোবাসা দিতে আমাদের বাধে।

ইন্দুমতী বললে, ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমি বুঝি এই সমস্ত নিয়েই ভালোবাসা। একসঙ্গে থাকতে থাকতেই যা হয় তার নামই ভালোবাসা। এরই ওপর পৃথিবী দাঁড়িয়ে রয়েছে, কঙ্করবাবু।

এটা সত্যি কিনা জানিনে, কিন্তু এইটি যে আপনার অভিমত এটা জানলুম। আসুন যাই। ব'লে কঙ্কর উঠে দাঁড়ালো।

ইন্দুমতী ব্যাকুল হয়ে বললে, আপনি এমন কিছু বললেন না যাতে আপনার ভরসা পাই। আমি কোন্ অধিকারে আপনার অন্ন গ্রহণ করব সে-কথা আমি জানতে পারলুম না। আমাকে কি আপনার মীনাক্ষীর অনুগ্রহের ওপর থাকতে হবে?

আপনি কি শুনতে চান্?

শুনতে চাই যে, আপনিই আমার অভিভাবক।

কিন্তু আমার অভিভাবক কে? আপনি?

যদি হ'তে পারি তবে জন্ম সার্থক হবে।

বেশ, তবে জন্ম আপনার সার্থক হোক। আসুন।

দুজনে এবার চললো। কিছুদূর গিয়ে ইন্দুমতী বললে, আজ বিকেলটা বেশ কাটলো। মনে হচ্ছে যেন আমার বুক ভ'রে উঠেছে। রোজ আসবেন ত' বেড়াতে?

কঙ্কর হেসে বললে, রোজ রোজ একটি তরুণী বিধবাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো,—তারপর? লোকলজ্জা? জনসাধারণ?

এক একদিন এক এক দিকে যাবো? তাতেও যদি আপনার লজ্জা করে তাহলে না হয় একখানি শাড়ীই পরব আপনার জন্যে। এতে হবে ত?—এই ব'লে ইন্দুমতী হাসিমুখে সেই আবহমানকালীন নারীপ্রকৃতি অনুযায়ী রাজহংসের মতো গুরুপদবিক্ষেপে হাঁটতে লাগলো।

## সাত

দিন পনেরো কাটলো। সংসারটা কা'র বলতে পারবো না। এরা তিনজন কোথাকার কে? কে গল্পের নায়ক, কে বা নায়িকা? তিনজনে তিনটে বালুর দানা, একত্র আছে, কিন্তু গায়ে গায়ে লেগে নেই। একটা অদ্ভুত সংসার। ঐক্য নেই, বন্ধন নেই, পারিবারিক ছন্দ নেই। একটি ঘরের মধ্যে যেন পরস্পরের ভিতরে শত সহস্র যোজন ব্যবধান।

কঙ্কর এসে কোনো কোনোদিন বাজার হাট ক'রে দিয়ে যায়। এও সম্ভব হলো, কঙ্কর বাজার করে। কা'র জন্যে? না—দুজন স্ত্রীলোক থাকে। কে

তারা ? জানিনে ! কঙ্করের এতে স্বার্থ কি ? না,—বোকা ব'লে পৃথিবীতে পরিচিত হওয়া।

মীনাক্ষী ?—মীনাক্ষী বেশ আছে। রোজ একখানা ক'রে নতুন শাড়ি ছাড়া তার দিন চলে না। জামাগুলো সম্প্রতি এসেছে ইংরেজ-টোলার দোকান থেকে। টাকা দিলে কাঁকর। সম্প্রতি সে খানকয়েক ধর্মগ্রন্থ আনিয়েছে, তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা, আর একখানা রবিবর্মার কালীমূর্তির পট। বয়স হোলো বৈকি।

ইন্দুমতী চমৎকার রাঁধে। অবসর সময়ে উপরতলায় গিয়ে নানারকম কানাকানি ক'রে আসে। বাড়ীর সকলের সঙ্গেই তার গলায় গলায়। ইন্দুদি বলতে সবাই অজ্ঞান। চোরাগলিতে তার আনাগোনা। তার খুশীর আর অন্ত নেই, কারণ মীনাক্ষী সম্প্রতি জানিয়েছে যে সে শীঘ্রই চ'লে যাবে। কঙ্করের একটা উপায় হ'লো দেখে সে নিশ্চিন্ত। সে শীঘ্রই আরঙ্গাবাদে একটা চাকরী পাবে। ইন্দুমতী দিন গুণছে।

অপরাহ্নকাল। মীনাক্ষী কোথা থেকে যেন ঘুরে এলো। কলকাতায় তার বন্ধুসমাজ ছোট নয়। হোস্টেলগুলোয় একদা তার খুব যাতায়াত ছিল। কলেজ বন্ধুরা অনেকেই বিয়ে করেছে, অনেকেই সন্তানের জননী। একদা 'সখি সভার' সে ছিল প্রেসিডেণ্ট, সেখানে ছেলেদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ক্রমে দেখা গেল এক একটি 'সখা' এসে নেপথ্যে জুটেছে, মেয়েদের সংখ্যা যথারীতি কমতে লাগলো, সে পড়লো একা। কিছুদিন থেকে কয়েকটি বন্ধু ধরেছে তারা এক্‌স্কারশনে যাবে, সে হবে লীডার। এই নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, আগামী সপ্তাহে সঠিক ব্যবস্থা জানা যাবে।

মীনাক্ষী কাপড় বদলাচ্ছে এমন সময় কঙ্কর এসে উপস্থিত। মীনাক্ষী বললে, ওহে তরুণ সাহিত্যিক, তোমার কবিতার খোরাক হ'তে চাইনে, ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

কঙ্কর হেসে বললে, উপায় নেই, ফিরে দাঁড়াতেই হবে কারণ মূর্তিমতী অশ্লীলতা তুমি, তোমার দিকে ফিরে তাকালেই দেশসুদ্ধ বলবে, ছি ছি! তোমার শরীরের বর্ণনা করলে লোকে বলবে দুর্নীতি, তোমাকে ছুঁলে সবাই বলবে গেল গেল, সব গেল! অতএব হে নরকের দ্বার, দরজার বাইরেই দাঁড়াই, তুমি নিজেকে ঢেলে সাজো।

মীনাক্ষী বললে, বক্তৃতার ফাঁকে কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিলে, দূর হও ঘর থেকে।

কঙ্কর বললে, ভয় নেই, এত অশ্লীল তুমি নও। তোমার ছবি সাপ্তাহিকে, মাসিকে, দৈনিকে। তোমার ছবি বিজ্ঞাপনে, প্রাচীরগাত্রে, রেলওয়ে পোস্টারে, ছাত্রদের বইয়ের ভিতরে, বেকারের পুঁটুলিতে। তোমার ছবি ক্যালেণ্ডারে, একজিবিশনে, আর্টের সভায়—তোমার ছবি সর্বত্র। তুমি কোথাও উলঙ্গ, কোথাও অর্ধনগ্ন, কোথাও এক-চতুর্থাংশ। মীনাক্ষী, আধুনিক কাল নারীদেহকে পণ্য করেই গৌরবান্বিত। অত্যন্ত নীতিপরায়ণ সম্পাদকের কাগজেও তোমার মনোমুগ্ধকর অর্ধনগ্ন ছবি ছাপা হয়।

মীনাক্ষী বললে, চাহিদা আছে বৈ কি। তোমার গলার আওয়াজে একজন নীতিবাগীশকে যেন পাওয়া যাচ্ছে। এ অধঃপতন কেন তোমার? কঙ্কর, সাবধান, তুমি নীতিবাদীর ছদ্মবেশে আধুনিক কালের মনোহরণ করতে চাও, সাবধান। তুমি তরুণ সাহিত্যিক, নীতির বুলি তোমার মুখে বিপজ্জনক, তোমার নীতিবুদ্ধির ছদ্মবেশ বড় ভয়ঙ্কর। নাও, মুখ ফেরাও।

কঙ্কর বললে, ফেরাবো না, কারণ তোমার দেহ হচ্ছে আর্ট। তোমার নির্লজ্জ পরিচ্ছদ আর্টের নামে চলে। তোমার বিবশা তনুলতার চিত্র দেখে লোকে বাহবা দেয়। তোমার উর্বশী-রূপ নিয়েই ললিতকলার প্রসার। তোমার লালসালোল বক্ষ আর বাহুর লোভে লোকে সিনেমার টিকিট কেনে, প্রদর্শনীতে ছোটে, সাময়িক পত্রের স্টলে ভীড় ক'রে দাঁড়ায়। যেখানে তোমার

দেহের অশ্লীলতা যত উন্মাদনা আনে সেখানেই নিছক আর্টের সৃষ্টি ব'লে সমালোচকরা হাততালি পাড়ে। নাও, বেশ পরিবর্তন করো। বাইরেও যাবো না, মুখও ফেরাবো না! কেবল আর্টের আব্রুর জন্য—এই নাও, একখানা কাপড় আড়াল ক'রে ধরছি। পরদার অন্তরালে সেই চেহারা প্রকাশ করো, যে-চেহারা দেখে সর্বকালের কবিরা ঘোষণা করতে পারে, 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী'—

এই ব'লে কঙ্কর ইন্দুমতীর একখানা থান কাপড় খুলে পরদার মতো ক'রে দুই হাতে ধরলো।

এমন সময় সহসা ইন্দুমতী ঘরে ঢুকলো। হেসে বললে, এ কি হচ্ছে?

কঙ্কর বললে, বিশেষ কিছু না, একটু আর্টের চর্চামাত্র। আপনি এখন যান্, একটু বাদে আসবেন।

ইন্দুমতী বললে, লোকে যে নিন্দে করবে আপনাকে, কঙ্করবাবু? উনি না হয় এসব মানেন না—

ভয়ানক মানেন। দেখছেন না, পরদার অন্তরালে কর্তব্য সম্পাদন করছেন! হাজার হোক স্ত্রীলোক কিনা, রক্তের মধ্যে রক্ষণশীলতা। নিছক আর্টের উপরেও পরদা দিতে চান্।

ইন্দুমতী স্তম্ভিত হয়ে বেরিয়ে গেল। মীনাক্ষী বললে, নাও, পরদা সরাও।

চোখ বুজে, না খুলে?

খুলে।

অশ্লীলতা চোখে পড়বে না ত?

ভয় নেই, কিছু আবরণ দিয়েছি।

শতকরা কতখানি?

পঞ্চাশ-পঞ্চাশ!—মীনাক্ষী বললে।

কঙ্কর বললে, সমালোচকদের ভয় নেই?

সেও মুগ্ধ হবে।

রবি ঠাকুরের সার্টিফিকেট্ পাবে?

তাহলে আর একটু সবুর করো—হ্যাঁ, এইবার পাবো।

ইন্দুমতীর প্রশংসা?

ওমা, তাহলে ত' নিরানব্বই ভাগই ঢাকতে হয়।

কঙ্কর পরদা সরিয়ে দিল। বললে, বাঃ, এই পোষাকে তুমি জটিলাকুটিলার প্রশংসাপত্রও পেতে পারো, একেবারে শ্রীরাধিকার জল আনতে যাওয়ার মতন আঁটসাঁট। বোকারা জানেনা যে ঢাকতে জানলে বেশি ক'রে প্রকাশ করা যায়। চলো, তোমাকে ঘুরিয়ে আনি 'সুনীতি সঙ্ঘে'র পাড়ায়—ওরাও তোমার চিবুক নেড়ে সরসকণ্ঠে বলবে, লক্ষ্মী মেয়ে!

মীনাক্ষী বললে, অনেকদিন পরে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে বেড়াতে। কোন্ দিকে যেতে চাও?

চলো যাই গঙ্গার কূলে। আজ বাতাস উঠেছে দক্ষিণে, পাতাঝরার কাল। গঙ্গার ধারে শুক্লা দ্বাদশী। আজ স্টিমারে বেড়াতে যাবে।

তাহলে ত' আজ দুজনে বেমানান হবে!—মীনাক্ষী বললে, এমন সুন্দর সন্ধ্যায় আমরা দুজন একত্র কেন? বরং তুমি যাও ইন্দুমতীকে নিয়ে, আমি যাই আমার কোনো বন্ধুর স্বামীর সঙ্গে! অতি-পরিচিতের সঙ্গে আজকের সন্ধ্যা মধুর হয়ে উঠবে না। আজ কবিতার দিন, চিত্তরহস্য নিবিড় হোক, অপরিচিতের হৃদয়ের পথে আজ আনাগোনার দিন। দুজনে যাই দুদিকে। সঙ্গী না জোটে ঘুরবো একা একা গঙ্গার কূলে কূলে। জ্যোৎস্নার তরঙ্গে ভাসিয়ে দেবো প্রাণের রঙ্গ।

কঙ্কর বললে, সেই ভালো। চলো বেরিয়ে পড়ি।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এমন সময় পিছন থেকে একজন পুরুষ কণ্ঠে ডাকলো, ও মশাই, শুনছেন?

কঙ্কর মুখ ফিরিয়া দাঁড়ালো।

এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, আশা করি ভুলে যাননি। আমরা সব ভাড়াটে গেরস্থ আশপাশে থাকি, আপনি কি মনে করেছেন শুনি?

মীনাক্ষী এগিয়ে আসতে চাইলো, কঙ্কর তাকে বাধা দিয়ে ঘরের ভিতরে পাঠিয়ে আবার এসে দাঁড়ালো। বললে, আমি এই মনে করি আপনারা গেরস্থ, আর পাঁচজনের মতই ভদ্রলোক। পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, আইনসঙ্গত উপায়ে উপার্জন, জীবসৃষ্টিকার্যে সাহায্য, বংশ বিস্তার—প্রভৃতি মহৎ কার্যে আপনারা কালাতিপাত করেন।

আরো পাঁচজন আসরে সহসা অবতীর্ণ হোলো। বুঝতে বাকি রইলো না এই দৃশ্যটা গত কয়েকদিনের ষড়যন্ত্রের ফল। ইন্দুমতীর এতে হাত ছিল।

একজন বললে, আপনি কে? কি জন্য আসেন শুনতে পাই কি?

কঙ্কর বললে, খুব সহজ কথা, জলের মতন পরিষ্কার। ঘরভাড়া নিয়েছি, সংসারটি আমার, খরচ আমার, দায়িত্ব আমার, অধিকার আমার। এটুকু যাদের বুঝিয়ে বলতে হয় তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে—

তৃতীয় ব্যক্তি রুখে এলো। বললে, আপনি জানেন যে আপনার কীর্তি-কলাপ আমাদের অগোচর নেই? কোন্ সাহসে আপনি গেরস্থ ঘরে ঢুকে এমন বেলেল্লাপনা করেন? এরা কে আপনার?

কাদের কথা বলছেন?

ন্যাকা! ওই দুটি মেয়ে? কে ওরা?

কঙ্কর বললে, অবশ্যই আপনারা কল্পনা ক'রে নিয়েছেন ওঁরা কে! ওঁরা অবিদ্যা নন, বিশেষ বিদ্যাবতী! আলাপ করলে আপনারা আনন্দিত হবেন। একটির নাম ইন্দুমতী,—ওই যে যিনি আড়ালে দাঁড়িয়ে আপনাদের ইঙ্গিতে নানা

কথা শিখিয়ে দিচ্ছেন, ওটি আমার আশ্রিত। আর এই যে এঁকে দেখছেন, এই যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন—আমি এঁর আশ্রয়ে থাকি।

কয়েকটি লোক চীৎকার ক'রে উঠলো, আপনার সঙ্গে কী সম্পর্ক ওদের? আমরা জানতে চাই আপনি কোন্ অধিকারে এ বাড়ীতে—

একে একে কথা বলুন। কঙ্কর বললে, এখনো ইংরেজী অরাজকতা আছে, এখনো চন্দ্র সূর্য ওঠে, এখনো দিন রাত হয়। অধিকার একটা আছে, সে অধিকারটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। ঘরভাড়া আমি দিই, টাকা পয়সা আমার, অথচ অধিকারটা আমার নয়, আপনাদের—এত বড় রামরাজত্ব এখন আর নেই।

উনি আপনার কে, এই কথা আমাদের বলতে হবে।

যদি না বলি?

না বললে আপনাকে গলাধাক্কা দেওয়া হবে।—এই বলে দুটি লোক এগিয়ে এলো।

একটু দাঁড়ান্, এই দেখুন, আমার বয়স ছাব্বিশ, আমার বুকের ছাতির মাপ হচ্ছে উনচল্লিশ, আমি নিয়মিত এক্সারসাইজ্ করি এবং ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে থাকি। যদি আপনারা সবাই মিলে আমাকে গলাধাক্কা দেন তাহলে অন্তত কিছু ফিরিয়ে দিয়ে যেতে পারবো—আচ্ছা, আমি যদি মিছে কথা বলি?

ওরে খগেন, থানায় একবার খবর দে ত'?

দাঁড়ান্—কঙ্কর বললে, থানার লোককে আমি এত বেশি গোপনে ঘুষ খাওয়াতে পারবো যে, আপনাদেরই তারা বিপদে ফেলবে। অর্থাৎ আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনবে যে, একজন ভাড়াটের ওপর চড়াও হয়ে আপনারা মারপিঠ করেছেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই দুটি ঘরণীর বয়স আঠারোর অনেক বেশি। একটি স্বাধীনচেতা বিধবা; অপরটি কুমারী, সধবা ও বিধবার একটি মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণ। পুলিশ যদি আমাকে গ্রেপ্তার করতে

আসে তবে এই দুটি মেয়েই তাদের গলাধাক্কা দেবে। তার কারণ আমার বিরুদ্ধে অপহরণ, ফুসলানো, বলাৎকার, ব্যভিচার—প্রভৃতি কোনো অভিযোগই আসবে না। আপনারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতএব থানায় খবর দেবার আগে একটু চিন্তা করুন।

একটি লোক কুৎসিৎ ভাষায় বলতে লাগলো, তোমার গুণ জানতে আমাদের বাকি নেই। ভদ্রলোকের বাড়ীতে যারা স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে সংসার করে তারা দিন রাত দেখতে পায় তোমার বেহায়াপনা। বদমায়েসি করার আর জায়গা পাওনি? মুখ ফুটে স্বীকার করার সাহস নেই কেন, শুনি?

মীনাক্ষী এইবার বেরিয়ে এলো। বললে, আর একবার বলুন আপনারা কি বলছেন?

ওরা বললে, জানতে চাইছি আপনাদের সম্পর্কটা কি?

আপনাদের কি মনে হয়?

যা মনে হয় সেটা মেয়েছেলে হয়ে আপনি বুঝতে পারেন না? আপনি ওঁর কে হন?

মীনাক্ষী বললে, পায়ে রাখলে দাসী, নৈলে কেউ নয়। আমি ওঁর সহধর্মিণী!

সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। এমন সময় ইন্দুমতী ছুটে এলো। বললে, মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে মিথ্যে কথাটা বললে তুমি? আমি কী না জানি?

মীনাক্ষী বললে, তাহলে তুমিই বলো সত্যি কথাটা?

তুমি ওর কেউ নও।

আর তুমি?

ইন্দুমতী থতিয়ে গেল। কস্তুর বললে, ব'লে যান্ যা মুখে আসে, কোনো চিন্তা নেই! পৈতৃক সম্পত্তি আছে, সুতরাং সব দিক রক্ষা করতে পারবো।

মশাইগো, শুনুন আপনারা, ইন্দুমতীর একটু চালে ভুল থেকে গেছে, নৈলে নাটকটা আর একটু হলেই বেশ জমে উঠেছিল। বিপদটা এবার ঘনিয়ে এলো ইন্দুমতীর মাথায়, ওঁর অবস্থাটা দাঁড়ালো শোচনীয়।

ইতিমধ্যে সহধর্মিণী শুনে অনেকেই রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। Vকেবল একটি সামান্য স্বীকারোক্তি, তার পরে আর কোনো সমস্যা নেই। কবে বিয়ে হোলো, বংশ পরিচয় কি, কী জাত, সুশৃঙ্খলায় সংসার করে না কেন—এসব তথ্য পরে জানলেও চলবে। আপাততঃ জানা গেল সহধর্মিণী! শব্দটার মধ্যে যে ফাঁকি আছে, বিদ্রূপ আছে, ছদ্মবেশ আছে—এগুলো তলিয়ে দেখার সময় নেই। সহধর্মিণী—এই যথেষ্ট। এর পর তারা সকল সমাজে চলনসই, এর পরে গৃহস্থঘরে তাদের গতিবিধি অবারিত, এর পরে তারা অতি নীতি-পরায়ণ,—এর পরে তাদের সমস্ত বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, দুর্নীতি, দৌরাত্ম্য, অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, অনিয়ম, কাপট্য, অনাচার—সমস্তই হাসিমুখে মার্জনা করা চলে।)

গোলমালটা থামলো কিন্তু সহসা ঘরের মধ্যে ঢুকে ইন্দুমতী মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। মীনাক্ষী আর কঙ্কর তার কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। ষড়যন্ত্রটা অতি বিশ্রীভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। একজন নেপথ্যে এমন কথাও ব'লে গেল, সত্যিই ত, আর যাই হোক, ওরা স্বামী-স্ত্রী। ওই বিধবা মেয়েটারই যত দোষ, ওদের ঘর ভাঙতে এসেছে।

ইন্দুমতীর ব্যাকুল কান্না দেখে মীনাক্ষী তার হাত ধ'রে তুললো। বললে, কোনো দোষ তোমার নেই। তোমার আচরণের পিছনে যে বড় কল্পনা ছিল তার দিকে কেউ ফিরে চাইলে না। লক্ষ্যটা তোমার অনেক বড়, পথটা যেমনই হোক। কাঁকর, তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

কঙ্কর বাইরে গেলে মীনাক্ষী তার হাতের কয়েকগাছা সোনার চুড়ি খুলে ইন্দুমতীর হাতে পরিয়ে দিয়ে বললে, দান তোমাকে করবার কিছু নেই, এ কেবল বন্ধুত্বের চিহ্ন। আমার এই শেষ সম্বল, তোমার হাতে দিয়ে গেলুম।

আমাকে ক্ষমা করো, মীনাক্ষীদি।

অপরাধ তোমার হয়নি ভাই, তাই ক্ষমাও তোমাকে করব না। নাও, রান্না চড়াও, এখুনি ফিরে এসে তোমার হাতে খাবো।

কঙ্কর আবার এসে ঢুকলো। রুমালে বাঁধা একটা তোড়া ইন্দুমতীর কাছে রেখে বললে, এইটে রাখুন ত', এর মধ্যে আড়াইশো টাকা আছে। সন্ধ্যে-বেলায় এত টাকা নিয়ে আর বেরুবো না। এসো মীনাক্ষী।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ইন্দুমতী চোখের জল মুছে রান্নার আয়োজন করতে লাগলো। যে-আশঙ্কা তার হয়েছিল তা যেন দুজনের মধুর ব্যবহারে নিঃশেষে মুছে গেল। বিশ্বাস আর স্নেহ তবে সে হারায়নি। চুড়ি কয়গাছা আর টাকার তোড়া সে সযত্নে বাক্সে তুলে রেখে দিল কিন্তু অভাগী বিধবা একবারও সন্দেহ করল না যে, ওরা দুজনে আর কোনোদিন এখানে ফিরবে না, শেষ দান রেখে দিয়ে দুজনে তারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

রাত দশটা বেজে গেছে। স্টীমার ভ্রমণ শেষ ক'রে গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে শহরের প্রান্তে নিরিবিলি একটা পথে ঢুকে মীনাক্ষী বললে, তেরো নম্বরটা খুঁজে বা'র করো।

কঙ্কর বললে, কারণ কি? এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে? কোনো বদ মৎলব নেই ত তোমার?

তেরো নম্বর বা'র করো।

তেরো? আন্‌হোলি থার্টিন্। কে আছে সেখানে?

একজোড়া কপোত-কপোতী। দেখো দেখি এ বাড়ীটার নম্বর?—মীনাক্ষী মুখ বাড়ালো।

গ্যাসের আলোয় নম্বর দেখে কঙ্কর বললে, সতেরো। আর একটু এগিয়ে চলো।

বাসাটা পাওয়া গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী বললে, একটু বাক্ সংযম ক'রো। এটি আমার ছাত্রীর বাড়ী।—এই ব'লে সে কড়া নাড়লো।

দরজাটা খুলে গেল। একটি যুবক এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, কে আপনারা?

চিনতে পারলে না, সুধীর? আমি যে!

ওঃ—দিদি? আসুন—আসুন। এত রাতে?

মীনাক্ষী বললে, ইনি আমার বন্ধু কঙ্কর, দুজনে আজ তোমার বাড়ী অতিথি। কমল কোথায়? এখন থাকে ত' তোমার কাছে?

সুধীর বললে, আগে ভেতরে আসুন, তারপর সব শুনবেন।

দুজনে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। চারিদিকে অন্ধকার। এই প্রেতপুরীর ভিতরে এক সুধীর ছাড়া আর যে কেউ আছে তা অনুভব করবার উপায় নেই। আশেপাশে নিকটে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীর আওয়াজ। ভিতরে একটা চাপা যন্ত্রণাদায়ক আগাছার জঙ্গলের গন্ধ। কোথায় যেন জলের ঝরঝর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কঙ্কর বললে, এলে কোথায়?

মীনাক্ষী বললে, তাই ভাবছি। কমল থাকে এখানে!

এমন সময় দরজা বন্ধ ক'রে সুধীর এসে কাছে দাঁড়ালো। মীনাক্ষী বললে, আগে আলোটা জ্বালো ভাই, কিছু দেখতে পাইনে।

সুধীর বললে, আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে আজ। কিন্তু, ভারি লজ্জা করছে বলতে,—আজকে কোনো আলো জ্বালার ব্যবস্থা নেই, একটা মোমবাতি ছিল, কাল সেটা একেবারে পুড়ে গেছে। একটা বাতি দুদিন হয়। দিদি, আমি বড় গরিব।

সুধীর পকেট থেকে দেশলাই বা'র ক'রে একটা কাঠি জ্বাললো। সেই

আলোয় তার দিকে চেয়ে মীনাক্ষী শিউরে উঠলো। আর্তকণ্ঠে বললে, সুধীর? একি চেহারা হয়েছে তোমার?

দেশালাইর কাঠিটা নিভে গেল। আবার চারিদিকে ঘুটঘুটি অন্ধকার। সুধীর কম্পিতকণ্ঠে বললে, কেন দিদি, আমার ত কোনো অসুখ করেনি।

করেনি? সুধীর, তবে কেন এমন চেহারা হোলো তোমার? তুমি যে পাথরের পুতুল ছিলে ভাই? আলো জ্বালো শিগগির।

আচ্ছা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।—এই ব'লে সুধীর একটা ঘরের পাশ দিয়ে কোথায় যেন চ'লে গেল। তার পরে সব নীরব, এই জনহীন পুরীর ভিতরে এক ঝিল্লীরব ছাড়া আর কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই।

কঙ্কর তার হাতখানা ধরলো। বললে, একি, তুমি কাঁপছো কেন?

মীনাক্ষী বললে, চুপ।

একটু পরে সুধীর একটা আলো জ্বেলে নিয়ে এলো। দেখা গেল একটি সরষের তেলের বাটিতে একটুখানি কাপড় ছেঁড়া দিয়ে সে প্রদীপ তৈরি করেছে। মীনাক্ষী এগিয়ে গিয়ে বললে, কমল কই?

আসুন এই ঘরে। তাঁর খুব অসুখ।

কি অসুখ, সুধীর?

হঠাৎ অসুখ, দুদিন হোলো। দেখবেন, এখানে সব রান্নাবান্না রয়েছে, হোঁচট লাগে না যেন।

মীনাক্ষী বললে, কমলের অসুখ, তবে রাঁধলে কে?

সুধীর বললে, আমিই রোজ রাঁধি।—এই ব'লে আলোটা নামিয়ে সে সহসা দুই হাত যোড় ক'রে রহস্যময় কম্পিত কণ্ঠে বললে, আপনি একা আসুন দিদি। আমরা দুজনে বাইরে দাঁড়াই। এই যে, এই ঘর, আলোটা নিয়ে যান্।

আলোটা নিয়ে মীনাক্ষী ঘরে ঢুকলো। ঘরের ভিতরে আসবাবপত্র কিছু নেই, একটা অস্থায়ী বাসার বিশৃঙ্খল যৎসামান্য উপকরণ এখানে ওখানে ছড়ানো।

একধারে একখানা খবরের কাগজের উপর কয়েকটা ফল মূল রয়েছে, একপাশে কয়েকটি বই কাগজ, একটি জলের মৃৎপাত্র। আলোটা একটা কুলুঙ্গীতে রেখে মীনাক্ষী একখানা নড়বড়ে তক্তার কাছে এগিয়ে এলো। তারই উপর একটি দরিদ্র শয্যায় স্তিমিতভাবে একটি মেয়ে আলুথালু অবস্থায় প'ড়ে রয়েছে। মীনাক্ষী তার উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, কমল, ও কমল ?

কমল মুখ ফেরালো। মেয়েটির রং আধময়লা, মুখখানি সুশ্রী। মীনাক্ষীকে দেখে সে একমুখ হেসে উঠলো। বললে, হোলো না, শুনতে পাচ্ছেন আপনি ? ওঁর চাকরিটা হোলো না। হ'লে আমি বাঁচতুম, উনি বাঁচতেন, আর একজনও বেঁচে যেত। বড় কষ্ট হচ্ছে তোমার, না ? মুখখানি শুকিয়ে গেছে। সারাদিন বুঝি খাওয়া হয় নি ?—এই ব'লে সে একটি হাত বাড়িয়ে মীনাক্ষীর মুখখানা বুকের কাছে টানলো।

রোগীর প্রলাপ সন্দেহ নেই। মীনাক্ষী তার কপালে হাতখানা রেখে দেখলো, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে ডাকলো, কমল, আমি এসেছি রে।

এসেছ ? আর উপায় নেই। আমার সর্বনাশ করেছ। অনেক দেরিতে এসেছ তুমি—অনেক—অনেক দেরি হয়ে গেছে। যাও, যাও তুমি, ক্ষমা করব না। নরাধম, তুমি চাকরি দেবে এই আশায় থেকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়েছে !—এই ব'লে সে উত্তেজনায় উঠে বসতে চেষ্টা করলো। মীনাক্ষী তাকে ধ'রে ফেলে বললে, কি হচ্ছে রে কমল ? আমি—আমি তোর মীনাক্ষীদি। ছি, সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে কাপড় দে। ও কি হচ্ছে, লোকে নিন্দে করবে যে কমল ?

কে তুমি ?

তোর সেই দিদি মীনাক্ষী, আমাকে মনে নেই !

কি জন্যে এসেছ ?

এসেছি তোকে দেখতে রে!

ফিরে যাও, তাকে পাঠিয়ে দাও।

কা'কে?

ঈশ্বরকে। বাঁচাতে পারবে সে? পারবে না! পারবে না! পারবে না!

মীনাক্ষী ভীত হয়ে তার দিকে তাকালো। তারপর দ্রুতপদে বাইরে এসে ডাকলো, সুধীর? কাঁকর?

এই যে আমরা।—ব'লে দুজনেই এগিয়ে এলো।

সুধীর, বরফ আনো, ডাক্তার আনো। বুঝলুম আমি এতক্ষণে সব।

ব্যস্ত হয়ে সুধীর বললে, না দিদি ডাক্তার নয়,—আমাকে ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন, ডাক্তার আনতে আমি পারব না! বরফ আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

মীনাক্ষী চুপ ক'রে তাকালো, পরে চিন্তিতকণ্ঠে বললে, টাকাকড়ি আছে ত?

না, কিছু নেই।

নেই? কাঁকর, তোমাকে যে টাকা আনতে হবে?

কাঁকর বললে, এত রাতে—

এত রাতেই টাকা আনতে হবে, কাঁকর। তুমি ছাড়া ত' এদের কেউ নেই। যাও তোমরা দুজনে। ভয় কি, আমি আছি।

কঙ্কর আর সুধীর বেরিয়ে পড়লো! সেই নিস্তব্ধ রাত্রে মীনাক্ষী দরজা বন্ধ ক'রে এসে আবার রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসলো।

কমল বললে, মীনাক্ষাদি?

এই যে ভাই, চিনতে পেরেচিস? খুব জ্বর হয়েছে তোর, নয়? এখুনি জ্বর যাবে, ভয় কি?

কম্পিতকণ্ঠে কমল ডাকলো, মীনাক্ষীদি?

কিরে কমল? পাগ্‌লি, বিয়ে করেচিস, কই আমাকে জানাসনি ত? আমার ভাইটিকে বুঝি শেষ পর্য্যন্ত পালাতে দিলিনে?

কমল রুগ্নমুখে হাসলো। বললে, মীনাক্ষীদি, বিয়ের আগে কারো সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক পাতাতে নেই,—অনেক বিপদ, অনেক দুঃখ, অনেক দায়িত্ব!

মীনাক্ষী তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, ভারি কথা শিখেছিস যে? বলি, ব্যাপারখানা কি তোর?

কমল বললে, ভারি ভালো ছেলে, আমি ওকে ফেলতে পারিনি, আমার জন্যে অনেক করেছে!

ছাই করেছে! এই ত' তোর অবস্থা!

বলো না, বলো না মীনাক্ষীদি। আমি ছাই, ওর ত্যাগ অনেক বড়, ওর সহ্য অনেক বেশি। অত বড় ঘরের ছেলে, সব ছেড়ে এলো আমার জন্যে। কত দুঃখ সইলো, আমি ওর একটুও যোগ্য নই।

আর তুই বুঝি কম?—মীনাক্ষী বললে, আমি জানিনে কিছু? কত লাঞ্ছনা হয়েছে তোর কপালে, কত মার খেলি সব জায়গায়। তার বদলে পেলি কি মুখপোড়া মেয়ে? এই দারিদ্র্য আর উপবাস, এই মরুভূমি মাড়িয়ে চলা—একে ভালোবাসা বলিস?

মীনাক্ষীর হাতখানা জোরে চেপে ধ'রে কমল বললে, বলো না কিছু, পাপ হবে তোমার। অনেক পেয়েছি আমি, ও আমাকে অনেক দিয়েছে ভাই!

হতভাগি, সে ত' দেখতেই পাচ্ছি! পরণে ছেঁড়া একখানা শাড়ি, হাতে দুগাছা কাঁচের চুড়ি, আলো জ্বালার পয়সা জোটে না, ঘরখানা দারিদ্র্যে ভরা, আঁস্তাকুড়ে বাস করা—দিয়েছে তোকে খুব।

বেচারি, ওর ওপর রাগ করো না দিদি।

করব না? সোনাকে যে রাংতা বানালে রে? এসে পর্যন্ত অবাক হয়ে আছি। একে ভালোবাসা বল্‌বি? এ যে মনের একটা ভয়ানক বিকার! এই বীভৎস জীবনযাত্রাকে কেন বলিস ভালোবাসা? থাম্ মুখপুড়ি, মুখ ফুটে আর কথা বলিস নে। নিজে মরেচিস, ওকেও মেরেচিস। কেন দুজনে ছাড়তে

পারলিনে দুজনকে ? কেন গলায় দুগাছা দড়ি জুটলো না তোদের ?—এই ব'লে মীনাক্ষী উঠে কলসীর জলে আঁচল ভিজিয়ে এনে কমলের মাথায় দিতে লাগলো। বললে, আচ্ছা কথা পরে হবে, এখন শুয়ে থাক চুপ ক'রে। তোকে ভালো না দেখে আমিও কোথাও যাব না।

ও কোথায় ?

মুখ বিকৃত ক'রে মীনাক্ষী বললে, নাড়ি কটকট করছে, কেমন ? খাবার আনতে পাঠিয়েছি আমার জন্যে। তোদের বাড়ীতে এলুম এত রাতে, আমাকে খাওয়াবিনে ?

কমল তার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকালো। তারপর বললে, ওকেও কিছু খেতে দিয়ো, মীনাক্ষীদি।

না, কিচ্ছু খেতে দেবো না, উপবাস করিয়ে রাখবো। দেখি তুই আমার কি করতে পারিস।

খানিকক্ষণ পরে কমল ডাকলো, মীনাক্ষীদি ?

কেন রে ?

আমরা অন্যায় করেছি কেন বলছ তুমি ?

ওরে মুখপোড়া মেয়ে, আমার গলা কাটলেও আমি একে স্বীকার করব না—মীনাক্ষী বললে, দুর্গমে, দুঃখে দারিদ্র্যে ভালোবাসা নিজের মহিমা প্রকাশ ক'রে থাকে, এটা নিয়ে সৎসাহিত্য প্রচার করা চলতে পারে, এর নাম আদর্শ প্রেম দিয়ে হিন্দুমেয়ের সতীপনাও প্রকাশ করা যায়—কিন্তু বাঁচে না, দারিদ্র্যের অপমানে ভালোবাসা পঙ্গু হয়ে যায়, অভাবের আগুনে পুড়ে সব ছাই হয়। আমাকে ভুল বোঝাসনে, আমি এর মধ্যে মহিমা কিছু পাইনে, এর মধ্যে কল্যাণ কিছু দেখিনে।—আমি এই কথাই ভাবি, ভালোই যদি তোরা বেসেছিলি তবে নিজেদের ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ত্যাগ করলিনে কেন পরস্পরকে ? মানুষের অনাদর, আত্মীয়জনের অবহেলা, বন্ধুদের উপেক্ষা, অভাবের অভিসম্পাৎ

উপবাস আর ভিক্ষার অসম্মান—কেন এদের মধ্যে উন্মাদের মতন ঝাপিয়ে পড়লি? এ ত' প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আসা নয়, এ হচ্ছে অপরিণামদর্শী পাশব আকর্ষণের একটা মোহগ্রস্ত আদর্শ। কমল, এ কিছু নয়,—এ সব ভেঙে দে, বাইরের আলোয় বেরিয়ে পড, সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে বাঁচবার চেষ্টা কর্, শাসনের ভয়ে ভীত শেয়ালের মতন গর্তের ভেতর ঢুকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করিসনে,—নিজেকে জ্বালিয়ে তোল্ ছুটে বেরিয়ে যা,—ওকি, উঠছিস কেন? কি হলো?

কমল ব্যস্ত হয়ে তক্তার উপর থেকে গলাটা বাড়িয়ে দিল। মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি উঠে বললে, বমি করবি বুঝি? কর—কর—কোনো ভয় নেই। এই আমি ধরছি—

এমন সময় সুধীরের গলার সাড়া পাওয়া গেল। মীনাক্ষী বললে, বাইরে দাঁড়াও সুধীর, ভেতরে এসো না—

কমল বমি করতে লাগলো। যন্ত্রণায় সর্বশরীর তার কুঁকড়ে উঠছিল।

সুধীর?

কি দিদি?

এদিকে এসো। এমন উৎকট ওযুধের গন্ধ কেন কমলের মুখে?

সুধীর নতমস্তকে চুপ ক'রে রইল, কমল কেমন যেন নির্জীব হয়ে এলো।

এর পরেও তুমি ডাক্তার আন্‌তে চাও না, সুধীর?

না, দিদি।—এই ব'লে সুধীর একটা বড় বরফখণ্ড মাটিতে নামিয়ে রাখলো।

যদি বিপদ ঘ'টে যায়?

সহসা সুধীর মীনাক্ষীর পায়ের কাছে ব'সে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললো,—ঘটুক বিপদ দিদি, আর আমি পারিনে। আকণ্ঠ যন্ত্রণায় আমি জর্জরিত। অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই, আশ্রয় নেই, বন্ধু নেই—তাই আমি আজ সকল

দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাই। ভুল করেছি, ভয়ানক ভুল—আপনি আমাকে বাঁচান। প্রশ্ন কিছু করবেন না, জানতে কিছু চাইবেন না, কেবল আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

মীনাক্ষী কম্পিতকণ্ঠে বললে, খুন করেছো তুমি কমলকে। যাও এ ঘর থেকে। উঠে যাও, পায়ে প'ড়ে কাঁদবার সময় নয়। যাও, রাস্তার দিকের দরজা জানালা বন্ধ করো। তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত আমার হাতেই হোক।

সুধীর উঠে বেরিয়ে গেল। পাশের ঘরে গিয়ে অন্ধকার মেঝের উপর ব'সে রইলো। উপবাসক্লিষ্ট, ক্লান্ত, ভাগ্যের হাতে লাঞ্ছিত, মানুষের সমাজে অপমানিত—সে চোখ বুজে ব'সে রইলো। ঝরঝরিয়ে আবরণ অশ্রু দুই চোখের কোণ বেয়ে গড়াতে লাগলো।

তবু সে ভীত উৎকর্ণ হয়ে রইলো পাশের ঘরের দিকে। সমস্ত রাত্রি-ব্যাপি এক নিষ্পাপ, নিরপরাধ তরুণীর কাতরোক্তি, যন্ত্রণা, প্রলাপ, অশ্রান্ত ভাবে তার কানে আসতে লাগলো। তার সঙ্গে মীনাক্ষীর সান্ত্বনা, বরফ ভাঙার শব্দ, জলের বালতির আওয়াজ, ভাঙা তক্তার কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ।

এমনি ক'রেই সেই কঠিন, দীর্ঘ, বিপদসঙ্কুল রাত শেষ হয়ে এলো।

অতি প্রত্যূষে মীনাক্ষী তার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো, সুধীর?

কি দিদি।

এইবার গিয়ে কমলের কাছে বসো, আমি স্নান ক'রে নিই।

সুধীর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, জ্ঞান হয়েছে একটু?

হ্যাঁ, ভালো হয়ে গেছে।—এই ব'লে মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি স্নান করতে চ'লে গেল।

সুধীর এ ঘরে এলো। দেখলো সমস্ত ঘর ধোয়া, জিনিষপত্র, বিছানা, কাপড়-চোপড়—সমস্ত কাচা হয়েছে, খালি তক্তার উপর সামান্য একখানা

শাড়ী জড়িয়ে কমল চোখবুজে প'ড়ে রয়েছে। প্রভাতের রাঙা আলো কেবল জানলার ধারে এসে ঘরটিকে একটু উজ্জ্বল করেছে।

কমল ?

কমল অতি কষ্টে চোখ খুললো। চোখে তার অশ্রু টলমল ক'রে উঠলো। একটি রাত্রে তা'র চেহারা বদলে গেছে, যেমন পাণ্ডুর তেমনি রক্তহীন।

একটু ভাল হয়েছ ত ?

কমল নীরবে আবার চোখ বুজলো।

তোমার কাছে আমি চিরকাল পাপী হয়ে রইলুম, কমল! আশ্রয় দিতে পারলুম না, সম্মান দিতে পারলুম না,—তুমি আমাকে ক্ষমা করো, কমল!—বলতে বলতে সুধীরের চোখে হু হু ক'রে জল এসে পড়লো। আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় তার জীবন যেন গুরুভার হয়ে উঠেছে।

কমল উত্তর দিল না, কেবল তার বিবর্ণ, রুগ্ন, রক্তহীন দেহ ভিতরের অশ্রু নিশ্বাসে সামান্য আন্দোলিত হয়ে উঠলো।

আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করলুম কমল,—সুধীর বলতে লাগলো, ভালোবাসার এই উঞ্ছবৃত্তি থেকে দুজনেই মুক্তি নেবো। আত্মসম্মান আর দায়িত্ব বহন করবার শক্তি যতদিন না আয়ত্ত করি ততদিন পর্যন্ত দুজন দুজনকে স্পর্শ করব না। আজ দিদির কাছে আর কঙ্করবাবুর কাছেই কেবল মাথা হেঁট হয়নি, নিজের কাছেও এই অলজ্জ অপৌরুষের কোন কৈফিয়ৎ খুঁজে পাইনি। ছি ছি, ধিক্ আমাদের জীবনে, ধিক্ আমাদের মূঢ় নির্বোধ ভালোবাসায়। তোমার এই শাস্তি থেকে আমি যেন চিরজীবনের শিক্ষা পাই।

এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে কঙ্কর এসে হাজির হোলো। হাতে তার কতকগুলি ফলমূল। সুধীর উঠে গিয়ে হাসিমুখে কঙ্করকে আলিঙ্গন করলো। বললে, ঋণী রইলুম চিরকালের জন্যে। বড় কষ্ট হোলো আপনাদের।

কঙ্কর বললে, রোগীর অবস্থা কেমন ?

ফাঁড়া কেটে গেছে।

আপনার দিদি কই ?

ওই যে আসছেন। আপনি এবার একটু বিশ্রাম নিন্। অত রাতে কোথায় গেলেন, কি করলেন কিছুই আর আমার জ্ঞান ছিল না।

সিক্তবস্ত্রে মীনাক্ষী এসে দাঁড়ালো। ভিজা চুল ও কাপড় বেয়ে সর্বাঙ্গে তার তখন জল ঝরছে। বললে, টাকা এনেছ ?

হ্যাঁ, শীঘ্র কাপড় ছেড়ে এসো। বুঝে প'ড়ে নাও।

কাপড় আছে ত' সুধীর তোমার ঘরে ? একখানা শাড়ী আনো দেখি ?

সুধীর একখানা কাপড় আর জামা এনে হাজির করলো। মীনাক্ষী কাপড় ছেড়ে এসে বললে, সুধীর, আগে বাজারে যাও, শীঘ্র ফিরবে, আমি এখনি রান্না চড়াবো। কাঁকর, ওর হাতে টাকা দাও।

সুধীর বললে, আপনাকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে ব'লে দিচ্ছি। না বলতে পারবেন না।

থাকলে ভারি সুবিধে তোমার, কেমন ? স্ত্রী রুগ্না, বাড়ীতে ঝি নেই, দ্বিতীয় লোকের অভাব, রান্নাটা বেশ চলে—এই ত' তোমার উদ্দেশ্য ?

সুধীর হাসিমুখে বললে, আপনার কথায় সেই চিরকেলে খোঁচা। আমি কিন্তু অত ভেবে বলিনি। অগাধ জলে পড়েছি, আপনাকে এখন ছাড়তে পারব না।

মীনাক্ষী বললে, বেঁচে গেলুম ভাই, নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি। হায় হায়, আমাকে দেখবার কেউ নেই। বেশ, তোমার এখানে খাবো আর প'ড়ে থাকবো। বাঁচলুম এতদিনে।

কঙ্কর একটু কটাক্ষ ক'রে বললে, বিনামূল্যে আহার ও বাসস্থান, আর কি চাই ? মেয়েদের দয়া করবার লোকের অভাব হয় না। অল্প বয়সে সবাই দয়া পায়।

মুখে আগুন তোমার। ও যে তোমার ছোট ভাই—ব'লে মীনাক্ষী এবং ওরা দুজন একসঙ্গে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

সুধীর বললে, থাকবেন ত দিদি?

মীনাক্ষী বললে, থাকবো একটি সর্তে।

কি বলুন?

থাকবো আমি তোমার ঘর ভাঙার জন্যে। সুধীর, এ ভাবে তোমাদের আমি থাকতে দেবো না। দুজনে তোমরা ছাড়াছাড়ি হও। আশা করি কাল রাত্রের শিক্ষা ভুলবে না।

নত মস্তকে সুধীর বললে, আমি নিজের জন্যে ভাবিনে কিন্তু—

কিন্তু কমলের জন্যেও আমার চিন্তা নেই। কচি খুকি ত' নয়, দু'দুটো পাশ করেছে। হতভাগা মেয়ের পালক উঠেছিল, তার ফল হোলো।—মীনাক্ষী বললে, এ বাড়ীর ভাড়া কত?

পনেরো টাকা। দু'মাস ভাড়া দিতে পারিনি।

সংসার খরচ কত?

অন্তত পঞ্চাশটে টাকা মাসে।

আয় কত?

পঁচিশ টাকার একটা টিউশনী ছিল, সেটা এমাস থেকে আর নেই।

কোথা থেকে সাহায্য পাও?

একটি কানাকড়িও নয়।

মীনাক্ষী কিয়ংক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর মুখের একটা শব্দ ক'রে বললে, এর নাম আদর্শ প্রেম! রাজপরিবারে যারা থাকতে পারতো তারা এসে দাঁড়ালো আঁস্তাকুড়ে! আদর্শ প্রেম, বুঝলে কাকর?

কঙ্কর বললে, টলারেশন্ তোমার নেই। ওদের দৃষ্টিভঙ্গী যদি তোমার সঙ্গে না মেলে?

থামো, বড বড় কথা কয়ো না। দুবেলা দুমুঠো যাদের ভাত জোটে না, পরণে যাদের কাপড নেই, বাড়ীওয়ালার তাডনা, মুদির অপমান, জন্মশাসন করাই যাদের দাম্পত্য জীবনের পরিণাম—তাদের আবার ফ্রি লভ্‌! মারো ঝাড়ু।—মীনাক্ষী বলতে লাগলো, যেদিন সম্মান দিতে পাববে, যেদিন সম্মান আদায় করতে পারবে, সেই দিন ঘবকন্না করো সুধীব, তাব আগে নয়। এ সব প্রেম নভেলে মানায়, কবিতায় মানায়, জীবনে বড বেমানান।—যাও, শীঘ্র মাছ তবকাবী আনো।—এই ব'লে থলের ঠোঙাটা নিয়ে সে কমলেব ঘবে ঢুকলো।

আবার যখন বেবিয়ে এলো, কঙ্কর বললে, অপমান করলে কেন তুমি ওদেব ?

রূঢ ভাষণকে অপমান বলো না। ছোট থেকে ওদের দেখেছি, আমি সব বলতে পারি।

আমাব সামনে ?

তোমাব সামনে বললে ওদেব শিক্ষা হবে।

কঙ্কব হাসিমুখে বললে, তুমি দেখছি প্রায় একটী 'সমাজপত্নী' হয়ে উঠলে ?

মীনাক্ষী বললে, একথাটা পরিষ্কার থাকা ভালো যে অসংযম আমাব প্রিয়, যদি তার মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকে। কিন্তু যে-অসংযমের মধ্যে শ্রী নেই, পৌরুষ নেই, যাব মধ্যে দুর্বলতাটাই বড, অপবিণামদর্শী অন্ধতায় যেটা অপঘাতেই মরে, বিপ্লব বাধায় না—সেই অসংযম আমাব দুচোখের বিষ। যে-শক্তিহীন ভয়ে ভীত, আঘাতে যে নুয়ে পডে, মানসিক যক্ষ্মায় যে পঙ্গু, দায়িত্বজ্ঞানহীন আসক্তিতে নিরুপায় হয়ে যে পুড়েই মরে, বিপদ দেখলে যে গর্তে গিয়ে লুকোয়,—তার অসংযম পশুপ্রকৃতির অপেক্ষাও ঘৃণ্য। কুকুর-কুকুরীর কামুকতা নিয়ে তোমার তরুণ সাহিত্য বড়াই করতে পারে, কিন্তু আমি তরুণের চেয়েও

তরুণ—আমি পেখম খোলা ময়ূর-ময়ূরীর রতিরঙ্গ দেখতে ভালোবাসি। তাদের পিছনে রয়েছে নব বর্ষার বিচিত্র পটভূমি, কবিতার অপরূপ রসব্যঞ্জনা। সমস্ত প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে সেই সবল, সুস্থ, সুন্দর অসংযম মিলে গেছে। আমাকে সমাজপতি ব'লে গাল দাও সইবো কিন্তু বেকার, দরিদ্র, আত্মসম্ভ্রমবোধহীন তরুণ-তরুণীর বেপরোয়া প্রণয়কাণ্ডের কুৎসিৎ পরিণাম আমার কাছে অতিশয় ঘৃণ্য!

কঙ্কর বললে, এমন অবস্থা তোমারও একদিন হ'তে পারে!

মীনাক্ষী চেঁচিয়ে বললে, যদি হয় সেদিন আত্মগ্লানিতে বিষ খাবোনা। বরং আত্মগৌরবের অবলম্বনকে সেদিন জগতের দরবারে তুলে ধরবো। সমাজের ভয়ে সেদিন খ্যাতিহীন অন্ধকারে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করবো না, সেদিন সবাইকে জানিয়ে যাবো, আমাকে স্থান দেবার মতন সিংহাসন এখনো তৈরী হয়নি—নতুন সমাজ সৃষ্টি করব সেদিন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।

অর্থাৎ পালিয়ে যাবে?

পালিয়ে যাবো না, লাথি মেরে সরিয়ে দেবো।

কঙ্কর হেসে বললে, সেই ইবসেনী সমাজবিদ্রোহ! কিন্তু যাদের হাতে মানুষ হ'লে তাদের প্রতিদান কিছু দিলে না, বরং আত্মপরতাকে কায়েমী করার জন্যে সমাজকে কলা দেখিয়ে পালিয়ে গেলে। স্বীকার করবে না ওরা তোমাকে, তোমার চটুল দুর্নীতিকে, তাই লাথি দেখিয়ে পালাচ্ছ প্রাণভয়ে। মীনাক্ষী, তোমার কথার মধ্যে আত্মপ্রতারণার সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছি।

মীনাক্ষী বললে, কাঁকর, নিজেকে ঠকানো আমার ধাতে নেই। স্বীকার আমাকে তারা করলোনা, সে-অগৌরব তাদের, আমার নয়। আমি এগিয়ে চলেছি, আর তুমি হাঁটতে না পেরে পিছন থেকে আমার আঁচল টেনে ধরছ। যুগে যুগে মানুষের মনের গঠন বদলায়, সেই জন্যে পৃথিবী চিরদিন বিচিত্র। যারা পরিবর্তনকে মানে না তারা নিজেরাও মরে অন্যকেও মারে। আচার-

ধর্মের জোরে যা চ'লে আসছে তাকেই একমাত্র আদর্শ ব'লে স্বীকার করব না। আমাকে ঠাঁই দেবার মতন আশ্রয় যাদের নেই, বুঝতে হবে তারা একাল পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি, তারা পিছিয়ে পড়েছে। আমি তুমি এ কালের মানুষ। এ কালের শিক্ষা,একালের মনোভাব, একালের রীতিনীতি ছাড়া আমাদের চলতে পারে না। সুতরাং সেকালকে ছাঁচ বদলে একালের মতন হ'তে হবে। এই ছাঁচ বদলানোটাই হচ্ছে ইভল্যুশন, এরই নাম প্রগতি। একে যারা স্বীকার করে না তারা জরাগ্রস্ত,তাদেরই নাম প্রাচীনপন্থী। এই প্রাচীনপন্থীদের মূঢ় রক্ষণশীলতা যখন দলবদ্ধভাবে সামাজিক বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নবাগতদের জায়গা ছাড়ে না, তখনই নেপথ্যে দেশজোড়া বিপ্লবের বারুদ তৈরী হতে থাকে।

কঙ্কর বললে, তোমার ভাষাতেই বলি, আধুনিক প্রগতিওয়ালাদের নোংরামিকে তুমি সামাজিক বিবর্তনবাদ বলতে চাও?

নোংরামি তুমি কা'কে বলতে চাও?

এই ধরো, আধুনিক স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ জীবনযাত্রা। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কল্যাণময় তাদের বিদ্রূপ ক'রে চলা, অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষের সমাজে যে সকল আদর্শ ভালো ব'লে চ'লে এসেছে তাদের নিয়ে পরিহাস। তারপর ধরো, অধ্যাত্মজীবনের প্রতি অবহেলা, সত্যকার প্রেম আর ধর্ম আর মনুষ্যত্বকে তাচ্ছিল্য করা, শ্রদ্ধেয় নমস্য যা কিছু তাদের হাস্যাস্পদ ক'রে তোলা—এদেরই ত' নোংরামি বলে।

মীনাক্ষী বললে, ভালো কথা বলেছ। যে-মেসিনটা একদিন নতুন ছিল আজ সেটা পুরনো, লজগজে। তাকে সচল করার জন্য অনেক মবিল্‌ওয়েল খরচা করা গেল, কিন্তু যার ধার ক্ষয়ে গেছে, যার স্ক্রু-গুলোর প্যাঁচ কালক্রমে কেটে গিয়েছে, তা দিয়ে আর কাজ চলে না, নতুন মেসিন আমদানী করো। জোড়াতালি দিয়ে, নীতির বক্তৃতা দিয়ে কল্যাণ করা যায় না, কাঁকর। চেয়ে দেখ ঘুণ ধ'রে গেছে। একশো বছর আগে এই বাংলা দেশে অনেক

বড় বড় ঔপন্যাসিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিশাল কল্পনা, বড় বড় চরিত্রসৃষ্টি, মহৎ আদর্শ প্রচার—কল্যাণ চিন্তার অপূর্ব সমাবেশ ছিল তাঁদের সাহিত্যে। তাঁদের দাম আজ কমে গেছে একথা যদি কেউ বলে আমি তাদের বলব মূর্খ। যা মূল্যবান তা চিরদিনই উচ্চমূল্যে বিকোয়। যেমন সোনা হীরে, মাণমুক্তো। কিন্তু মনে রেখো, দিদিমার কালের সোনার গহনা একালের মেয়েরা পরবে না, জোর করতে গেলে তারা বিপ্লব বাধাবে। বঙ্কিম চাটুয্যের সাহিত্য স্বর্ণময়, কিন্তু সেই পাকা সোনা গালিয়ে একালের ছাঁচে ঢালাই না করলে তাকে স্বীকার করব কেন? বস্তু থাকে এক, কিন্তু স্টাইল বদলায় যুগে যুগে। বোকারা বঙ্কিম শতবার্ষিকীর সময় একবারও বললে না যে, বঙ্কিমকেও একদিন প্রাচীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হয়েছিল। তাদের হাত থেকে সোনা কেড়ে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রও একদিন ঢালাই করেছিলেন নিজের ছাঁচে। সেদিনকার দুর্নীতি-সাহিত্য-লেখক বঙ্কিমকেও তরুণ সাহিত্যিক বলে গাল খেতে হয়েছিল।

কঙ্কর বললে, তুমি বোধ হয় চাইছ, যা কিছু পুরনো তাদের বদলে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ, নৈলে আজকের দিনে তারা অচল।

আমি বলতে চাইছি সব পুরনো জিনিসের নতুন করে পরিচয় ঘটানো। প্রেম বলো, অধ্যাত্মজীবন বলো, রাষ্ট্রচেতনা বলো, সামাজিক নীতি বলো—এদের সম্বন্ধে চলতি নিরীখ বদলে দাও। ভালো রান্নাও রোজ ভালো লাগে না, নতুন ভালো তরকারি রাঁধো—নৈলে জিব আড়ষ্ট হয়ে যাবে, হজমের গোলমাল হবে। বৈচিত্র্যের আস্বাদ থাকলে রুচিটা থাকবে জীবন্ত। রবিঠাকুর যদি সোনার তরী আর চোখের বালির আদর্শ নিয়ে থাকতেন তবে তাঁর হতো সাহিত্যিক অপমৃত্যু। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, তাই নব নব নবান্ন যুগিয়েছেন আমাদের পাতে। মানুষের বিচিত্র রুচির প্রতি এত বড় সম্মান বোধ হয় আর কোন আর্টিস্ট এর আগে প্রকাশ করেন নি। তাই ভদ্রলোক বুড়ো হয়েও

নবযৌবনের দূত, প্রতিদিন নিজের সৃষ্টিকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন, তাঁর প্রতি রচনায় গতিশীল কাল নিজের ছায়া ফেলে চলেছে।

কঙ্কর বললে, তর্কের মীমাংসা হলোনা, মীনাক্ষী!

মীনাক্ষী বললে, এটা তর্কের বিষয় নয়। এ আলোচনায় পাণ্ডিত্য নয়, দিব্যদৃষ্টিই বড। আসল কথাটা মনে রেখো তুমি, পরিবর্তনশীলতাই জীবনের চিহ্ন, গতি বন্ধ হয়ে গেলেই অস্তিত্বের চরম দুর্গতি। গতিমান কালের প্রবাহে বহু মালিন্য আর আবর্জনা ভেসে চলে যায়, যেমন আজকের দিনে আমাদের সমাজে আর সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু তবু এর থেকে বর্তমান জীবনের পানীয় সংগ্রহ করতে হবে। মালিন্য আর আবর্জনা বাদ দিয়ে ঘট আমাদের ভরতেই হবে, নৈলে আমাদের অপমৃত্যু।

কঙ্কর বললে, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে নোংরামি আর আধুনিক সমাজে দুর্নীতি যে ইতিমধ্যে বেড়েই চললো?

মীনাক্ষী বললে, সাহিত্যে নোংরামি, না নোংরা সাহিত্য?

দুইই।

অত্যন্ত সহজ মীমাংসা। বোকাদের কান ধ'রে এই কথাটা জানিয়ে দাও, যেটা সত্যকার সাহিত্য হয়ে ওঠে সেটায় নোংরামি ব'লে কোনো পদার্থই থাকতে পারে না। তুমি বলবে অশ্লীলতা। আমি বলবো যেটা সুন্দর হয়েছে, মধুর হয়েছে, সেটার মধ্যে চরম অশ্লীলতাও মার্জনীয়। যুগে যুগে সাহিত্য বিচারের এই একমাত্র মাপকাঠি। পৃথিবীর সকল বড সাহিত্যের ভিতর বড় বড় চারিত্রিক দুর্নীতি। বড বড আর্টের জন্ম বড দুর্নীতির মধ্যে। অশ্লীলতা আর দুর্নীতির মধ্যে মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলির জন্ম—স্বয়ং বেদব্যাস পর্যন্ত। অত বড় ধার্মিক যুধিষ্ঠির, তাঁর জন্ম হোলো স্খলিতকৌমার্য এক নারীর গর্ভে। প্রাতঃস্মরণীয়া সতীদেবী দ্রৌপদীর দেহখানি নিয়ে পাঁচ-পাঁচটা পুরুষ টানাহেঁচড়া করতেন। অর্জুনের যৌনজীবনের ইতিহাস

শুনলে লাম্পট্যের ওপর অনুরাগ জন্মায়। অর্থাৎ দরকারি কথাটা শুনে রাখো, যিনি ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি বীণাবাদিনী সরস্বতী, তিনি স্বয়ং বেশ্যা। যে সব সমালোচক আধুনিক আর্ট সৃষ্টির মধ্যে অশ্লীলতা আর দুর্নীতি খুঁজে বা'র করে তাদেরও জন্য অতি নোংরা অশ্লীলতার মধ্যে—নির্বোধদের এই সামান্য কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

কঙ্কর বললে, ব্রাভো!

মীনাক্ষী হেসে বললে, আর নয়, এবার রান্না করিগে।

## আট

অতি যত্নে যেটা গড়ে অতি অবহেলায় এক দিন সেটা সহজে ভেঙে দিয়ে যায়—কঙ্করের প্রকৃতির মধ্যে এই ধাতুটা ছিল গুপ্তভাবে। প্রাণের গ্রহটা তার নিয়ত কক্ষচ্যুত, সেটা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ে আপন স্বভাব-ধর্মে। তার স্থিতিটাও গতিশীলতার নামান্তর।

আটটা দিন সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। এই নিরুদ্দেশ হওয়ার অভ্যাসটা তার কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু নয়, এটা তার রক্তে সঞ্চারিত। কতকগুলো বিপরীতধর্মী বুদ্ধি আর আত্মপ্রতিবাদশীল মেজাজের সংমিশ্রণে যে চরিত্রটা দাঁড়ায়—কঙ্কর তারই একটা চলনসই সংস্করণ। তার মুখের সঙ্গে মনের মিল যদি না থাকে তবে দোষ দেওয়া চলবে না, আর মনের সঙ্গে আচরণের যদি পদে পদে অমিল ঘটে তবে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলতত্ত্বের উপর দোষারোপ ক'রে সান্ত্বনা পেতে হবে। কঙ্করকে জানা যায় না, অনুভব ক'রে নিতে হয়। কঙ্কর হচ্ছে প্রবল

একটা প্রাণশক্তির মানবিক সংস্করণ, তার বিচ্ছুরণটা দশদিকে সমান বেগে ধাবিত হয়। গদ্য কবিতা সে লেখে বটে কিন্তু গদ্য কবিতা সে নিজে। তার স্বভাবের অমিল ছন্দের ভাষাটা প'ড়তে যদি বা কষ্ট হয়, ব্যঞ্জনাটা অনুভব করতে দেরি হয় না।

ঝড়ে যে-বাসাটা দুলছে তার প্রতি তার একটা অহেতুক মমতা, সেইজন্য দুর্যোগের অবস্থাটা তার প্রিয়। সুধীর আর কমলের ঘর-কন্না যখন বিপন্ন অবস্থাটা একরূপ কাটিয়ে উঠলো, কঙ্কর আর সেখানে রস পেলো না। তার মন বললে, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে!' কোনখানে তা তার জানা নেই, কিন্তু এখানে নয়। কোনো একটা ছন্দের প্রতি সে আকর্ষণ অনুভব করে না, কোনো শৃঙ্খলায় সে মোহগ্রস্ত হয় না।

বন্ধুসমাজ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো, তোমার চিন্তা আর স্বভাবের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া গেল না।

সে জানালো, সেটা আমার পক্ষে অগৌরবের নয়। বহু প্রকারের ঔষধিরসের সংমিশ্রণে এক প্রকার জারক রস প্রস্তুত হয়। সেই রসটা বিচিত্র, তার গুণ বিচিত্রতর। মানুষের প্রকৃতি অনেকটা এই অসংখ্য বিপরীত রসের একটা সমাবেশ মাত্র।

বন্ধুরা বললে, তুমি সাহিত্যিক, সুতরাং হিসেব ক'রে কথা বলো। বিপরীত হ'তে পারে কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর চেহারায় থাকবে সহজ সঙ্গতি। কবিতা লেখো তুমি, তোমার অচেতনার মধ্যে বহু রকম ভাব-অনুভাবের বিদ্যুৎঝলা দাগ কাটে, একটার সঙ্গে আর একটার মিল নেই, তবু কবিতাটা যখন তুমি লিখেই ফেলো, আমরা দেখি তার মধ্যে একটা অখণ্ড ঐক্য, পরিণত সুষমা।

কঙ্কর বললে, কাব্যের সেই পুরনো বিচার পদ্ধতিতে আজ ভাঙন ধরেছে। ঐক্য আর সুষমা থাকলেই যে রস হবে এমন কোন কথা নেই। বিপরীতধর্মী ভাষা আর ভাব প্রকাশের মধ্যেও একটা নতুন রস খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে,

সেটাকে যদি অবহেলা করো তবে তোমাকে প্রাচীন বলে পরিহাস করবো।
এই শোনো:

ঝড় উঠলো কালবৈশাখীর কালো আকাশে
মদমত্ত বাতাস গর্জে উঠলো সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে
রুদ্র দেবতা ডাক দিয়ে গেলেন ভীষণের ঝুঁটি
নাড়া দিয়ে দিয়ে।
ঝড় উঠলো ভারতবর্ষের রঙীন আকাশের
মুখে কালি মাখিয়ে—
হিমালয় থেকে কি নেমে এলো
কোটি কোটি রাজহংসের সম্মিলিত পাখার প্রভঞ্জন?
সেই ঝড় ঘটালো বিপ্লব বাংলার দূরান্তর দিক্‌দিগন্তে
আফ্রিকার অরণ্য থেকে সুন্দরবনে,
ইংলণ্ডে আর কলিকাতায়—
সেই বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়লো
বাঙ্গালী গৃহবধূর আঙ্গিনায়।
আর তার সঙ্গে আমাদের ছাদের পাঁচিল থেকে
উড়ে গেলো কাপড়গুলি,
অসংখ্য উন্মত্ত এরোপ্লেন্ যেন ডানা মেলে
স্পেন আর চীনের দিকে ধাবিত হলো
আর চেয়ে দেখলুম আমার ঘড়ির কাঁটার দিকে—
দম আটকে সেটা বন্ধ হয়ে গেছে!

সেই ঝড়ে আকাশের তারারা ভীত চক্ষু,
সেই ঝড়ে ভীষণ মরুপ্রদেশ আর গঙ্গার উপকূল
বিধ্বস্ত,
তারই আন্দোলনে সাগর মৎস্যরা
চিৎকার ক'রে উঠলো আনন্দে।

# আঁকা-বাঁকা

গোলদীঘির রাজনীতির সভা ভেঙে গেল,
ডিমের ভিতরে পাখীর ছানা প্রাণ পেলে,
মধ্য এশিয়ার প্রাচীন মরুপথ হোলো
ধূলিধূসর।
আর তার সঙ্গে তপোবনের ঋষিবালিকারা
নেচে উঠলো পেখম মেলে দিয়ে।
বেকার যুবক চেয়ে রইলো রুগ্নচক্ষে
বাতায়ন পথে।
ও বাড়ীর ছাদে বিবাহের উৎসবে নিমন্ত্রিত যারা,
তাদের কলাপাতা গেল উড়ে।

ঝড়ের আলোড়নে হলো সব লণ্ডভণ্ড,
বিরহী ভুলে গেল প্রণয়ের ব্যর্থতা,
কেরানি ভুললো দারিদ্র্য,
তরুণীর পরিচ্ছন্ন কৌমার্যের প্রাঙ্গণে
সহসা এসে পড়লো শেষ বসন্তের একটি ঝরাপাতা।
আর তার সঙ্গে উড়ে এলো
দৈনিক সম্পাদকের টেবিলে
কোথাকার কোন্ অনাথা বনপুষ্পের একটি রেণুকণা,
ভুলিয়ে দিলে প্রত্যহের রাজনীতির কলহ।
সেই আলোড়নে
পতিতার প্রাণে জাগালো করুণ প্রেমের দুরাশা,
বৃদ্ধের চিত্তে জাগালো যৌবন রাগ,
দিনমজুরের প্রাণে আভিজাত্যের স্বপ্ন,
কয়লাখনির কুলীমাগীর পরে রবিঠাকুরের স্নেহ,
প্রহসনের ছলে রচনা করলেন 'প্রহাসিনী।'

বৈঠকী বন্ধু প্রশ্ন করলেন, এটা কেমনতরো হোলো কঙ্কর ? কী এটা ?

কঙ্কর বললে, এটাকে বলতে পারো আধুনিক গদ্য কবিতা।

এটা গদ্য, না কবিতা ?

কঙ্কর বললে, গদ্যের নেপথ্যে রয়েছে কবিতা। কবির অবচেতনার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছিল এই সব বিভিন্ন কল্পনার একটা শোভাযাত্রা। এর মধ্যে কতটা কাব্য, কতটা ইতিহাস, কতখানি সমাজতত্ত্ব, আর কতটাই বা বাস্তব গল্পের অংশ—তার যদি বিশ্লেষণ করো তবে হার মানবে। উড়ো চিন্তার সঙ্গে রসবুদ্ধির সংঘর্ষে সমস্তটাই কেমন একটা কাব্যধর্মী হয়ে উঠলো।

একজন প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এর জাত কি ?

কঙ্কর হাসিমুখে বললে, জাত নেই সুতরাং একে আন্তর্জাতিক আখ্যা দিতে পারো। এর ভঙ্গীটাই প্রধান কথা, আঙ্গিক পদ্ধতি অর্থাৎ টেক্‌নিক্ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। বলবে, চিন্তার সঙ্গতি কোথায় ? বলবে, কাব্যকল্পনার মূলকেন্দ্রটা কি ? আমি উত্তরে বলবো, কবির একটা বিশেষ মূড্-এ আকাশে ঝড় উঠলো। ঝড়ের ধর্ম ওলোটপালট, অর্থাৎ বিপ্লব। চেয়ে দেখো বিপ্লবের চেহারাটা কবিতায় সত্য হয়েছে কিনা। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এই সব বিপরীতধর্মী মালমসলায় একটা সুষমা খুঁজে পাবে বৈ কি।

কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে প্রকাশের সঙ্গতিটাই বড় কথা, কঙ্কর। তুমি ভাবতে পারো নানা কথা, উদ্ভট কল্পনা তোমার বহুরসের সংমিশ্রণে মনের মধ্যে জটিল হয়ে উঠতে পারে কিন্তু তাকে প্রকাশ করার বেলায় দিতে হবে একটা আঙ্গিক ঐক্য। ঐক্য যেখানে নেই সেটা ত' এলোমেলো, সেটা ত' পাগলের প্রলাপ। তাতে ভালো কথা থাকতে পারে, কল্পনাশীল মনের ঐশ্বয প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু সঙ্গতি আর মাত্রাজ্ঞান না থাকলে বলবো, লেখাপড়া জানা পাগলের প্রলাপোক্তি।

কঙ্কর বললে, সেইজন্যই আর্টিস্টের দরকার। বড় প্রতিভা যারা তারা

বিপুল অসামঞ্জস্যের ভিতর থেকে বার করে গভীরতর হারমণি। কাজ তাদের সূক্ষ্ম আর সুন্দর, বহু অনৈক্যের মধ্যে খুঁজে পায় তারা যোগসূত্র। এই কথাটা তোমাদের আগেই জানিয়ে রাখি সাধারণ ভালো কবিতা রচনা করার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ হোলো গদ্যকবিতা রচনা। আশ্বিনের অপরাহ্ণে আকাশের দিকে চেয়ে দেখো। নানারঙের নানান্ তুলিতে আকা খামখেয়ালী বালকের চিত্রপট, এলোমেলো, অগোচালো, বিশৃঙ্খল মেঘের দল। কিন্তু ভালো ক'রে চেয়ে দেখো, তারা সবাই সহজে জায়গা পেয়েছে অপরূপ সজ্জায়, তোমার মনে হবে না যে, কোথাও আছে অসঙ্গতি। চেয়ে দেখো অরণ্যের দিকে। বাঘ আছে, সাপ আছে, জঙ্গলি মানুষ আছে, শিকারীর বন্দুক আছে, পাখীর দল আছে, আর তার সঙ্গে আছে ওষধিলতা আর তপস্বীর কুটীর,—সমস্তগুলো জড়াও একসঙ্গে। এর সঙ্গে ওর মিল নেই, একটা অন্যটার প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তবু মিল রয়ে গেছে পিছনের পটভূমির বিশালতায়।

সাহিত্যিক তর্কসভাটা যখন এইভাবে জমে উঠেছিল তখন একদিন কঙ্কর গা ঢাকা দিল। তার চলন-বচনের কৈফিয়ৎ নেবার মানুষ নেই; সেইজন্য কোথাও বাধ্যবাধকতাব প্রশ্ন ওঠে না। ওই সাহিত্যিক সভায় পাওয়া গিয়েছিল এক গেরুয়া-পরা সংসারত্যাগী বন্ধুকে। যুবকটির আসল নাম পাওয়া যায় না, মঙ্গল শর্মা নামে বন্ধুসমাজে সে পরিচিত। তার সঙ্গেই সেদিন পথে বেরিয়ে কঙ্কর প্রশ্ন করলো, শর্মাজি, তুমি আগে যে সব উপন্যাস লিখতে, সেগুলো কি হোলো?

শর্মাজি বললে, আমার এক মাসতুতো বোনের কাছে সেগুলো গচ্ছিত আছে। সে এখন শ্বশুর-বাড়িতে।

বলো কি, স্বামী তাঁকে এখনো ত্যাগ করেন নি?

শর্মাজি হেসে বললে, ভয় নেই, সে কোনো বইয়ের নায়িকা নয়।

কিন্তু তাঁর কাছে কেন?

তার কাছে আমার গল্প রচনার প্রথম পাঠ। সব ছেড়ে ছুড়ে আসবার সময় তার কাছে পাণ্ডুলিপিগুলো জমা রেখে আসি।

কেমন হয়েছিল সেগুলো?

মন্দ নয়, আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো।

কঙ্কর বললে, বেশ ত, বই লিখেই ত' খেতে পারতে আর পাঁচজন আধুনিক সাহিত্যিকদের মতন, তবে আবার গেরুয়া চড়াবার দুর্মতি হোলো কেন? উপন্যাস লিখতে গেলে শুনেছি অভিজ্ঞতার দরকার, ওসব দিকে কেমন ছিলে?

শর্মাজি হেসে বললে, ছিলুম পাঁচজনেরই মতন। যা জানিনে তাই লিখতুম, আর যা জানতুম তা লিখতে সাহস হোতো না।

প্লট পেতে কোথায়?

প্লট ত' দরকার হোতো না! একটা ছোকরা কিংবা একটা ছাত্রীকে খাড়া ক'রে বকতে পারলেই হোলো। তাদের নিয়ে তাড়িয়ে-তাড়িয়েই যাকে বলে রসোদ্ঘাটন। তারা নড়লে-চড়লেই প্লট্। তার সঙ্গে খানিকটা বাঙালি কায়দা-কানুন! এ ছাড়া মাথার মধ্যে ছিল রাসেল, হাক্সলি, আরলেন, ওয়েল্স, প্রিষ্টলে, লরেন্স, আর শেকভ-টুর্গেনিভ।

কঙ্কর বললে, প্রেমের গল্পে হাত ছিল কেমন?

প্রশ্নটায় খুশী হয়ে শর্মাজি হাসিমুখে বললে, বলতে লজ্জা করে।

লজ্জা কি, এখানে কেউ নেই, বলো।

শর্মাজি মৃদুকণ্ঠে বললে, হাত ভালোই ছিল, কিন্তু এখন সেগুলো ছাপালে গলায় দড়ি দিতে হবে।

কঙ্কর পরিহাস ক'রে বললে, তবে শোন, একটা সহজ পন্থা বাংলাই। ছদ্মনামে সেগুলো বটতলায় বিক্রি ক'রে দাও, টাকা পয়সা কিছু পাবে, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে দিয়ো। দেশও তোমার সেই সব সৎসাহিত্য থেকে বঞ্চিত হবে না!

শর্মাজি উল্লসিত হ'য়ে বললে, ভাই, আমাদের আশ্রমে আজকাল শতকরা পঞ্চাশজন সন্ন্যাসী গোপনে উপন্যাস আর কবিতা লেখে, তোমাকে বাজি রেখে বলছি।

কঙ্কর বললে, অনেক কাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা, চলো আজ সিনেমায় যাই।

শর্মাজি সহসা পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে, দোহাই, ক্ষমা করো। দেখতে হ'লে একাই দেখবো লুকিয়ে। রসচর্চায় সন্ন্যাসীরা সাক্ষী রাখে না!

এই ব'লে শর্মাজি বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

কঙ্কর গিয়ে ঢুকলো সিনেমায়। আধঘণ্টা আগে ছবি আরম্ভ হয়ে গেছে। দামী টিকিট কিনে যেখানে গিয়ে সে বসলো সেখানে আশ-পাশে অন্ধকারে স্ত্রীপুরুষগণের উচ্ছ্বসিত উল্লাস দেখা যাচ্ছে। জানা গেল এই ছবিখানা ত্রিশ সপ্তাহ ধ'রে চলছে, কাগজ পত্রে এর অজস্র প্রশংসা। দেশী সিনেমায় কঙ্কর ঢোকে না, অর্থের অপব্যয় কা'কে বলে অবশ্য দু'একবার সে দেখে এসেছিল। উচ্ছৃঙ্খল নায়ক আর ছিঁচকাদুনে নায়িকা—এই হোলো দেশী সিনেমার ছবির বাহাদুরী। পুলিশের আক্রোশ বাঁচিয়ে, বাঙালী সতীপনার নীতি বাঁচিয়ে, ডিরেক্টরের আবদার বাঁচিয়ে, স্বত্বাধিকারীর খরচ বাঁচিয়ে, অভিনেতা অভিনেত্রীর চাকরী বাঁচিয়ে—দেশী সিনেমার ছবি যা হয় তাকে কী বলা চলে? নায়ক হয়ত' একজন কোটপ্যাণ্টপরা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের দোআঁসলা সন্তান, তার না আছে সংশিক্ষা, না আছে বুদ্ধি, কেবল একটা হাস্যকর বৈচিত্র্যহীন অক্ষম প্রণয়-নিবেদনের পালার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে কোনো রকমে কায়ক্লেশে স্বত্বাধিকারীর নিকট চাকরী বজায় রাখে। আর নায়িকা? কলিকাতার কয়েকটি ধনীর হাত-ফেরতা হয়ে মেয়েটি হয়ত এসে পড়েছে একজন অশিক্ষিত ডিরেক্টরের পাল্লায়—রংটা হয়ত চিকচিকে, যৌবন হয়ত

ধরাবাঁধা, চেহারাটা হয়ত দুর্ভিক্ষপীড়িত, স্বত্বাধিকারী আর ডিরেক্টরের চক্ষে কিছু চলনসই—অমনি তার চাকরী হয়ে গেল। মেয়েটিকে শোধন ক'রে আঁস্তাকুড় থেকে ঠাকুর ঘরে তোলা হোলো, নামের পাশে 'দাসী' কেটে 'দেবী' বসানো গেল,—আর যায় কোথায়? ফ্রি পাস আর সস্তা বিজ্ঞাপন পাওয়া সাপ্তাহিকের সম্পাদকরা হাততালি দিয়ে জানালো, বাহবা! বাস্, বানাও একটা গল্প। ভালো চেহারার নায়িকা যখন পাওয়া গেল, ভালো লেখকের গল্প না নিলেও চলবে! ডিরেক্টর ব'সে গেলেন প্রোপ্রাইটরকে নিয়ে গল্প রচনায়। সাহিত্যিকরা টাকা চায়, সুতরাং তাদের গল্প নেওয়া হবে না, বরং সে টাকা মদের দেনায় আর মহামান্যা অভিনেত্রী রসতরঙ্গিনী দেবীর মাসিক বেতন দেওয়া চলবে? সিনেমার গল্পের রসজ্ঞ সাহিত্যিকরা কি জানে? গল্প লেখা গেল খুব সহজে। হতাশ প্রেমিক নায়ক—মধুর স্বভাব আর লাম্পট্য চলবে পাশা-পাশি; নারীর স্নেহলোভী, জীবন-বৈরাগী; মাতৃস্নেহ নিয়ে কিছু কান্নাকাটি—কারণে অকারণে প্রাণ ভ'রে একবার মা ব'লে ডাকলেই বাঙ্গালী দর্শক কেঁদে আকুল; ভিক্ষুকের গান খান চারেক; তিনটে গ্রামের সীন্; জন আষ্টেক তরুণীর পুকুরঘাটে জল ছোড়াছুড়ি; ভিজা কাপড়ে জল আনা আর নায়কের সঙ্গে দেখা হওয়ার সীন্, দুটো বালীগঞ্জী ড্রয়িংরুমের দৃশ্য,—একটি আপ-টু-ডেট্ হিরোয়িন, খান চারেক রবি-ঠাকুর-জাতীয় গান; কিছু সমাজবিদ্রোহ, কিছু নীতির বক্তৃতা, কিছু ফিনফিনে শাড়ী আর কাঁধকাটা-বুকখোলা ব্লাউসের অশ্লীল গতিভঙ্গী, কিছু ব্যর্থ প্রেমের নপুংশকসুলভ গদ্গদ ভাষা,—ব্যস্, আর কি চাই। বাঙ্গালী দর্শক এর বেশি কিছু চায় না, বাঙালী মেয়েরা এইটুকুতেই পরিতুষ্ট। শেষকালে ভিক্ষুক আর ভিক্ষুক-বালিকার মুখে একটি দেহতত্ত্বের গান ঢুকিয়ে একটি লং শট্। বিজ্ঞাপনের লোভে দৈনিকে, মাসিকে, সাপ্তাহিকে অবিশ্রান্ত হাততালি, এবং ফ্রি পাসের বিনিময়ে বন্ধু ও পরিচিত মহলে অক্লান্ত প্রোপাগাণ্ডা।

## আঁকা-বাঁকা

একটা হাততালির শব্দে কঙ্করের চমক ভাঙলো। এতক্ষণ তার খেয়াল হয়নি, এইবার দেখলো তার সম্মুখে একটি ইংরেজী অপেরা অভিনীত হচ্ছে। আকস্মিক হাততালির কারণ, একদল অর্ধনগ্ন নর্তকীর একটা বিচিত্র অশ্লীল ভঙ্গী। দেশী সিনেমায় মেয়েরা দেখায় বুক, বিলেতী সিনেমায় তারা দেখায় পা। বোধ হয় সভ্য জগতে এ দুটি ছাড়া মেয়েদের আর কোনো সম্বল নেই, বোধ হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এই দুটির জোরেই মেয়েরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার পায়, বোধ হয় চিরদিন তারা পুরুষের নির্বোধ লালসাকে এই উপায়ে উত্তেজিত ক'রে আনন্দ পায়। দেশী সিনেমায় ন্যাকামি আর বিদেশী সিনেমায় দুর্নীতি। কিন্তু পৌরুষ, বৈচিত্র্য, মত্ততা আর উৎকৃষ্ট অভিনয়ের গুণে বিদেশী ছবি যেখানে দর্শক সাধারণের নিকট প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় দেয়, দেশী সিনেমা সেখানে অক্ষম অনুকরণ আর দুর্বল ভাঁড়ামির কদর্যতায় দর্শকদের মনকে যন্ত্রাগ্রস্ত ক'রে তোলে। জনকয়েক অশিক্ষিত আত্মাভিমানী অর্থলোভী দেশী ধনিকের কদর্য চিত্তবৃত্তিকে প্রকট ক'রে তোলাই দেশী সিনেমার একমাত্র বাহাদুরী।

অপেরার উৎপীড়ন অনেকক্ষণ সহ্য ক'রে সাময়িক বিরতির সময় কঙ্কর পথে বেরিয়ে পড়লো। ম্যাটিনী শো ছিল সুতরাং পথে বেরিয়ে দেখা গেল সন্ধ্যা তখনো হয়নি, বেলা সাড়ে পাঁচটা কিম্বা ছ'টা। চায়ের তৃষ্ণা ছিল, কঙ্কর গিয়ে হোটেলে ঢুকলো। ঢুকতেই দেখা গেল তার একদল কলেজ-বন্ধু চায়ের পেয়ালার সঙ্গে একটা ভীষণ আসর জমিয়েছে। সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানালো। প্রথম যুবক প্রশ্ন করলো, বেঁচে আছিস ?

কঙ্কর মিলে গেল তাদের সঙ্গে। বললে, কি নিয়ে এতক্ষণ ঝগড়া চলছিল তোদের ?

সেই সনাতন সমস্যা, হিন্দু-মোসলেম মিলন।

ঠোঁট উল্‌টে কঙ্কর বললে, সেই সনাতন কাঁঠালের আমসত্ত্ব। তেল আর

জল, লুঙি আর কাছা, বদনা আর গাড়ু, পূব আর পশ্চিম, দাড়ি আর টিকি, গরু আর শূয়োর, মসজিদ আর মন্দির, লাঠি আর ছুরি—তারপর আর কি যেন ?—থাম্, অন্য কথা বল্ ভাই।

একজন প্রস্তাব করলো, কঙ্করকে যখন আজ অনেকদিন পরে পাওয়াই গেল, তখন যাওয়া যাক্ এলবার্ট হ'লে—ভালো সভা আছে।

বিষয়টা কি ?

বিষয় চমৎকার। আমাদের প্রফেসর শ্যামরতন বাঁড়ুয্যে সভাপতি। বিখ্যাত বক্তার দল। চলো ভাই কঙ্করকে আজ তুলে দেওয়া যাবে। আর যাই হোক, কঙ্কর ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট পাওয়া ছেলে। বক্তৃতা করবি ত কঙ্কর ?

কঙ্কর বললে, বিষয়টা কি শুনি।

আধুনিক শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা।

নারী-বক্তা আছে ?

Good God. মেয়েরা কথা বলে না, শোনে। পুরুষের মুখে ওদের ভাষা! ওরা পুরুষের গ্রামোফোন্।

মেয়ে নেত্রী কেউ আছেন ?

Sorry. মেয়ে নেত্রী বাঙলায় জন্মায় না।( বছরে দশমাস যারা গর্ভাধান নিয়ে ব্যস্ত, পরান্নে আর পরাশ্রয়ে যারা চিরদিন প্রতিপালিত, সতীত্বের পাহারা দেওয়া যাদের সকাল সন্ধ্যায় একমাত্র কাজ—

তৃতীয় বন্ধু যোগ ক'রে দিল, যাদের শিক্ষা প্রেমপত্র পর্যন্ত, দীক্ষা পতি-পরম গুরু, আহার চিংড়ী মাছের ঝোল, স্বাধীনতা—বাপের বাড়ী আর শ্বশুরবাড়ীর মাঝামাঝি পথ—

চতুর্থ বন্ধু যুগিয়ে দিল, যাদের পলিটিক্স কেবল একটি স্বামী খুঁজে নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকা—

পঞ্চম বন্ধু বললে, তাদের আবার স্বাধীনতা!

তবু স্থির করা গেল, এ হেন বাঙালী মেয়ের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যখন সভায় আলোচনা করার কথা উঠেছে তখন সদলবলে যাওয়াই যাক্। চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে সবান্ধবে কঙ্কর বেরিয়ে পড়লো। ধর্মতলার মোড় থেকে সবাই বাস-এ উঠলো। তাদের নীতিজ্ঞানহীন চক্ষুলজ্জা-বিহীন আলাপ অনেক যাত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করলো। এক বন্ধু বললেন, বাঙালী মেয়ের স্বাধীনতার আলোচনায় বাস-ভাড়া খরচ করা চলে না।

দ্বিতীয় জন বললে, কঙ্কর, সেলুন থেকে দাড়িটা কামিয়ে নিলেই পারতিস, আর এক জোড়া ফরসা ধুতি পাঞ্জাবী,—তোর চেহারাটা কাজে লাগতে পারতো!

কঙ্কর বললে, ছো: বাঙালী মেয়ের আবার পছন্দ। পুরুষ মানুষ হ'লেই হোলো।

এলবার্ট হল-এ তারা এসে পৌছলো তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। জনতা কম নয়। লাল শালুর উপরে তুলোর অক্ষরে লিখে শ্রোতা আকর্ষণ করা হচ্ছে। দু'একজন তরুণী-ভলাণ্টিয়ারকে দাঁড় করিয়ে দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপেক্ষা জীবন্ত স্ত্রীলোকের আকর্ষণ কেরানি ও ছাত্রমহলে অনেক বেশি।

বন্ধুরা গিয়ে অনেক ভীড় ঠেলে এক জায়গায় চাক বেঁধে বসে গেল। অনেকেই তাদের সহজ হাসি-পরিহাস আর কানাকানি দেখে কানাকানি করতে লাগলো। একজন বক্তৃতা করছিলেন,—সভায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী থাকার জন্য ভদ্রলোকের আগ্রহ ও উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। তাঁর বক্তৃতায় চটুল পরিহাস ও যুক্তির অসারতা থাকার জন্য মাঝে মাঝে 'শুনুন, শুনুন' রব উঠছিল। তিনি বসবার পর এক প্রবীন ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কণ্ঠ স্বচ্ছ, বক্তব্য জলের ন্যায় তরল, এবং তা'তে আগাগোড়া উপদেশ

থাকার জন্য সভাপতি মহাশয় ফিস্ ফিস্ ক'রে অনুরোধ করলেন, তাড়াতাড়ি শেষ করুন। তারপরে উঠলেন এক মহিলা। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে। ভীষণ স্থূলাঙ্গিনী। সাজসজ্জায় তিনি আঠারো বছরের তরুণী, প্রসাধনে সাধনা বোসের সমান, ভঙ্গীতে মিসেস্ রায়, বক্তব্যে দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ,—বন্ধুরা হেসে কুটী কুটী হোলো। তারপর একে একে এলো ভাড়াটে বক্তার দল—যাদের বক্তৃতার মাশুল লাগে না, বক্তৃতাই যাদের পেশা। যারা পাটের চাষ, নারীহরণ, হিন্দুসভা, হরিজন, বেদান্ত ধর্ম, বিদ্যাসুন্দর, ম্যুনিসিপাল নির্বাচন—প্রভৃতি বিষয়ে সমান বেগে বক্তৃতা দিতে পারে, যারা সকালে উঠে আগের দিনের সব কথাই ভুলে যায়।

সবশেষে সভাপতি মহাশয় উঠে কয়েকটা হাততালি নিয়ে বললেন, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাবৃন্দ, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচন ক'রে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার বক্তব্য সামান্য, বেশিক্ষণ আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আজকের এই সভায় যে সকল পণ্ডিত ও বিচক্ষণ বক্তাগণ তাঁদের স্বভাবসুলভ মধুর ভাষায় আপনাদের নিকট বক্তৃতা করেছেন, আমি তাঁদের তুলনায় অতি নগণ্য, কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বক্তব্যের আগে যদি কেউ আরো কিছু বলতে চান্ তবে আমি সানন্দে—

এমন সময় কঙ্কর উঠে এগিয়ে এসে মঞ্চের উপর দাঁড়ালো। বললে, আপনাদের অনুমতিক্রমে যদি ছাত্রদের পক্ষ থেকে কিছু নিবেদন করি তবে আশা করি ক্ষমা করবেন।

বলুন বলুন—

বলো হে ছোকরা—

সব রকমই শুনে যাই—

কোত্থেকে উঠে এলে ভাই ?

বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত—

তোমার নাম কি হে?

স্পর্দ্ধা ত' কম নয়!

কঙ্কর থিয়েটারি ভঙ্গীতে বলতে লাগলো, দয়া ক'রে আপনাদের শুনতে বলবো না, জোর ক'রে শোনাবো। কৌতুক আর বিদ্রূপ যারা প্রথম থেকে সহ্য করে তাদের মধ্যে সত্য আছে স্বীকার করতে হবে।

তার ভীষণ চীৎকারে সভা স্তব্ধ হোলো। কঙ্কর আর একটা অস্ত্র হানলো। বললে, মা-বোনের সম্বন্ধে আলাপ আলোচনায় পরিহাস করাটাকেই যারা নিছক বাহাদুরী মনে করে তাদের কি বলবো? উচ্চ-শিক্ষার সঙ্গে ভদ্রবুদ্ধির সম্পর্ক কম—আধুনিক কালে এরই প্রমাণ নিয়ে কি ঘরে ফিরতে হবে?

হিয়ার, হিয়ার—

উচ্চ আধুনিক শিক্ষা মানুষের মনে এনেছে গভীর সংশয়বাদ, মানুষের প্রতি মানুষের প্রচ্ছন্ন ঘৃণাবোধ, সমাজদেহের রক্তে সঞ্চার করেছে ঈর্ষা ও অবিশ্বাসবাদের হলাহল, স্বেচ্ছাচারী প্রভুত্বের প্রলোভন। ভাড়াটে বক্তারা যাই বলুক, আমি বলবো এই আধুনিক শিক্ষা আমাদের নির্মল করেনি, বরং বহু নদীর জলের একত্র বন্যায় যেন একটা মারাত্মক ব্যাধির প্রসার বাড়িয়েছে—

হিয়ার, হিয়ার—

মানব কল্যাণ সম্বন্ধে চিন্তা করবার যে সহজ প্রাচীন পদ্ধতি, তাকে অস্বীকার করার, অশ্রদ্ধা করার একটা প্রবল স্পর্দ্ধা দাঁড়িয়ে উঠেছে। যে দিন থেকে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক শব্দটার জন্ম সেই দিন থেকেই মূঢ় উন্মত্ত জাতীয়তার নামে নির্লজ্জ সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে,—এর পরিণাম হোলো জগৎজোড়া প্রলয়! প্রলয়ের অর্থ বিপ্লব,—বিপ্লবের শিখা জ্বলবে দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, রক্তে রাঙা হবে সব।

কী বলছেন মশাই, সিডিশ্‌ন, রাজদ্রোহ!

আজ সেই বিপ্লবের শিখার আভায় সমস্ত কিছুকে বিচার করতে হবে। আমি

নির্ভয়ে বলিতে পারি আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক কম। তাদের পক্ষে উপার্জনমূলক শিক্ষার প্রয়োজন বড নয়, তারা ছেলেদের যোগ্য হবে, সিংহ শিশুর জননী হবার যোগ্যতা আহরণ করবে।

হিয়ার, হিয়ার—

এদেশে স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ, কল্পিত অপবাদ আর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো, দুর্নামের দাগে তাদের জীবদ্দশাটা হয় বিদ্রূপে জর্জর। মেয়েদের কলঙ্কে আমরা বেশি বিশ্বাস করি, সহজে বিশ্বাস করি, শীঘ্র বিশ্বাস করি। কাব্যে, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে স্ত্রীলোকের প্রতি আমরা সম্মান প্রকাশ ক'রে থাকি, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাদের নির্লজ্জভাবে বিদ্রূপ করি।

এমন সময় আসরের ভিতর থেকে একটি তরুণী উঠে দাঁড়ালো। গলা বাড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে, On a point of order, Mr. President—

শ্রোতা ও দর্শকের দৃষ্টি ঘুরে গেল। সেই নিস্তব্ধ সভায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কঙ্কর সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, অতি মনোহর সাজসজ্জায় দুই কানে দুটি ঝুমকো প'রে স্বয়ং মানাক্ষী দাঁড়িয়ে উঠেছে। মুখে হাসি-হাসি ভাব, চোখে অপরূপ মাদকতা, সর্বাঙ্গ তরঙ্গে টলোমলো, কণ্ঠে বীণাবাদিনীর সঙ্গীত, দুটি নিরাবরণ বাহুর সঞ্চালনে শ্রোতাগণের মুগ্ধ দৃষ্টি। কালো রেশমী শাড়ীতে রূপালী জরির পাড়, যেন অন্ধকারে বিদ্যুৎফণাদলের বিচিত্র কৌতুক।

সভাপতি মহাশয় বললেন, বলুন আপনার বক্তব্য।

মীনাক্ষী বললে, মাননীয় বক্তার নাটকীয় ভাষার ভিতরে প্রকৃত বক্তব্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর মুখে স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ শুনে আমরা স্তম্ভিত, এর পর তিনি আরো কি অনর্থ ঘটাবেন জানতে চাই।—এই ব'লে সে হাসিমুখে ব'সে পড়লো।

কঙ্কর বললে, সভাপতি মহাশয়, স্বাধীনতা স্ত্রীলোকের কাছে একরূপ, পুরুষের কাছে অন্যরূপ। স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও স্বাধীনতার অর্থ যদি এই হয় যে,

তারা উপার্জন করতে সুরু করবে তবে আমি বলি বেকার সংখ্যা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

মীনাক্ষী আবার টপ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। বললে, Question, Mr. President.

বলুন ?

মাননীয় বক্তার মুখে সুলভ হিটলারী বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা এখানে সমবেত হইনি।

ঠিক ঠিক—

বটেই ত—

বসে পড়ো ভাই—

Go on.

কী বেহায়া মেয়ে !

কঙ্কর বললে, মেয়েরা জীবিকা অর্জন করবে অথচ সংসারের কাছে নিজেদের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করবে না, এটার নাম মেয়েলি রাজনীতি ! যাদের প্রতি কর্তব্যবোধ নেই অথচ যাদের হাত থেকে সুবিধা নেবো, এর নাম মেয়েলি যুক্তি। অবাধ স্বাধীনতা আছে অরণ্যে, প্রান্তরে,—মানুষের সমাজে স্বাধীনতা পেতে গেলে মানুষের কর্তব্যবোধ দাবি করবো ! পুরুষের হাত থেকে গোপনে সকল সুবিধা নেবো অথচ প্রকাশ্য সভায় পুরুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবো—এর নাম স্ত্রী স্বাধীনতা নয়! মেয়েদের যতগুলো সামাজিক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আজ গ'ড়ে উঠেছে, সমস্তগুলোর পিছনে রয়েছে পুরুষের সংগঠনশীলতা। মেয়েদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে পুরুষের মস্তিষ্ক আব কর্ম-তৎপরতা রয়েছে। পুরুষ চালনা করে পৃথিবীকে, পুরুষ সৃষ্টি করে সমাজ, পুরুষের প্রতিভার আশ্রয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পুরুষের হাতে যুদ্ধ ও শান্তি, পুরুষের হাতে রাজনীতি ও অর্থ ভাণ্ডার ! পুরুষের প্রতিভাকে, কর্মকে, সাধনাকে, সংগ্রাম ও সমাজসৃষ্টিকে মেয়েরা

উপকরণরূপে সাহায্য করে এই মাত্র। সুপ্রাচীন কাল থেকে ইতিহাসের কোথাও মেয়েদের স্বকীয়তা স্বীকৃত হয়নি।

হিয়ার, হিয়ার—

মেয়েদের স্বাধীনতার অর্থ ভীড়ের ভিতর থেকে মনের মতো সুবিধা আদায় ক'রে নেওয়া, আর পুরুষের স্বাধীনতার অর্থ অবহেলায় নিজের সৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া—

হিয়ার হিয়ার—বেশ ভাই, বেশ। জীতা রও।

মীনাক্ষী উঠে দাঁড়ালো। বললে, সভাপতি মহাশয়, মেয়েদের প্রতি মাননীয় বক্তার এই অশিষ্ট মন্তব্যের পরে আমাদের সভাস্থল পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া উচিত।

তার কথায় সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠলো। সভাপতি মহাশয় 'অর্ডার অর্ডার' ব'লে চীৎকার করলেন! গণ্ডগোল আরো বেড়ে গেল। শ্রোতার দল কোনো কথা না শুনে জটলা পাকিয়ে সভায় একটা দক্ষযজ্ঞের পালা সুরু ক'রে দিল। দু'চারজন তরুণ মারমুখী হয়ে সভার দিকে ধাবিত হোলো। মেয়েদের প্রতি অসম্মান! অসহ্য! মীনাক্ষীর অপরিমেয় যৌবন, অপরূপ মুখশ্রী—সুতরাং দর্শক ও শ্রোতার দল ভীষণ ক্ষিপ্ত হ'য়ে একটা প্রবল মত্ততায় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

সভাপতি মহাশয় সভা ভঙ্গ ক'রে দিলেন।

পুলিশ—পুলিশ—বিপ্লব—রক্ত চাই!

মারো বেটাকে—

সাবধান ব'লে দিচ্ছি—

মায়ের জাতিকে ইন্‌সল্ট্‌?

মেয়েদের দলে একটা আন্দোলন জাগ্‌লো। সবাই মীনাক্ষীকে স্তব-স্তুতির দ্বারা তুষ্ট করতে চাইলো। মীনাক্ষী ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

নেমে এলো। মারমুখী জনতার ভিতর থেকে বন্ধুরা অতি কষ্টে কঙ্করকে পিছনের দরজা দিয়ে পথে নামিয়ে আনলো। তখন পাহারাওয়ালার দল কর্মতৎপর হয়ে জনতাকে সংযত করতে লাগলো।

পথ লোকে লোকারণ্য হোলো। সেই বিরাট জনতা চীৎকার ক'রে উঠলো, বন্দে মাতরম্! দিল্লী চলো! দিল্লী চলো!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্।

মহাত্মা গান্ধীকি জয়।

নেতাজী সুভাষ বোস কি জয়!

বন্দে মাতরম্!

জয় হিন্দ্!

পুলিশ পাহারার হেপাজতে একদিক থেকে মীনাক্ষী ও তার স্তাবক-দল এবং অন্যদিক থেকে কঙ্কর ও তার দেহরক্ষীর দল রাজপথের ধারে এসে দাঁড়ালো। মীনাক্ষীর অনুরোধে একটি ভক্ত একখানা ট্যাক্সি ডাকলো। ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল। তখন সমবেত জনতা, স্তাবকদল, ভক্তবৃন্দ ও অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের ভীড় ঠেলে অনন্তযৌবনা উর্বশীর মতো অপরূপ সাজসজ্জায় ভূষিতা মীনাক্ষী এগিয়ে এসে হাসি-মুখে কঙ্করের হাত ধ'রে টেনে বললে, গাড়ীতে উঠে এসো।

কঙ্করের দেহরক্ষী ও বন্ধুর দল হতবাক্, বিস্ফারিত চক্ষু।

বিশাল জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত, বিমূঢ়, হতচেতন ও নির্বাক। কঙ্কর হাসিমুখে মীনাক্ষীর হাত ধ'রে বললে, একেবারে গদ্য কবিতা! চলো।

দু'জনে মোটরে গিয়ে উঠলো। মোটর ছাড়বার আগে মীনাক্ষী গলা বাড়িয়ে কানের দুল দুটো দুলিয়ে হাসিমুখে জনতার প্রতি হাত নেড়ে বললে, বন্দে মাতরম্!

একজন বললে, ভীষণ ষড়যন্ত্র, মশাই! আমাদের বোকা বানিয়ে কলা দেখিয়ে ওরা পালালো।

কিন্তু সমবেত জনতা মীনাক্ষীর সুডোল সুন্দর বাহুর অনুপ্রেরণায় রস-গদগদ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্, জয় হিন্দ্!

মোটর ছুটতে লাগলো। কঙ্কর বললে, তোমার মারাত্মক রসিকতার জন্য আমার প্রাণটা যেতে বসেছিল, মীনাক্ষী। হাসছ যে?

মীনাক্ষী ডান হাতে কঙ্করের গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে গুনগুন ক'রে গান ধরলো, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি, সকল দেশের রাণী সেযে……

ঘুষি পাকিয়ে হাসিমুখে কঙ্কর বললে, 'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা!' কিন্তু ব্যাপারখানা কি, আজ হঠাৎ এই মিটিংয়ে তোমার আবির্ভাব? ভাগ্যি, আজ হঠাৎ আমি গিয়ে পড়েছিলুম?—এই ব'লে সে হাঁপাতে লাগলো।

মীনাক্ষী বললে, আজ তুমি আসবে জানতুম।

জানতে?

জানতুম মেয়েদের শ্রাদ্ধ যেখানে হয় সেখানে তুমি আসবে মন্ত্রপাঠ করতে। যাক্ এ সব যেতে দাও, এখন কথা হচ্ছে এ-কদিন এমন বিনা নোটিশে তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছিলে কেন?

কঙ্কর বললে, তুমি সংসারী হয়ে গেলে সেই দুঃখে।

এ কথা তাহলে শোনোনি যে, দিয়েছি সেই সংসার ভেঙে? এইবার দাসীকে পায়ে ঠাঁই দাও!

তাহ'লে সুধীর আর কমলের কি অবস্থা দাঁড়ালো?

মীনাক্ষী বললে, অনেক কষ্টে খোঁচা দিয়ে ভাঙলুম ওদের পাখীর বাসা। কমল কেঁদে বললে, যাবো কোথা? বললুম, চুলোয়। হতভাগি, রাশ ধরতে শেখোনি অথচ গাড়ীতে ঘোড়া জুতেছ? ভালোবাসা করতে শিখেছ, দায়িত্ব

নিতে শেখোনি ?—যাই হোক, মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে তার মা'র কাছে হাজির করলুম—

তারপর ? বেশ ইন্‌টরেস্টিং মনে হচ্ছে—

তারপর যথারীতি কাটা কান চুল দিয়ে ঢেকে মা-ঠাকরুণ ধুয়ে মুছে মেয়েকে তুললেন। গায়ে কাদা লাগলেও মানুষটা ত' আর নষ্ট হয় না ?

আর সুধীরের ?

সে পুরুষ মানুষ, অসুবিধে নেই। তবে আমার এক কাকা আছেন করপোরেশনে, বড় অফিসার—তাঁর কাছে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে বললুম, আমার ভাইটিকে একটি চাকরি দিতে হবে। তিনি রাজী হয়েছেন, মাস তিনেক বাদে সুধীর কাজে বহাল হবে।

তারপর ?

তারপর শাস্ত্রমতে মন্ত্রপাঠ ক'রে সাতপাক ঘুরে গায়ে হলুদ আর ছান্‌লাতলা ডিঙিয়ে ওরা দুজন বিয়ে করবে। বিধিমতে বিয়ে, কুমার কুমারীর মধুমিলন। আদি ও অকৃত্রিম, দেশী গাছগাছড়ায় প্রস্তুত।

কঙ্কর বললে, কমলের মা টের পাননি কিছু ? অন্তত কমলের চেহারা দেখে ?

মীনাক্ষী বললে, ভয় নেই, কমলের মা ডাক্তার নয়। আমি ছিলুম যে সঙ্গে। জর্জেট্ শাড়ি, চোখে কাজল, গালে রুজ, চাঁদের টিপ—এই সব দিয়ে সাজিয়ে একেবারে আন্‌কোরা মেয়ে নিয়ে পৌঁছে দিলুম। বললুম, মেয়ে আপনার গিয়েছিল আসামে চাকরি খুঁজতে। এইটুকু মেয়ে একা চাকরি করবে বিদেশে, মন্দ লোকের পাল্লায় পড়তে পারে, ভদ্রঘরের মেয়ে—সে কি কথা। মায়ের প্রাণ বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হলো না। আমি অভয় দিয়ে ব'লে এলুম যে, সুধীর ব'লে আমার এক ভাই আছে, আমি তার সঙ্গে কমলের সম্বন্ধ করছি। মা বললেন, তুমি যা বলবে মা তাই মানবো, আমার হারাধন ফিরিয়ে এনেছ তুমি!—আর

ওদিকে সুধীরের বড় বোন সুরবালা ছিল আমার সহপাঠি। তাকে ব'লে এলুম, ভাই, সুধীরের জন্য আমি যে-মেয়ে ঠিক করেছি, সচ্চরিত্র আর সৎশিক্ষার দিক থেকে তোর আমার চেয়ে সে অনেক ভালো। অমত করিসনে, মা-বাবাকে রাজী করাস। সুরবালা হোলো রাজী।

কঙ্কর বললে, মীনাক্ষী, তুমি লেখাপড়া না শিখলে ঘটকিগিরি ক'রেও খেতে পারতে। বলো কি, দেখছি পাপ ঢাকতে মেয়েদের জুড়ি নেই!

ধর্মতলার মোড় ঘুরে গাড়ী চৌরঙ্গী দিয়ে ছুটলো। মীনাক্ষী তার গলা থেকে হাত নামিয়ে বললে, কোথা যাবে?

চলো ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়লের বাগানে।—কঙ্কর প্রস্তাব করলো।

মীনাক্ষী বললে, যদি কলেজের কোন ছাত্র পিছু নেয়?

যদি নেয় তবে আজকের রাতটা তার পক্ষে হবে সার্থক। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বাড়ী গিয়ে কবিতা লিখবে। আচ্ছা, তবে না হয় চলো গঙ্গার দিকে।

যদি পুলিশ পিছু নেয়?

তবে গাড়ী ছেড়ে দিই, এইখানে নামো।

সেই ভালো। এই ড্রাইভার, বাঁধো।

গাড়ী থামলে দু'জনে নেমে পড়লো। আঁচল খুলে মীনাক্ষী ভাড়া চুকিয়ে দিল। রাত কম নয়, প্রায় ন'টা বাজে। এই রাত্রে কোথাও আশ্রয় পাওয়া সম্বন্ধে তাদের কোনো দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। দু'জনে ট্রাম লাইনের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। বয়সটা দু'জনেরই খারাপ সুতরাং নির্জনে তারা আনন্দ পায়। আকাশে সেদিন শুক্লপক্ষের চন্দ্র ছিল, কলিকাতা শহরের অতি বর্বর আলোর ব্যবস্থার জন্য সন্ধ্যা থেকে জ্যোৎস্না দেখা যায়নি। মাঠের ধার দিয়ে যেতে প্রায় মাথার উপরে খণ্ড চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হোলো। পশ্চিমের গাছগুলি অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ছায়াম্লান। বয়সটা খারাপ, অতএব চলতে চলতে একসময়

মীনাক্ষী ব'লে বসলো, সংসার টোংসার আমার বাপু ভালো লাগে না। ও আমি বুঝিনে।

কঙ্কর বললে, তবে কি ছাই বোঝো?

মীনাক্ষী বললে, যদি চিরকাল তোমার সঙ্গে বেড়াতে পারতুম এমনি ক'রে! ওই, অমনি বুঝি রাগ হোলো?

কঙ্কর বললে, রাগ নয়, মনে রেখো আমাদের এই জীবনযাত্রার ফল এই যে, ফল ধরবে না কোনদিন, গাছ মরবে শুকিয়ে।

মীনাক্ষী বললে, হেঁয়ালি ছাড়ো।

কঙ্কর বললে, আমরা হচ্চি দুইখণ্ড মরুভূমি।

হাসিমুখে মীনাক্ষী বললে, আচ্ছা ধরো, আমাদের মধ্যে যদি একটু রোমান্স হয়?

রোমান্স হলেও রোমাঞ্চ হবে না। চাঁদের আলোর দিকে চাওয়াটা খেলো ভাবালুতা, ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণ হাওয়া আর মাঠের দিকে চেয়ে কবিত্বপনা উনবিংশ শতাব্দির ফুঁকো সেন্টিমেন্ট্—ওগুলো আধুনিক নয়। চিরন্তন চিত্তবৃত্তির উলটো পথ ধরাই আজকের দিনের মননশীলতার আভিজাত্য।

আর প্রেম?

ওটাও পাওয়া গেছে। ফিজিওলজিক্যাল সিক্রিশন্, গ্লাণ্ডগুলো থেকে কল্পনাশক্তির প্রভাবে একরকমের জারক রস নির্গত হয়, স্নায়ু-মণ্ডলীতে তার ক্রিয়া, মস্তিষ্কে তার সংবাদ চলাচল, মন আর বুদ্ধির সঙ্গে সেই সংবাদের একটা আপোষ নিষ্পত্তি—তারপর বাক্যে অথবা কাযে তার অভিব্যক্তি। শারীরিক তেজস্বিতা থাকলে বাক্যের অপেক্ষা কার্যেই তার প্রকাশ বেশী দেখতে পাই।

মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, এসো। বুঝলুম সব।

কোথায়? আরে, এ কোথায় চললে? মতলব কি?

বড় গির্জার সামনে ওই বাগানে, এসো আমাদের সেই চেনা পাম

গাছটার তলায়। দেখছ, ওই জায়গাটা কলকাতার মধ্যে হ'লেও কেমন একটা অদ্ভুত অচেনা বিদেশ মনে হয়—যেন একটা বহুদূর প্রবাসে জনহীন কোন ধর্মমন্দিরের ধারে এসেছি। চলো, জলের ধারে একটু বসিগে, লক্ষীটি।

কঙ্কর বললে, এরই নাম মেয়ে। অভিসারের গন্ধে তোমরা ওঠো পাগল হ'য়ে। কিন্তু মোহমুদ্গর আছে অতি নিকটে। পুলিশের ফাঁড়িটা দেখছ না কেন? এই ত্যাখো বটগাছের তলায় ওরা আলো জেলে তুলসীদাস নিয়ে বসেছে।

মীনাক্ষী বললে, কিন্তু হিসেব বুদ্ধিটা মেয়েদের খুব পাকা মনে রেখ। আমি তুমি দু'জনেই সাবালক। ধরা পড়লে ছাড়া পাব কলা দেখিয়ে।

যদি ব্যভিচারের অভিযোগ আসে?

কুমারীর সঙ্গে ব্যভিচার, সোনার পাথরবাটি। বরং এইটুকু সাবধান থাকলেই যথেষ্ট যে, 'পাবলিক ন্যুইসেন্স য়্যাক্টে' না পড়ে যাই। তারও ব্যবস্থা আছে আঁচলে বাঁধা—টাকা গো, টাকা। এসো।

কঙ্কর বললে, এদিকে থানা আর ওদিকে হাসপাতাল, জায়গাটা যে নিরাপদ তা'তে আর সন্দেহ কি। আবার উত্তর ভাগে রয়েছে খৃষ্টের উপাসনা মন্দির। সরোবরের জলে পড়েছে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব। পশ্চিমে ভিকটোরিয়ার স্মৃতিসৌধ, মাথার ওপরে পাম পাতার সরসরানি, বাসাছাড়া পাখীর অন্ধকারে মাঝে মাঝে আর্তনাদ। মীনাক্ষী তার সঙ্গে যোগ ক'রে দিল, দূর চৌরঙ্গীতে নগরের স্তিমিত কোলাহল, অস্পষ্ট মোটরের হর্ণ, দক্ষিণে পিচের রাস্তার পরে এক-একবার ফিটনের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ,—কঙ্কর হেসে বললে, এমন একটা গোপন জায়গায় অন্তত দুটি শিক্ষিত তরুণ-তরুণী কোন নোংরা কাজ করতে পারে না। কি বলো?

মীনাক্ষী বললে, অসম্ভব।

কঙ্কর বললে, এখানে তাহলে প্রেমিক-প্রেমিকারা আসে না কেন?

ওই ফাঁড়িটার ভয়ে। তাছাড়া সামনে ধর্মমন্দির,—এদিকে ইংরেজ পাড়া, মাতাল গোরার ভয়, গুণ্ডার উপদ্রব—হাজার হোক বাঙ্গালী ছেলে মেয়ে ত!

কঙ্কর বললে, এরই মধ্যে শিশির পড়েছে ঘাসের ওপর,—এসো, এই বেঞ্চিটায় ব'সে পড়ি।

মীনাক্ষী বললে, না, অস্পষ্ট হয়ে যেতে চাই। আরো এগিয়ে চলো ওই পাম গাছের নীচে, জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসবো। আজ নীলাম্বরী প'রে এসেছি, জ্যোৎস্নায় আর অন্ধকারে ডুব দেবো ব'লে।

অর্থাৎ আত্মহত্যা করতে চাও?

তার চেয়েও বড় কাজ। তোমার মতন নিরীশ্বরবাদী, নির্মম বিপ্লবীর সঙ্গে পাতাবো প্রাণের সম্পর্ক। তুমি যেমন টেনে নিতে পারো একান্ত আগ্রহে, তেমনি অদ্ভুত খেয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দিতে জানো নির্দয় অবহেলায়। বিপদকে তুমি মানো না, দায়িত্বকে তুমি জানো না—তোমার ভয়ঙ্কর আলিঙ্গনের মধ্যে সর্বনাশের আনন্দেই কেবল ধরা দেওয়া চলে।

কঙ্কর বললে, আমি যা নই তাই আমাকে বলো কেন। নিজের মনের রঙ দিয়ে দেখতে বুঝি ভাল লাগে?

মীনাক্ষী বললে, তুমি কী তা জানো না, আমি জানি তুমি এই। এও জানি তুমি শুধু রুদ্র নও, শুধু শিব নও—তুমি মেলামেশা। বসো এইখানে।

তুমি যেন একটা ভয়ানক আয়োজনে মেতে উঠলে মনে হচ্ছে? কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

মীনাক্ষী যেন একটি ললিত কবিতার ব্যঞ্জনার মতো হেসে উঠলো। যেন তার মসৃণ সুন্দর দাঁতের পাটির ভিতর থেকে জ্যোৎস্না এলো গড়িয়ে। বললে, ভয়ানক নয়, মধুর। আমি আগুন আর তুমি বারুদ—তোমাকে জলতে দেবো না, কেবল রাখবো কাছে কাছে। অকারণে জ্বলবে কেন তুমি? এত দুর্বল ত তুমি নও? সংগ্রামের ভীষণ আয়োজনে আমি তোমাকে ব্যবহার করতে চাই।

তুমি এই নতুন কালের প্রতীক, তুমি আধুনিক জীবনের সকল অসন্তোষের একটা পুঞ্জীভূত চেহারা।

আর তুমি?

আমি? আমি তোমার পাঁজরের একখানা অস্থি। চেয়ে দেখো ভাল ক'রে। আমারই চোখে তোমার জ্বলন্ত পরিচয়, আমিই তোমার ভিতরকার একটা মানবী অংশ। মানুষ একটাই, তুমি তার মস্তিষ্ক, আমি তার হৃদয়।— মীনাক্ষী বলতে লাগলো, আমাকে যদি অস্বীকার করো তবে তুমি হবে ধ্বংস, তোমাকে যদি অবহেলা করি তবে আমার সমস্ত জীবন হবে ভাগ্যবিড়ম্বিত।

কঙ্কর বললে, তাহলে এসো একটা ছক্ কেটে দু'জনের ভবিষ্যৎ তৈরী করি। জানা যাক্ দু'জনে কী চাই!

মীনাক্ষী বললে, না, এ তোমার সইবে না। তুমি যে যাদুকর, যেখানেই তোমাকে বাঁধবো সেখানেই তুমি গেরো আলগা করবে। ছক্ কেটে দরকার নেই, ছেড়ে দাও অবাধে। কেন জানবো ভবিষ্যৎকে, কেন মানবো প্রচলনকে? ভবিষ্যৎ তাদের জন্যে যারা বাঁচতে চায়। আমাদের জায়গা কোথায় এই সামান্য পৃথিবীতে? কিছু রেখে যেতে চাইনে, কিছু নিয়ে যাবার দাবি করিনে। যতক্ষণ বোঁটায় থাকবো প্রাণের গন্ধ ছড়িয়ে দেবো, যখন ঝ'রে যাবো জানবে না কেউ।

কঙ্কর হঠাৎ হেসে বললে, বিয়ে করতে মন চায় না, মীনাক্ষী?

মীনাক্ষী বললে, আমি ছাড়া বাংলার সব মেয়ে বিয়ে করুক, কারণ এমন মেয়ে দেখি না যে বিয়ে করতে চায় না। বিয়েটাই মেয়েমানুষের চরম কল্পনা, তার পরে আর অস্তিত্ব নেই তাদের। কিন্তু আমি যে তার পরপারে! বিয়ে করলেই আমাকে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে, সে আমি পারব না, কঙ্কর।

কিন্তু যদি মনের মতন বর হয়? এই ধরো—

মীনাক্ষী বললে, পায়ে যে শৃঙ্খল দিল সে হবে মনের মতন? সোনার খাঁচায়

রেখে বুলি শেখাবে? ভালোবাসার বিনিময়ে পদসেবার বাধ্য-বাধকতা? কঙ্কর, আমাকে তুমি ছলনা করো না।

কঙ্কর বললে, মীনাক্ষী, তোমার গল্প করেছিলুম বন্ধুদের কাছে। তারা বিশ্বাস করলে না।

মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, কি বলে তারা?

বললে, এমন মেয়ে বাংলায় নেই, গল্প তোমার আজগুবী, সাহিত্যিক অতিশয়োক্তি।

মীনাক্ষী বললে, মনে পড়ে আমি যখন সুব্রতকে তোমার কথা বলেছিলুম তারও মুখে দেখেছিলুম সন্দেহের চিহ্ন। মনে করেছিল মেয়েলি কল্পনার আতিশয্য। ওরা মানুষকেই চিনে রাখে, প্রাণকে জানতে চায় না।

কঙ্কর বললে, কেমন বর তুমি পছন্দ করতে পারো, বলো।

মীনাক্ষী বললে, কাছে এনে দাঁড় করালে বলতে পারি। আচ্ছা, আগে তুমিই বলো দেখি কেমন বউ চাও?

বউ?—কঙ্কর বললে, কথাটা নতুন রোমাঞ্চকর। আমি বিবাহিত, বৌ রয়েছে কাছে, রাতে শুই পাশাপাশি, আইনসঙ্গত প্রেমালাপ, কেউ নিন্দে করে না, কেউ রটায় না অপবাদ,—এমন একটা জীব যার দেহের সঙ্গে আমার দেহের একেবারেই মিল নেই, যাকে ছুঁলে অদ্ভুত স্বাদ, যাকে দেখলে অদ্ভুত চাঞ্চল্য,—এমন একটা বৌ! রোমাঞ্চকর! ভাবতে পারিনে সে আমার জন্য ভাবে সারাদিন, ভাবতে পারিনে তার কপালে আমারই রক্ত-সঙ্কেত, কল্পনা করতে পারিনে আমারই অস্তিত্বের চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে, আমারই মৃত্যুতে সে সর্ব-আভরণহীন। অদ্ভুত মীনাক্ষী, রোমাঞ্চকর!—বৌ? বৌ কে? বৌ কী?

তোমার বউ গো।—মীনাক্ষী তার দিকে মুখ তুলে ধরলো।

ভাবতে পারিনে তাকে। কঙ্কর বললে, আছে এমন মেয়ে পৃথিবীতে? আছে এমন মেয়ে স্বর্গে, কিংবা পাতালে? প্রেম ভাবতে পারি, তোমাকে ভাবতে পারি,

দেবী অথবা দানবীকেও ভাবতে পারি, বৌ ভাবতে পারিনে। তুমি ভাবতে পারো তোমার বর ?

পারি গো পারি।—মীনাক্ষী বললে, পান-দোক্তা খাওয়া, টেরি-কাটা, তাস-খেলা, আদ্দির পাঞ্জাবী পরা,—সোনার আংটি, হাত ঘড়ি, মুক্তোর বোতাম, নাদুস-নুদুস, হাসি-হাসি-ভাব, তরুণ, ধনাঢ্য, স্ত্রীগর্বী, অতি বাধ্য, প্রমোদপ্রিয়, পরস্ত্রীকে মা-বলা, সন্ধ্যারাতে ঘরে-ঢোকা,—যাকে বলে মসৃণ, চিক্কণ, নিপুণ, মোহন একটি বর।

কঙ্কর হেসে বললে, কিন্তু এমন ছেলে ত' তোমার পছন্দ নয়, মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী বললে, পছন্দ না হ'লেও চলবে, বর হলেই খুশী। বর হবে নিরাপদ, কর্মঠ, কায়েমী,—একেবারে নির্ভুল। হারাবার আশঙ্কা নেই, পালাবার উদ্বেগ নেই, মানাবার ঝঞ্ঝাট নেই,—যাকে বলে প্রত্যক্ষ, সত্য, জাগ্রত, অতি পরিচিত।

কিন্তু সে যদি ভালো না বাসে ?

ক্ষতি নেই, যার ধরা ছোঁয়া পাবো না তার জন্য হাতড়ে লাভ নেই। বাড়ী থাকবে, গাড়ী থাকবে, টাকা থাকবে, গয়না থাকবে,—আর কি চাই ? ভালোবাসা ? তার চেয়ে দরকার হচ্ছে রাঁধুনী বামুন, সেবা-পরায়ণ ঝি-চাকর, পাড়ার লোকের ঈর্ষা, আত্মীয় স্বজনের চক্ষুপীড়া। ভালোবাসা না পাই নরম গরম বিছানা পাবো, গোটা কয়েক সন্তান পাবো, সংসারের কর্তৃত্ব পাবো, চোখ ঝলসানো শাড়ী পাবো, লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা পাবো। এত পাবার পরেও যদি ভালোবাসা না পাই ক্ষতি নেই, বরের পদসেবার বকশিস পেলেই আনন্দে থাকবো।

কঙ্কর বললে, এবার তবে নির্ভয়ে বলতে পারি কেমন বৌ আমি চাই ?

মীনাক্ষী বললে, বলো। ওই গির্জাটার দিকে চেয়ে বলো সত্যি কথা, বলো আমার গায়ে হাত রেখে—

তাই বলবো।—কঙ্কর বলতে লাগলো, অজানিতা আসবে অচেনা নদীতে তরণী বেয়ে—যার চোখের ভীরুতায় কারুণ্য, যার চরণের ছন্দে পাবো আমার হৃৎপিণ্ডের শব্দ, যার বুকের গন্ধে মনে পড়বে করুণ শিউলীকে। সেই মেয়ে আমার বউ। প্রণয়ে অনভিজ্ঞ, কথায় নির্বোধ, ভাষায় সরল, স্বভাবে পরমুখাপেক্ষী, নিভৃত গ্রামের গন্ধ যার আঁচলে, যার চুলে বনস্পতির ছায়া, যার সলজ্জ আলিঙ্গনে রোমাঞ্চময় মৃত্তিকা কথা ক'য়ে ওঠে। ঝড় বলো, বিদ্রোহ বলো, উত্তাপ আর উত্তেজনা বলো, আধুনিক কালের মত্ততা বলো—কিছু সে জানে না। সেই আমার বউ,—প্রসন্ন, প্রশান্ত, সুশীতল, নির্মল, অর্বাচীন।

মীনাক্ষী বললে, এমন বউ কেন চাও?

জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে কঙ্কর বললে, আমার উল্টোটা আমি চাই। মীনাক্ষী, মনে রেখো বিপ্লবীর সঙ্গে বিদ্রোহিনীর মিলন বড় ভয়ঙ্কর। দুই অশান্ত এক হলে আর যাই থাক্ শান্তি নেই। ঘরেও বিপ্লব বাইরেও ঝড়—আশ্রয় কোথায়? বন্যার তরঙ্গদলকে আলিঙ্গন ক'রে আমি দুরন্ত আনন্দে চিরদিন ভেসে বেড়াতে পারি, তার অপরূপ মহিমার সর্বগ্রাসী চেহারায় আমি মুগ্ধ হ'তে পারি, কিন্তু সে যদি আমার শোবার ঘরে ঢোকে তবেই বিপদ মানি। ভয়ঙ্করী কালী যখন রণরঙ্গিনী মূর্তিতে সংহার ক'রে চলেছিলেন, তখন মহাদেব তাঁর সঙ্গে যোগ দেননি ববং দেবাদিদেব এসে লুটিয়ে পড়লেন সর্বনাশিনীর পায়ের তলায়,—প্রশান্ত প্রসন্ন চিত্তে। এতেই রইলো সৃষ্টি, এতেই রইলো ছন্দ। এই কারণে আজ রব উঠেছে হিংসার প্রতিরোধ করতে হবে অহিংসায়, বিপ্লববাদের প্রতিরোধ বিশ্বপ্রীতিতে। একবার কল্পনা করো, স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনেই ব্যভিচারী—সেই সংসারের অবস্থা কেমন?

মীনাক্ষী বললে, উল্টোটা ভাবো। স্বামীটা অতিশয় ভালো, স্ত্রীটি অতিশয় চরিত্রবতী,—সেই সংসারের অবস্থাটা?

কঙ্কর বললে, দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ আছে?

একটুও না।

ভালবাসে পরস্পরকে ?

ওঃ একেবারে গলাগলি! অভিন্নহৃদয়! 'মিলনে নিখিলহারা, বিরহে নিখিলময়!'

কঙ্কর হেসে বললে, জানিনে তারা কোন্ দেশে থাকে। যেখানেই থাকুক, তাদের উদ্দেশে নমস্কার জানাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখো মীনাক্ষী, যে প্রেমে সংশয়, ভয়, উদ্বেগ, লুকোচুরি, সংঘাত, বিবাদ, আলো ছায়া,—এ সব নেই সেই প্রেম বড় নিরামিষ, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারি, পায়ের ধূলোও নিতে পারি কিন্তু তাকে নিয়ে আনন্দ পেতে পারিনে মীনাক্ষী, এই কারণেই কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রীর প্রেম নিয়ে বড আর্টের সৃষ্টি হয়নি, অনড সাত্বিক প্রেমে রঙের বৈচিত্র্য বড কম, তার একটাই মাত্র রঙ—সেই রঙ গেরুয়া, সে কেবল মাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য।

মীনাক্ষী বললে, কিন্তু রামচন্দ্র ও সীতার কাহিনী ? পৃথিবীর রস-সাহিত্যে রামায়ণ সর্বোত্তম প্রেমের কাহিনী, একথা তুমি মানো ?

কঙ্কব বললে, মানি।

কিন্তু সেও ত' স্বামী-স্ত্রী! দাম্পত্য প্রেমের মহত্তম আদর্শ!

মানলুম।

সতীত্ব আর আদর্শ পত্নীত্বের জয়গাথা।

নিঃসন্দেহ।

তবে ?

কঙ্কর বললে, চোখ থাকলে দেখতে পাবে, রামায়ণের গল্পটা সরস হয়েছে তিনটি মানুষের হাতে, কৈকেয়ী, রাবণ আর দুর্মুখ। গল্পটা হয়ে যেত ফিকে যদি বাল্মীকির হাতে এই তিনটি মানুষের সৃষ্টি না হোতো; এরাই রামায়ণকে মধুর ক'রে তুলেছে। রাম ও সীতার প্রেমটাই রামায়ণে একমাত্র নয়,—তাঁদের প্রেমের ভিতরে যে সংশয়ের দোলা, যে বিপর্যয়ের তরঙ্গ, যে ঔৎসুক্যের

উদ্বেগ,—তাতেই পাঠকের মন আপ্লুত। জীবন বৈচিত্র্যের একটা বিপুল সমারোহ, পৌরাণিক কালের বিশাল পটভূমি, প্রেমের চেয়েও বড় যেটা, প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ,—রামায়ণের সেইটেই মহৎ পরিচয়। এখানে বড় আর্টের সৃষ্টি হয়েছে দাম্পত্য সম্পর্ক দিয়ে নয়—বাল্মীকির সৃষ্টি অত ছোট নয়,—এখানে সৃষ্টি হয়েছে একটা মহৎ প্রেমের ব্যঞ্জনা। সেইজন্য রামচন্দ্র ও সীতার ঘরকন্নার পরিচয় আর প্রত্যক্ষ নিশ্চিন্ত প্রেমালাপ রামায়ণে কোথাও ঠাঁই পায় নি—কিন্তু ঝড়ে ঝাপটায়, দুঃখে দুর্গমে, আলোকে ছায়ায় নরনারীর প্রাণের সম্পর্ক যেখানে বিপন্ন, ব্যথিত, ক্ষুব্ধ—তারই ইতিহাস ফুটেছে ওই মহাকাব্যের ছত্রে ছত্রে।

মীনাক্ষী বললে, তবু ত স্বামী-স্ত্রী!

কঙ্কর বললে, না, মানব আর মানবী।

মীনাক্ষী বললে, তবুও কাহিনীটা স্বামী আর স্ত্রীর।

কঙ্কর বললে, না, কাহিনীটা মিলন আর বিরহের।

সরোবরের নীচে প্রতিফলিত চন্দ্রের দিকে চেয়ে মীনাক্ষী অনেকক্ষণ ব'সে রইল,—আলগা হয়ে বসার দরুণ তার মাথার খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে কঙ্করের হাতের উপর। চুলগুলি রুক্ষ, তবু তার ভিতরে কেমন একটা ঘন গন্ধ রয়ে গেছে—সে গন্ধটা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরই এলোচুলের রাশির মধ্যে পাওয়া যায়।

মীনাক্ষী বললে, তোমার হাতখানা সরাও।

কেন?

কেউ এসে পড়তে পারে।

এলেই বা।

দেখতে পেলে গালাগালি দিতে পারে।

কেন?

বলবে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত তরুণ এক চঞ্চলা তরুণীকে অপমান করছে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত কেন?

মীনাক্ষী বললে, বড় নিশ্চল তোমার হাতখানা, বড় সংযত, এমন হাত নিভৃতচারিণী মেয়ের পক্ষে আনন্দদায়ক নয়। সরাও।

কঙ্কর বললে, বুঝলুম, কিন্তু অপমান করলুম কোথায়?

আনন্দ থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করাই অপমান করা। অম্বাকে অপমান করেছিলেন দেবব্রত, মনে নেই? অম্বা গিয়েছিলেন প্রণয় নিবেদন করতে গোপনে, দেবব্রত করেছিলেন প্রত্যাখ্যান ব্রহ্মচর্য-পালনের যুক্তিতে।

কঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে, অনেকদিন দু'জনে একা-একা থেকেছি, আজ তোমার এ দুর্মতি কেন? কেন আজ তোমার রক্তে নেশা জাগে, মীনাক্ষী?

মীনাক্ষী বললে, ক্ষমা করো। প্রাণের তটে ভাঙন ধরে তোমার কাছে থাকলে, কেমন একটা সর্বনাশের ইশারা পাই তোমার গায়ের গন্ধে,—মনে হয় অস্থির দুরন্তপনায় একবার মত্ত হয়ে উঠি।

কেন?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

তুমি পুরুষ বলে নয়, তুমি কঙ্কর তাই জন্যে। আমার বয়সের মেয়ে একজন সুদর্শন ছেলে পেলেই খুশী থাকতো, হাজার হাজার ছেলেকে যেতে দেখেছি চোখের সামনে দিয়ে, কিন্তু তোমাকে না দেখলে বাঁচতে পারতুম না। তোমাকে না দেখে এতকাল বেঁচে ছিলুম কেমন ক'রে তাই ভাবি।

কেন?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

মীনাক্ষী বললে, আমার অহংকারের সীমা নেই, অতি উদ্ধত, দুর্বিনীত, স্পর্ধিত মেয়ে আমি—কোথাও কখনো মাথা হেঁট করিনি। তুমি এলে ছোট হয়ে গেলুম, অতি সামান্য হয়ে গেলুম। তুমি এনেছ পায়ের কাছে নামিয়ে।

কঙ্কর বললে, তাহলে আমি চলে যাই?

মীনাক্ষী বললে, গেলেই হয়ত ভাল হোতো, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়িয়ে

পৃথিবীকে শাসন করতে পারতুম, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কঠোরভাবে উপলব্ধি করতে পারতুম, কিন্তু তুমি করেছ সর্বনাশ!

বাঁচলুম এতদিনে তোমার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে।

না গো না, বাঁচতে দেবো না।—মীনাক্ষী চুপি চুপি বললে, তোমার কাছে ছোট হয়ে যেতেই যে ভালোবাসি, সর্বনেশে তুমি আমার সমস্ত অহংকার নষ্ট ক'রে দিয়েছ তাই ত' তুমি এত প্রিয়। আমার বুকের ওপর পা দিয়ে দাঁড়াবে সেইটিই ত' আমার আনন্দ।

কঙ্কর বললে, মীনাক্ষী, তোমার মুখ দিয়ে সেই অতি প্রাচীন মেয়ে কথা কইছে ভুলে যেয়ো না।

মীনাক্ষী বললে, ভয় নেই, তোমাকে পেতে কষ্ট হয়নি, হারাতেও বুকে বাজবে না! ওরে পাষণ্ড, মনে করছ সেই অতি প্রাচীন মেয়ের মতন কাজ গুছিয়ে নেবো তোমাকে দিয়ে? কখনোই নয়। আমি মরতে জানি তোমার পায়ের তলায় দলিত হয়ে, কিন্তু হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে পারব না সেই প্রাচীন কালের ভিক্ষে।

তার মানে কি?

মানে, বাসা বাঁধবো না তোমাকে নিয়ে। যেতে চাও চলে যাও। বিদায় দেবো হাসিমুখে, অভ্যর্থনা করব অশ্রুজলে। মনে করেছ বঞ্চনার দুঃখে কাঁদবো, মনে করেছ ব্যর্থ হবার ভয়ে তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বো?—মীনাক্ষীর চোখ দুটো জ্বল জ্বল ক'রে উঠলো, বললে, ছোট যদি হয়ে যাই তোমার ব্যক্তিত্বের কাছে তবে গৌরব বোধ করব, কিন্তু ছোট করতে পারব না নিজেকে প্রকৃতির দোষে। আমি বিপ্লববাদিনী—কাজে, কথায়, চিন্তায়, সর্ব বিষয়ে। ঘর আমি চাইবো না, সন্তান আমি কামনা করব না, সুখ আমি অবহেলায় ত্যাগ করব, শৃঙ্খলার মধ্যে আমি বন্দিনী সাজবো না—বিপ্লববাদিনী আমি।

কঙ্কর বললে, তবে আজ তোমার ভাবান্তর হয়েছিল কেন?

সহসা মীনাক্ষী হেসে ফেললো,—চতুর, শুনে নিতে চাও কৌশলে? বেশ, স্বীকার করব সহজেই। আমার এই নীলাম্বরীর আবরণ খুলে দাও, দেখে নাও সেই অতি প্রাচীন শ্রীরাধাকে। স্বার্থের কথাটাই ভাবলে, আনন্দের কথাটা মনে এলো না? অভাব কি কিছু ছিল আমার, তবু কেন এলুম কুল ভেঙে? কে বাজালো বাঁশী? কে ডাকলো অভিসারে? কেন মা-বাপকে মানিনি, কেন কলঙ্কে ডরাইনি, কেন আলুথালু হয়ে এলুম ছুটে? নিষ্ঠুর, তুমি কেবল দেখলে আমার ভাবান্তর? রতিরঙ্গের উন্মাদনাকেই আধুনিক কাল বড় ক'রে দেখবে আর মেয়েমানুষের মনে যে দুর্গম অন্ধকারের দিকে অভিসার-তৃষ্ণা রয়েছে তার দিকে কি চোখ ফেরাবে না?

কিন্তু বিজ্ঞানে বলে—

জানি। মীনাক্ষী বললে, তবু শুনে রাখো পৌরুষে আর বলিষ্ঠতায় আয়ান ঘোষ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা কম ছিল না, চেহারাও ছিল অতি সুদর্শন, মেয়েদের খুশী করার মতন প্রচুর স্বাস্থ্য তারও ছিল, রতিরঙ্গের অধ্যবসায়ে সেও ছিল অক্লান্ত,—কিন্তু শ্রীরাধা ত' কেবল রতিরঙ্গিনী নন্, তাঁর কানে গিয়ে বাঁশীর সুর পৌঁছত, সেই ভীমপলাশী আর বেহাগের আহ্বান যে তাঁর প্রাণের সাগরে আনতো তরঙ্গ দোলা, রক্তকমল টলমল ক'রে উঠতো সেই দোলায়। কাঁকর, যৌন বিজ্ঞানের যুক্তিকেই তুমি দেখলে, আর দেখলে না সেই 'ঘন আঁধিয়ার ভুজগ-ভয় কত শত, পন্থ বিপথ নাহি মান'?—দেখলে না সেই 'গুরুদুরুজন ভয় কিছু নাহি মানয়, চীর নাহি সম্বরু দেহে'?—আজ যদি আমার ভাবান্তর ঘ'টে থাকে তবে তাকে তুমি কেবল প্রকৃতির তাড়না আর বায়োলজির দোহাই দিয়ে অসম্মান করবে, অভিসারের ব্যাকুল বেদনার ভয়-দুরুদুরু আনন্দের দিকে তোমার দৃষ্টি পৌঁছবে না?

সহসা হাসিমুখে কঙ্কর বললে, ওকি, জল এলো তোমার চোখে, মীনাক্ষী? ছি ছি, তুমি না বিপ্লববাদিনী?

মীনাক্ষী মুখ নত করলো তার পায়ের উপর। কিছুক্ষণ পরে আর্দ্রকণ্ঠে বললে, এইবার চলো, রাত হয়েছে।

রাগ করেছ, মীনু ?

মীনাক্ষী মুখ লুকিয়ে বললে, তুমি সব বুঝতে পারো, শেষ কথাটা বুঝতে পারো না।

হাসিমুখে কঙ্কর বললে, Frailty, thy name is Woman!

হাসিমুখে মাথা তুলে মীনাক্ষী জবাব দিল, Ye too Brute!

*

* *

নির্জন জ্যোৎস্না রাত, দক্ষিণের মৃদু সমীরণ, নিভৃত জলাশয়ের তীর—এই সব ছেড়ে যখন তা'রা লোকবহুল পথে এসে দাঁড়ালো তখন তাদের নেশা কেটে গেছে। পথ আলোয় আলো, আকাশের তারা আর জ্যোৎস্না সেই উগ্র আলোয় অবলুপ্ত। ওরা যেন নেমে এসে দাঁড়ালো রসকল্পনার স্বপ্নলোক থেকে।

মীনাক্ষী তার মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। বললে, ছেলেমানুষী করলে সময়টা কাটে মন্দ নয়।

কঙ্কর কেবলমাত্র হেসে তার কথার জবাব দিল।

রাত অনেক হয়েছে,—চলো ফিরে যাই।—মীনাক্ষী বললে।

কঙ্কর বললে, আবার তোমার সেই ফেরবার তাড়া। একটা রাত সম্পূর্ণ নিজেকে ছেড়ে দিতে পারো না তুমি ?

কটু কথা শোনবার জন্য তুমি লালায়িত, কেমন ? পারতুম যদি না থাকতো এই নীলাম্বরী জড়ানো আগুনের পুতুলটা। তোমার জন্যেই এই সজ্জা নিয়ে বেরিয়েছিলুম, তোমারই নেশার উপকরণ, কিন্তু পাথর, এই লোকারণ্যকে বিপন্ন করো না, শীঘ্র আমাকে আত্মগোপন করতে দাও।

এটা কিন্তু তোমার রূপের অহংকার।

না। মীনাক্ষী হেসে বললে, অহংকার চূর্ণ হয়েছে, কারণ এত নিভৃতে পেয়েও তুমি আমাকে স্পর্শ করোনি। কিন্তু—কিন্তু এসব আমি ঢাকা দেবো কেমনে ক'রে? এই পোড়া দেহটা যে পথচারীদের বিপদ ঘটাবে পদে পদে, তাদের মরণের ফাঁস জড়ানো যে আমার এই নীলাম্বরীর পাটে পাটে—চলো, শীঘ্র চলো।

কোথা যাবে?

বটে, বীরপুরুষ। স্ত্রীলোককে পথ ভুলিয়ে আনতে পারো আর আশ্রয় দেবার বেলা গা-ঢাকা? এই রিক্স, ইধর আও,—আও জল্‌দি—

রিক্স এসে দাঁড়াতেই মীনাক্ষী বললে, দেরী নয়, ওঠো শিগগির, সামনের পর্দা ফেলে দাও। রিক্স-র আবরুটা খুব কাজে লাগে।

তু'জনে রিক্সয় উঠলো। সম্মুখের পর্দাটা ফেলে দিয়ে কঙ্কর বললে, কোথা যাবে শুনি?

দাঁড়াও, আগে বসি ভালো ক'রে,—হয়েছে। মনে হচ্ছে তুমি একটু মোটা হয়েছ, নৈলে এত ঠাসাঠাসি কই আগে ত' হোতো না!

তোমার মধ্যদেশের পরিধিও কম নয়। প্রাণের আনন্দে আরও যেন স্ফীত।

কটাক্ষ ক'রে মীনাক্ষী বললে, পৈতৃক সম্পত্তি পেলে আরো হোতো।—হয়েছে! একবার ঠিক হয়ে বসো, হাতখানা ঘুরিয়ে দাও আমার পিঠের দিকে যেমন ক'রে মালা জড়ায়। অবস্থাটা দাঁড়ালো তুর্নীতি-ঘেঁষা, ভরসা এই যে, পর্দা ফেলা আছে।

কটাক্ষ ক'রে কঙ্কর বললে, ঠিক বলেছ! ছেলেদের তুর্নীতি রাজপথে আর মেয়েদের পর্দার আড়ালে।

চিমটি কেটো না, হেরে যাবে। ছেলেরা লেংটি প'রে পথের ধারে কাদ

ছোড়াছুড়ি করে, আর মেয়েরা অন্দরমহলে আঁচল রাঙিয়ে খেলে গোপনে হোলি খেলা।—মীনাক্ষী বললে, দুর্নীতি দুটোই, কিন্তু প্রথমটা তাড়ি, দ্বিতীয়টা রস। পুরুষের ঢলাঢলিতে আছে মাৎলামো, আর মেয়েদের ঢলাঢলিতে পাবে রসতরঙ্গ।

কঙ্কর বললে, প্রথমটায় স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য, আর দ্বিতীয়টা গোপন চৌর্য-বৃত্তি। প্রথমটায় রণস্থলে মৃত্যু, দ্বিতীয়টায় যক্ষ্মায় ক্ষয় হয়ে যাওয়া।

মীনাক্ষী যোগ করে দিল, প্রথমটায় অকৃত্রিম পৌরুষের বীভৎস চীৎকার, আর দ্বিতীয়টায় মধুর কবিতার অপরূপ লাবণ্য।

রিক্সওয়ালা বললে, কিধর্ জায়গা ?

এক্‌দম সিধা—

মীনাক্ষী বললে, কোথা যাব বল দেখি ?

যেদিকে খুশি তোমার।

যদি যাই নরকে ?

স্বর্গ তৈরী করিব সেখানে গিয়ে।

যদি জঙ্গলে যাই ?

সেখানে তপোবন সৃষ্টি করব।

মীনাক্ষী বললে, আমার হাতে ছেড়ে দেবে নিজেকে ?

কঙ্কর চোখ বুজে বললে, দিয়েছি অনেক আগে।

আমাকে ভাল লাগে তোমার ?

'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।'

মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, বলো তুমি কোথায় যেতে চাও ?

কঙ্কর ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বললে, বলেছি ত' তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাও।

বাড়ী যেতে চাও না কেন ?

বাড়ীটা বড় ছোট, আমাকে ধরে না।

মীনাক্ষী বললে, এ তোমার সত্যি কথা নয় কাঁকর, আমাকে পথে রেখে তুমি ঘরে যেতে চাও না। তোমার জ্ঞাতার্থে নিবেদন এই, আমি অবলা নই, ঘর আমার ঘরে ঘরে। অদ্ভুত এই দেশ, অন্ন আর আশ্রয়ের এদেশে অভাব নেই, এখানে মানুষ না খেয়ে মরতে পারে না।

তবে মরে কেন না খেয়ে?

যারা মরে তারা বাঁচতে শেখেনি। মানুষ এদেশে মানুষের চক্রান্তে না খেয়ে মরে, এদেশে দুর্ভিক্ষ আসে শোষণনীতির ষড়যন্ত্রে। তুমি একথা ভাবো কেন তোমার হাতে আমার অন্ন আর আশ্রয়, তোমার হাতে আমার বাঁচার অবলম্বন?

কঙ্কর তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললে, তুমি বাঁচতে জানলে আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে, বাঁচতে তুমি শেখোনি।

মীনাক্ষী বললে, বেশ ত', মরতেই যেন পারি সমারোহের মধ্যে। মৃত্যু আমার চোখে বড় লোভনীয়।

মৃত্যু?

ভয়ানক একটা মৃত্যু। তার পটভূমি হবে বিশাল এই ভারতবর্ষ। রুদ্রের দণ্ড যেন পড়ে আমার মাথার ওপর, যেন বিপুল জনতা স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার মৃত্যুর দিকে চেয়ে থাকে। সেই মৃত্যু আমি কামনা করি কাঁকর।

কাঁকর বললে, কেমন ক'রে সেটা সম্ভব হবে?

জানিনে।—মীনাক্ষী বললে, জানিনে সেই অনাগত ভীষণকে। এই কেবল জানি, গৌরবের সঙ্গে আমি যেন নিজেকে তুলে দিতে পারি সেই প্রবলের হাতে। আগে মনে করতুম সেই মৃত্যুই বোধ হয় ভাল, যে-মৃত্যু কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না; জনসমারোহ থেকে দূরে খ্যাতিহীন পরিচয়হীন সর্বআভরণহীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই বুঝি কবিত্বময় মৃত্যু,—

কিন্তু সেই কল্পনা সম্প্রতি ত্যাগ করেছি। মৃত্যুর চেয়েও যা বড়, মহামরণ,—সেই মৃত্যু আমি চাই।

সেটা কেমনতরো?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

গলার আওয়াজে তোমার বিদ্রূপ।—মীনাক্ষী বললে, কিন্তু জেনে রেখ আমি মরতে চাই সংগ্রাম করতে করতে। তরবারির খোঁচায় আমার কপাল বেয়ে ঝরবে রক্ত, চক্ষু বেয়ে ঝরবে আগুন, সর্বাঙ্গ বেয়ে বেয়ে ঝরবে পরিশ্রমের বিন্দু। আমার কণ্ঠে ফুটবে ঈশ্বরের সংবাদ ঘোষণা, আমার এই যৌবনভরা দেহে জ্বলে উঠবে দেবত্বের আলো, আমার সমস্ত জীবন উজ্জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতন ছুটে যাবে মহাজনতার ব্যূহ ভেদ ক'রে। বিদ্রূপ করতে পারো তুমি, কাঁকর—তুমি আমার অন্তরঙ্গ, তাই রতি-রঙ্গিনীকেই জেনেছ, রণরঙ্গিনীর দিকে মুখ ফেরাওনি। রণস্থলে আমার মৃত্যু হবে—এ আমার স্বপ্ন নয়, দিব্য দৃষ্টি।

ঘুমজড়ানো গলায় কঙ্কর বললে, যেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দাঁড়িয়ে একটা স্বদেশী বক্তৃতার অনুবাদ শুনছি!—মহাত্মা গান্ধী কি জয়! বন্দে মাতরম্! ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ! জয় রাণী অফ ঝাঁন্সী! জয় হিন্দ্!

মীনাক্ষী বললে, দাঁড় করিয়ে দাও আমাকে সেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। আমি কাঁদবো না দুর্বলের জন্যে, প্রতিবাদ করব না উৎপীড়নের বিপক্ষে, ভিক্ষার আঁচল পাতবো না ক্ষুধার্ত মেষশাবকদের জন্যে,—আমি ডাক দেবো যেদিকে ভয়হীন মৃত্যুর মহিমা, যেদিকে বিপ্লবের রক্তশিখা আকাশকে রঙীন ক'রে তুলেছে। ভীরু যারা, বেকার যারা, দুর্বল যারা, যারা গৃহগত প্রাণ, যারা বঞ্চিত আর উৎপীড়িত—আমি তাদের কঙ্কাল খুলে নিয়ে বানাবো আমার শানিত অস্ত্র,—সেই অস্ত্র নিয়ে ছুটে যাবো যেদিকে দেশের প্রাণ বিপুল অসন্তোষে জর্জরিত। ক্ষুধার্তের মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নেবো, আশ্রিতের ঘরে জ্বালিয়ে দেবো আগুন, দুর্বলের শেষ অবলম্বন দেবো ঘুচিয়ে—যাতে তারা ভুলতে পারে মৃত্যুভয়, ভুলতে পারে কুৎসিত জীবনযাত্রার সঙ্কীর্ণতা, ঘুচিয়ে দিতে পারে জড়তার গ্লানি—

থামো, মীনাক্ষী।—কঙ্কর বললে, রিক্সর ভিতরে ব'সে সিডিশন্ করো না, তার চেয়ে আরামে ঘুমোতে দাও তোমার কাঁধে মাথা রেখে। একি, কাঁপছ কেন তুমি?

মীনাক্ষী বললে, ক্ষমা করো, হঠাৎ একটা আবেগ এসেছিল।

ভয় নেই, এখুনি জুড়িয়ে যাবে, স্থির হও।

গলা বাড়িয়ে মীনাক্ষী বললে, বাঁয়ে চলো, এই রিক্সওলা।

কঙ্কর বললে, বেশ লাগছে, পথ যেন না ফুরোয়। ওকে পাঁচটা টাকা দিয়ো, সমস্ত রাত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াক্।

বেচারি, ওর বুঝি পরিশ্রম হয় না?

দাম পাবে ত!

পরিশ্রমের তুলনায় কতটুকু?

কঙ্কর রাগ ক'রে বললে, এইবার বুঝি কুলি-মজুরের জন্য তুমি কান্না নেবে? মীনাক্ষী বললে, ওদের মানুষ ব'লে তুমি মান্তে চাও না? পাঁচটা টাকা দিয়ে ওকে খুন করবে তুমি?

তোমার সমবেদনা ওর পেশাকে নষ্ট ক'রে দেবে। তোমার দয়ায় ওর হবে ক্ষতি। ওর ন্যায্য পারিশ্রমিকটাই তোমার দেবার কথা, ওর মেহন্নতের জন্য তোমার কাঁদবার কথা নয়। মীনাক্ষী, রিক্সওলার প্রতি মৌখিক সহানুভূতি ছোটগল্পে মানানসই হ'তে পারে, চেয়ার টেবিলে ব'সে কুলি মজুরের জন্যে কাঁদলে উপস্থিত মতো হাততালিও জুটতে পারে, খেলো সাম্যবাদ প্রচার করলে নব্য সমাজতন্ত্রীরা চাই কি গলায় একগাছা মালাও দিতে পারে, কিন্তু তা'তে রিক্সওলার মুখে অন্ন ওঠে না। জীবনে যারা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, বক্তৃতা দিয়ে দরিদ্রের চিত্ত জয় করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। পাঁচ টাকা যদি কম মনে হয় দশ টাকা দিয়ো, কিন্তু আহা-বেচারি ব'লে ওর গাড়ী ছেড়ে দিয়ো না, ওকে চলতে দাও ওর সাধ্যমতো। তোমার বাজে ভাবালুতায় ওর পরিশ্রম

হয়ত বাঁচবে, কিন্তু দশটা টাকা পেলে ওর যে উপকার হোতো সেটা থেকে ও বঞ্চিত হবে।

মীনাক্ষী বললে, বেশ ত' দশটা টাকা ওকে দিয়ে চলো আমরা নেমে যাই?

কঙ্কর বললে, অপমান ক'রো না ওর দারিদ্র্যকে। লোকটা সসম্মানে খেটে খেটে নেমেছে, তোমার দয়া পাবার জন্য নামেনি। বেশি দিয়ো না, কমও দিয়ো না, যোগ্য মূল্য দিলেই ও তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে। বেশি দিয়ে ওর অর্থপিপাসাকে যদি উত্তেজিত করো তবে ও লোকটা সকলের কাছেই দাবি জানাবে এবং না-পাওয়ার ফলে ওর জীবনে দেখা দেবে অসন্তোষ, নষ্ট হবে ওর পেশা, ভীষণ সমস্যা দেখা দেবে জীবনে। তোমার সামান্য দয়া ওকে অতল তলে তলিয়ে দেবে। যোগ্য মূল্য দেওয়া আর পাওয়াই বোধ হয় সকলের বড় সামঞ্জস্য। এটা ঠিক থাকলেই হোলো।

মীনাক্ষী সবটা শুনলো। শুনে হেসে বললে, বিচারটা তোমার নির্ভুল কিন্তু নিষ্ঠুর। তোমার নিজের কথাটাই বললে স্পষ্ট ক'রে, কিন্তু আমার দিকে ফিরে চাইলে না। যোগ্য মূল্য আমাকেই কি তুমি দিলে এই বিতর্কে?

কঙ্কর বললে, কি রকম?

তুমি চেয়ে দেখলে না সমবেদনা যে প্রকাশ করলে সে মেয়েমানুষ—যে মেয়েমানুষের গর্ভে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ম। কাঁকর, তুমি যদি কাঁদতে পারো মানুষের উৎপীড়নে, আমিও ত' কাঁদতে পারি সন্তানদের বেদনায়! বেদনার আবেদনটা তোমাদের মস্তিষ্কে লাগে তাই তোমরা উত্তেজিত হয়ে ছুটে যাও প্রতিবিধানের তাড়নায়, কিন্তু আমাদের লাগে মর্মে মর্মে, নাড়িতে নাড়িতে, তাই আমরা নীরবে চোখের জল ফেলি। বলবে হৃদয়সর্বস্ব অবলা, বলবে সুকোমল মায়ের জাতি? বলো,—কিন্তু এই সুকোমল লাবণ্যতাকে নিংড়ে নিষ্ঠুর বর্বর পুরুষের বলবান দেহের জন্ম হয়!

কঙ্কর হেসে বললে, আসল কথাটা সুবিধামতো ভুলে যাও কেন?

উত্তেজিত হয়ে মীনাক্ষী জবাব দিল, ওটা সামান্য, বিন্দুমাত্র। কিন্তু রক্তে, মাংসে, মজ্জায়, অস্থিতে কে এনে দেয় পরিপূর্ণ দেহ ? কে আনে প্রাণ ? কে আনে বুদ্ধি আর মন ? অত্যাশ্চর্য রেখায় রেখায় জীবনের প্রতিষ্ঠা কে করে ? সামান্য বস্তুপিণ্ডে অসামান্য প্রাণ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে কা'র শক্তিমন্ত্রে ?—এই রিকৃস, রাখো—রাখো—

এ কি, কোথায় এলে ?

নামো, এখানে আর নয়।—এই ব'লে মীনাক্ষী নেমে পড়লো।

একটা অলৌকিক জগৎ থেকে কঙ্কর ছিটকে এসে পড়লো, গাড়ী থেকে নেমে সবিস্ময়ে বললে, আরে, এ যে আমারই বাড়ী! পথ চিনতে পারিনি এতক্ষণ—

চুপ।—মীনাক্ষী বললে, বুঝতে পারোনি সন্ধ্যে থেকে যে, তোমারই বাড়ীতে আমি চার পাঁচ দিন রয়েছি ?

এই বাড়ীতে ? আমার অগোচরে ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পথবাসিনীর আবার আশ্রয় কোথায় ? সুধীর আর কমলের ঘর ভেঙে দিয়ে তোমার ঘরে এসে উঠেছি। এখন রাত বারোটা বাজে, রাত বারোটায় বিপ্লববাদিনীও হয়ে ওঠে অবলা।

বিস্ফারিত চক্ষে কঙ্কর বললে, ভাড়াটে আছে যে বাড়ীতে, কি ব'লে উঠবো দুজনে ? আমার ঘর একটা আছে বটে কিন্তু—

মীনাক্ষী বললে, সেই ঘরেই ত' আমি আছি কদিন!

তুমি ছিলে সেই ঘরে ?

মীনাক্ষী এগিয়ে গিয়ে আঁচল খুলে রিক্‌সওলাকে কি যেন দিল, বললে, আর দাঁড়িয়ো না, পালাও, নৈলে বাবু কেড়ে নেবে।

লোকটা সবিস্ময় আনন্দে কৃতার্থ হয়ে গাড়ী নিয়ে চ'লে গেল।

কাছাকাছি আলো কোথাও নেই, চারিদিক প্রায় নিশুতি। কেবল লোহার

গেটের ভিতর থেকে হাস্নুহানার ঝাড়ের একটা ঝুম্‌কো পথের দিকে বেরিয়ে এসে যেন তাদের দুজনকে মধুর গন্ধে অভ্যর্থনা জানালো। কঙ্কর গলা বাড়িয়ে ডাকলো, মালী? এই মালী—

মীনাক্ষী বললে, মেজবৌদিকে ডাকব?

সে আবার কে?

তোমার ভাড়াটে গিন্নি—

মালী ছুটতে ছুটতে এসে গেটের তালা খুলে দিল। ভিতরের দালানে আলোটা জ্বলে উঠলো। মীনাক্ষী মাথায় অনেকটা ঘোমটা টেনে দিয়ে ভিতরে গিয়ে একটা জান্‌লার খড়খড়ি নেড়ে ডাকলো, মেজদাদা?

ঘরের ভিতর থেকে গলা পাওয়া গেল, কে?

আমি। দরজাটা খুলে দিন ত। ঠাকুরপো এসেছেন।

দালানের দরজা তখনই খুলে গেল। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বললেন, এই যে কঙ্করবাবু, ভ্রমণ শেষ হোলো? এবার অনেকদিন পরে এলেন কিন্তু।

কঙ্কর হাসিমুখে বললে, আরো কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতুম, কিন্তু বৌদির টেলিগ্রাম পেয়ে—

দেখছেন ত' মেজদাদা, সহোদর ভাই নয় কিনা তাই এত বৈরাগ্য। আমার হয়েছে জ্বালা, তিনি এক সদাশিব মানুষ, টানা-হেঁচড়া ক'রে আমাকেই কেবল শ্বশুরবাড়ীর লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। মেজবৌদিদি কোথায়, মেজদা?

মেজদাদা হেসে বললেন, এত রাত অবধি জাগা দেখলে পাছে তুমি ঠাট্টা করো সেই ভয়ে সাড়া দেননি, মট্‌কা মেরে প'ড়ে আছেন।

কঙ্কর উপরের সিঁড়িতে উঠতে লাগলো। গলা বাড়িয়ে মীনাক্ষী বললে, ঠাকুর পো, রাতটা যেমন ক'রে হোক কাটিয়ে নাও ভাই, সকালে রেঁধে

খাইয়ে বিকেলের গাড়ী ধরবো। ওরে মালী, বাবুর মশারিটা ফেলে দিগে যা।

সিঁড়ি থেকেই কঙ্কর প্রশ্ন করলো, আপনি কোন্ ঘরে শোবেন, বৌদি?

ছেলের বেমক্কা কথা শুনলেন?—আচ্ছা, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নেই, তুমি শুয়ে পড়ো গে।—এই ব'লে মীনাক্ষী ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে সস্নেহ হাসিমুখে পুনরায় বললে, বাড়ীর কর্তা হ'লে কি হবে, বড় ছেলেমানুষ। সেই কখন ট্রেন থেকে নেমেছেন, তারপর ছোট মাসিমার ওখানে, সেখান থেকে খিদিরপুর গিয়ে জিনিষপত্রের তদারক করা, তারপর শ্যামবাজারে গিয়ে দেখলুম পিসিমারও মরো মরো অবস্থা—ফিরতে তাই এত দেরি হয়ে গেল।

এমন সময় মেজবৌদি উঠে এলেন। বললেন, বেশ মেয়ে যা হোক, রান্নাবান্না ক'রে ব'সে রইলুম এগারোটা পর্যন্ত। এই একটু আগে তোমার খাবার ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। কঙ্করবাবুর খাওয়া হয়েছে?

মীনাক্ষী বললে, মাসিমার ওখানে ঠাকুরপো খেয়ে এসেছেন।

মেজবৌদি বললেন,—বেশ ছেলে যা হোক, নিজের ঘর দোর ছেড়ে বাইরে বাইরে থাকা—দুমাসের বাড়ীভাড়া জমেছে, অথচ ওঁর নেবার সময় হয় না।

এবার একটি বিয়ে দিয়ে দিন্, আপনারা ত' সবাই রয়েছেন—

এমন রাম-সীতা যা'র ঘরে, সেই লক্ষ্মণের ভাবনা কি, চোদ্দ বছর বৌদিদির পায়ের দিকে চেয়েই উনি কাটিয়ে দেবেন।

মীনাক্ষী বললে, চোখ থাকবে বৌদির পায়ের দিকে, মনটা থাকতে হবে উর্মিলার স্বপ্নে। আচ্ছা, আজকে যাই মেজবৌদিদি, আপনারা পরমানন্দে রাত জাগুন।

তোমার বয়সটা পেরিয়ে গেছি যে, ঠাকুর ঝি?

বয়সটা বড় নয়, ইচ্ছেটাই আসল।—এই ব'লে হেসে মীনাক্ষী উপরে উঠে গেল।

কঙ্করের ঘরে মশারি ফেলে আলো নিবিয়ে মালী নিচে নেমে আসছিল। মীনাক্ষী বললে, সকাল বেলা চা এনে আমাদের ঘুম ভাঙাবি, বুঝলি—?

যে আজ্ঞে।—ব'লে সে নেমে গেল।

সিঁড়ির দরজা বন্ধ করলে নিচের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকে না। মালী চ'লে যাবার পর অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করার আগে মীনাক্ষী একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বিপ্লববাদিনীর অধরে ফুটে উঠলো একটি মধুর তীব্র বিদ্রূপ। সংসার যেন তার পায়ের নিচে, পৃথিবীর উপর তলায় দাঁড়িয়ে সে সবাইকে অবহেলায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দিল। মনে মনে বললে, থাকো তোমরা ঘুমিয়ে, ততক্ষণ কাঁচা উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ রচনা করি।

এই ব'লে সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

প্রকাণ্ড বাড়ীটা তিন মহলা, চারিদিক নিস্তব্ধ নিভৃত। অব্যবহারের দরুন উপরতলার সব দিকে দীর্ঘকাল ধ'রে আবর্জনা জমে উঠেছে; লোক না থাকলে মালীদের উপরে ওঠার হুকুম নেই। আশে পাশে বহু তৈজসপত্র স্তূপীকৃত, ধূলায় ধূসর। পাখীর দল বাসা বেঁধেছে কোটরে কোটরে, তাদের খড়কুটো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পরিচ্ছন্ন রাখার মানুষ নেই, যত্ন নেবার উৎসাহ নেই।

দালানের ধারে ধারে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। প্রেতিনী একাকিনী আত্মবিস্মৃতভাবে কিয়ৎক্ষণ সেই জ্যোৎস্নার দাগ ঘেঁসে পায়চারি ক'রে বেড়ালো, রজনীর তারাগুলি কেবল তার পদচারণার দিকে চেয়ে রইল।

## নয়

অনেকক্ষণ পরে পা টিপে টিপে মীনাক্ষী কঙ্করের ঘরে ঢুকলো। কঙ্কর জেগেই ছিল, বললে, মালী নাকি রে?

না, আমি। তোমার শ্রীচরণের দাসী।

তোমার অনধিকার প্রবেশের হেতু?

পদ সেবা!

কেবলমাত্র?

দাসীকে যে কোন আজ্ঞা হয়!

কঙ্কর বললে, বাপের সম্পত্তি থাকলে দাসীর অভাব হয় না দেখছি। ব্রাহ্মণের দক্ষিণা কি?

মীনাক্ষী হেসে বললে, পুষ্পপাত্রে এনেছি হাস্নুহানার গুচ্ছ, কপালে দেবো চন্দন তিলক, উত্তরীয় এনেছি বাসন্তী রঙে রাঙিয়ে—ওঠো প্রিয়!

নিচের অভিনয়ের সঙ্গে ওপরের অভিনয়ের মিল খুঁজে পাইনে কেন? সতীদেবী গণ্ডী পার হয়ে ঢুকলেন কেন লক্ষ্মণের ঘরে?

ঘরের মধ্যে যে-ঘর সে ঘরেও তিনি ঢুকতে পারেন।—এই ব'লে মীনাক্ষী মশারিটা তুলে ফেললো।

কঙ্কর বললে, 'এবার কি তবে শেষ খেলা হবে নিশীথ অন্ধকারে?'

মীনাক্ষী হেসে জবাব দিল, 'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।'

তোমারো চক্ষুলজ্জার বালাই আছে জানতুম না ত? ওসব কি এনেছ?

মীনাক্ষী বললে, তুমি শুয়ে থাকো আমি খাইয়ে দিই।

হেসে কঙ্কর বললে, লক্ষ্মণের ফল কই?

আছে, যথাসময়ে হাতে দেবো। এখন খাও দেখি?

কঙ্কর বললে, গায়ে কি মেখে এলে? এত সুগন্ধ!

মীনাক্ষী বললে, গিয়েছিলুম ললিতার কুঞ্জে, তোমার আধুনিক বাথরুমে; এসেন্স চোঁয়ানো তোমার সাবান মেখে স্নান ক'রে এলুম। সাবানের মধ্যে পাওয়া গেল তোমাকে, তুমি মেখে রইলে আমার সর্বাঙ্গে সারা রাত।

মায়াবিনি, মতলব তোমার ভালো নয়!

মন্দও নয়।—মীনাক্ষী বললে, এক জান্‌লা দিয়ে আসছে দক্ষিণের দাক্ষিণ্য অন্য জান্‌লায় জ্যোৎস্নার মায়া, সমস্ত দীর্ঘ রাত্রের অনর্গল অবকাশ, সমস্ত পৃথিবীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে এসেছি। পশমের বিছানায় রাজকুমার সুখতন্দ্রায় আলসে বিবশ, জন্মান্তরের অপরিচিতা এসেছে হৃদয়ের পুষ্পপাত্রে ফলের ডালি নিয়ে, এসেছে কুসুমাস্তীর্ণ পথে, এনেছে সুখাদ্য আর সুপেয়। মতলবটা নেহাৎ মন্দ নয়।

কঙ্কর বললে, সুপেয়টা কিরূপ?

মীনাক্ষী বললে, অঞ্জন-আঁকা হরিণী-নয়নার হাতে সুশীতল জল হয়ে ওঠে সোমরস।

বুঝলুম। সোমরস পাওয়া গেল, গীতিকাব্যও শোনা গেল, কিন্তু নৃত্য কোথা, লীলাসঙ্গিনী?

মীনাক্ষী ঝুঁকে প'ড়ে বললে, দেখতে পাওনি অন্ধকারে, নীলাম্বরী খুলে এসেছি, পরণে আছে এখন নর্তকী-সজ্জা।

তবে আলো জ্বালো, উদ্ভাসিত করো নিজেকে।

না, আজ আলো নয়, কাঁকর। অন্ধকারে আজ রাতে অচেনা হয়ে থাকবো তাই নীলাম্বরী খুলে এসেছি। নৃত্য নয়, গীতিকাব্যে রাত কেটে যাক্।

কঙ্কর বললে, 'তিমিরে তোমার পরশ লহরী দোলে, হে রসতরঙ্গিনী!'

মীনাক্ষী তার কানে কানে বললে, আস্তে বলো। সুনীতি-সঙ্ঘের দালাল আছে কান পেতে, সমালোচক আছে চোখ খুলে।

বলো কি বলতে চাও ?

আনন্দে আছ ত' তুমি ?

কঙ্কর বললে, স্বীকার করবার আগে 'মরিব মধুর মোহে দেহের দুয়ারে।'

সর্বনাশ কোন্ পথে আমাকে টান্তে চাও ?

যে পথে চিরকার সকল নরনারী স্বেচ্ছামৃত্যুর আনন্দ পেয়েছে!—কঙ্কর বললে।

মীনাক্ষী বললে, বিপ্লবি, সেই পথে যাবার আগে একবার থম্কে দাঁড়াও। দেখো আমরা শাসন আর ভয়ের অতীত, জীবনের সকল সংস্কার থেকে মুক্ত; পিছন থেকে টানবার মানুষ নেই, সুমুখে বাধা দেবার শক্তি নেই। একবাব চেয়ে দেখো বাইরের নির্জন অন্ধকারের দিকে, সেখানে জনমানব নেই; আজকের এই নিভৃত মিলনে কোনো সন্দেহ, কৌতূহল, কলঙ্ক, অবিশ্বাস কিছুই আমাদের স্পর্শ করবে না; প্রশ্ন করবে না কেউ, জানবে না একটি জনপ্রাণী।

কঙ্কর বললে, তবে আপত্তি ওঠে কেন, মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী বললে, মনের কথা বলবো ?

না, প্রাণের কথা বলো।

তাই বলবো।—মীনাক্ষী বললে, কাঁচা উপন্যাসের পরিচ্ছেদ রচনা করতে এসেছিলুম, রাতটাকে রোমাঞ্চকর করতে পারতুম। বংলা উপন্যাস প'ড়ে দেখেছি, কোনো শিল্পী এই রতিবিলাস বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেনি—তারা কেবলই আমাদের এনে ফেলেছে একটা অন্ধ, নিগুঢ়, নির্বোধ দেহলালসার গহ্বরে, একটা অবশ্যম্ভাবি পরিণতির মধ্যে—

উত্তপ্তকণ্ঠে কঙ্কর বললে, তুমি কি আজ কোমর বেঁধে সংযম প্রকাশ ক'রে বাহাদুরি নিতে চাও ?

হাসিমুখে মীনাক্ষী বললে, রাগ ক'রো না। চেয়ে দেখ দেখি আমার দিকে,

এটা কি সংযমের চেহারা ? না, সংযম করব না, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চাই এই হৃদয়াবেগের। সাহস, সাধ্য, শক্তি, স্বাধীনতা—কিছুরই অভাব আমাদের নেই, যদি কানাকানি আর জানাজানি হয় গ্রাহ্য করব না, যদি কলঙ্ক রটে ভয় পাবো না, যদি বিপদে পড়ি অনায়াসে মুক্তি পাবো,—কিন্তু তবু আজকের আচরণে আমাদের মনুষ্যত্ব বিপন্ন হবে, কাঁকর !

কেন ?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

একখানা হাত তার কপালের উপর রেখে মীনাক্ষী বললে, চঞ্চল হয়ে উঠছ তুমি ?

কঙ্কর বললে, একটুও না, বিশ্বাস করো ? আমি কেবল ভাবছি তুমি দূরেও যাও না, কাছে আসতেও চাও না—এটা কেমন ?

মীনাক্ষী আরো কাছে স'রে গেল। কঙ্কর বললে, আরো কাছে এসো। চঞ্চলতা কি তোমার নেই ?

না।—মীনাক্ষী বললে, প্রণয় নিয়ে যেখানে উদ্বেগ, যেখানে চৌর্যবৃত্তি আর কলঙ্কের ভয়, যেখানে পদে পদে হারাবার আতঙ্ক, যেখানে দৈবাৎ মিলনের অত্যুগ্র আনন্দ—সেইখানেই চঞ্চলতা, সেইখানেই সর্বনাশা দেহের তাড়না। কিন্তু এখানে ত' সে আবর্ত নেই। তোমার খুশির ওপরে আমার বাঁচা, আমার ইচ্ছার ওপরে তোমার চলাফেরা,—এখানে আমাদের চৌর্যবৃত্তির প্রয়োজন কোথায় ? যে কাজের জন্য প্রকাশ্যে কারো তোয়াক্কা রাখিনে, সেই কাজ কেন করব গোপনে ? কেন নিজেদের ছোট করব ? যারা আমাদের বিশ্বাস ক'রে ওপরে পাঠিয়েছে, তাদের সেই শ্রদ্ধাকে কেন পদদলিত করব, কাঁকর ?

কঙ্কর বললে, ওরা টের পাবে কেমন ক'রে ?

টের পাবে না ব'লেই ত' লজ্জা করে গো। নিজেদের কাছেই যে মুখ দেখাতে পারব না।

ধন্য তোমার সংযম। এমন গীতি-কবিতায় ভরা জ্যোৎস্না রাতটা তুমি নষ্ট

করলে। তোমার সংযম দেখে কুমারী মেয়েরা হবে অধোবদন, পতিতারা হবে পেশাভ্রষ্ট, সধবারা দেবে গলায় দড়ি, আর বিধবারা—নাঃ বিধবাদের কথা বলা কঠিন।

কেন? ইন্দুমতীর কথা মনে পড়েছে বুঝি?

কঙ্কর বললে, বেচারি আমার কাছে অনেক আশা করেছিল।

মীনাক্ষী বললে, যথা?

ভালোবাসতে চেয়েছিল, সেবা করতে চেয়েছিল।

একটু ভেবে মীনাক্ষী বললে, তার চেয়েও সে বড় জিনিস চেয়েছিল, কাঁকর।

কি বলো ত?

তোমার নিরাপদ আশ্রয়!

আশ্রয়হীনের কাছে আশ্রয়? কঙ্কর বললে, ভিখারীর কাছে ভিক্ষা চাওয়া?

মীনাক্ষী বললে, তুমি ত' আশ্রয়হীন নও?

কঙ্কর চোখ বুজে চুপ ক'রে রইল। নীচের তলায় বড় ঘড়িটায় টং টং করে দুটো বাজলো। জ্যোৎস্নার দাগ ঘরের ভিতর থেকে জানলার বাইরে চ'লে গেছে। মীনাক্ষীর একখানা হাত মাঝে মাঝে তার কপাল থেকে মাথার ঘন চুলের ঝাঁকড়ার ভিতর সঞ্চারিত হচ্ছে, এবং এক একবার তার নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো প্রাণের চেতনা নেই।

কথা কইলো অনেক পরে। বললে, আশ্চর্য, এই বাড়ীটাকে তুমি আমার আশ্রয় মনে করলে, মিনু? বাড়ীটা আমার বটে কিন্তু এর সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ কোথায়? এর সঙ্গে আমার জীবনের কোনো সমস্যাই জড়ানো নয়, একে রাখবার জন্য আমার কোনো আগ্রহ নেই, একে নষ্ট করারও কোন উৎসাহ খুঁজে পাইনে। আশ্রয় আমার কোথায়? প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে কে দিলে? তুমি কি মনে করো থাকবার একখানা ঘর, দিনান্তে একমুঠো ভাত, পরণে

একখানা কাপড়—এই হলেই মানুষের দুঃখ ঘোচে ? আমাকে আশ্রয় দেবার মতন ঘর এখনো যে তৈরী হয়নি। বলো আমাকে পাগল, বলো নির্বোধ, বলো একটা প্রকাণ্ড হাম্‌বাগ—প্রতিবাদ করব না। আমার মনে যে নতুন মানুষ এসে বাসা বেঁধেচে তার স্থান কোথায় ?

মীনাক্ষী বললে, নতুন মানুষ কেন বল্‌ছ ?

এই কারণে বলছি যে, একে তুমিও বুঝতে পারোনি। নতুন কালের সংগ্রামের দিকে তোমার দৃষ্টি যায় না কেন ?—কঙ্কর বললে, সংগ্রাম বাইরে নয়, মানুষের মনে মনে, আত্মায় আত্মায়। একই মানুষের চিত্ততলে চেয়ে দেখো, সংশয়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা, বিপ্লবের সঙ্গে শুভবুদ্ধি, ঈশ্বরের সঙ্গে শয়তান, কাপট্যের সঙ্গে সততা, অসংযমের সঙ্গে প্রশান্তি—পরস্পর প্রতিবাদশীল ধাতুর বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে, আমি সেই অদ্ভুত একাকারের প্রতীক্। বৈরাগ্যের দিকে প্রবল ঔৎসুক্য, কিন্তু প্রচণ্ড সম্ভোগের পিপাসায় আমি জর্জরিত। কর্মের দিকে নিয়ত ধাবমান মন, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার আসক্তিতে অলস। নতুন মানুষ আমি এই কারণে যে, লক্ষ্য ক'রে দেখো নিজের বাড়ীতে আমি আজ চোরের মতন এসে ঢুকেছি।—না, না, জানি তুমি কি বলবে। তুমি আছো সঙ্গে সেজন্যে ভয় নয়, লোকনিন্দাকে তারাই ডরায় যারা দরিদ্র,—আমি দরিদ্র নই ; কিন্তু আমি যেন সমস্তর থেকেই বিচ্ছিন্ন, এখানে এলে আমি চিনতে পারিনে নিজেকে, যেন বাড়ী ঘর দোর আমাকে উৎপীড়ন করে, একটা প্রবল অপরিচয়ের অস্বস্তিতে আমার মন যেন ছুটে পালাতে চায় দুই ডানা মেলে উধাও হয়ে। আমি আজন্মই আশ্রয়হীন, মীনাক্ষী !

মীনাক্ষী বললে, চুপ করো, আমি জানি সব।

জানো সব, তাই দুঃখ যখন দেখি তোমার মনে মেঘ জমেছে।—কঙ্কর বললে, নতুন মানুষ আমি, নতুন শিল্পী আমি,—

বাধা দিয়ে মীনাক্ষী বললে, জানি, কঙ্কর। জানি তুমি খেয়ালী, অনবধান

নিষ্ঠুর, প্রেমিক, অসংযত। তোমার কোনো ধর্ম নেই, মর্ম নেই; করুণায় কখনো তুমি বিগলিত, নির্বোধ নির্দয়তায় কখনো বা বীভৎস। তোমার ভীষণতায় মুগ্ধ হয়ে যাই, তোমার মমতার চেহারা দেখলে ভয় পেয়ে পালাতে হয়। তুমি শিল্পী তাই তুমি ভয়ঙ্কর, তাই মধুর। পাপের মত্ততায় আর পুণ্যের আত্মত্যাগে তোমার সমান আনন্দ; যার বুকের ওপর দিয়ে নির্দয় রথচক্র চালিয়ে যাও, তাকেই তুমি পূজা দিতে পারো সর্বান্তঃকরণে। শিল্পী তুমি, বীভৎসতায় তোমার মন টলে, সৌন্দর্যে তোমার মন গলে! তোমার খেয়ালের খেলায় পুতুল ও প্রতিমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; তুমি সর্বনাশ করতে পারো যার অনায়াসে, আত্মত্যাগ করতে পারো তার জন্য সামান্য কারণে। জানি তোমাকে শিল্পী, তোমার মর্মকোষের গন্ধে আমার ঘুম ভাঙলো, আমি ছুটছি তোমার সঙ্গে পাগল হয়ে। সাংঘাতিক পরিণাম যদি আমার হয়, ভয় পাবো না, তোমার খেয়ালের খেলায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবো, সেই আনন্দে হয়ে এসেছি সর্বত্যাগিনী। কঙ্কর, আমাকে তুমি ভাঙো, চুরমার করো, পদদলিত করো, আমাকে নিংড়ে নিয়ে তোমার ধ্বংসের পথের পাশে ফেলে চলে যাও, কোনো প্রতিবাদ করব না!

কঙ্কর তার হাত ধ'রে বললে, বিপ্লববাদিনী, আমি যেন তোমার যোগ্য সম্মান দিতে পারি।

উত্তেজিত হয়ে মীনাক্ষী বললে, চতুর, তোষামোদ করবে আমার? অত ছোট আমি নই। যে-বাঁধন আমাকে বেঁধে রেখেছে এই গভীর রাতে, ভেঙে দিতে চাও তুমি সেই বাঁধন। যে বারুদ জমেছে তোমার মনে এই নিভৃত সান্নিধ্যে, তাকে উন্মত্ত শিখায় জ্বালিয়ে তোলো, সেই আগুনে আমার আত্মাহুতির ভিতর দিয়ে দেখে নাও তোমার প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডব। মনে করেছ ভয় পাবো, মনে করেছ বেঁধে রাখবো নিজেকে আত্মরক্ষণী শক্তিতে? পরীক্ষা করো, অবলা কাঁদবে না তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে। নাটুকেপনায় বলব না যে, ঈশ্বর রক্ষা করো। বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে চেয়েছিলুম, চেয়েছিলুম মনুষ্যত্বের পরিচয়কে

সম্মান দিতে,—কিন্তু তখন বুঝিনি যে আমার সামান্য বিচারবুদ্ধির চেয়েও তুমি আমার কাছে অনেক বড় ; বুঝিনি যে আমার বাঁচাটা তোমার স্বেচ্ছাচারের কৈফিয়ৎ, আমার মরাটা তোমারই অহেতুক খেয়ালের আনন্দ। কঙ্কর, শিল্পী তুমি, দেখে নাও আমার দেহের মুকুরে তোমার অসংযত প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছায়া, দেখে নাও তোমার সমাজ বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি, তোমার বীভৎস দেহ-তাড়নার প্রতিফলিত রূপ। এই নাও, দিলুম তোমাকে সব, কৃপণতা আজ কোথাও রাখতে পারব না, আগল রাখতে চাইনে অন্ধকারে, এই ভঙ্গুর রঙীন কাঁচের পাত্রকে চূর্ণ ক'রে দাও, তার ঝনঝন শব্দ গান হয়ে তোমার কানে বাজুক।—বলতে বলতে তার বিশাল জ্বলজ্বলে দুই চোখ অন্ধকারে কঙ্করের দুটি মুগ্ধ চোখের তারার উপর পিশাচীর মতো নিঃশব্দে হাসতে লাগলো।

কী দেখছো?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো। তার চোখে ঘুম এসেছিল।

অভিভূতের মতো মীনাক্ষী বললে, দেখছি আমার ঈশ্বরকে, যার মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে কোটি কোটি তরঙ্গ ভঙ্গ। অদ্ভুত তুমি।

কঙ্কর বললে, আশ্চর্য তুমি। দুই বিন্দু আকাশ তোমার চাহনিতে। তোমার নিশ্বাসে জীবন ওঠে জ্বলে, তোমার আলিঙ্গনে মরণের ফাঁস জড়ানো।

বুকের মধ্যে তোমার এত শব্দ কেন?

তোমার নূপুরের ঝনক, নাচনের ঝঙ্কার।

মীনাক্ষী বললে, মেয়েমানুষের ঔৎসুক্যের জবাব দেবে?-

বলো।

ভালবাসো তুমি আমাকে?

কঙ্কর বললে, রোমাঞ্চ জাগিয়ো না, দিশেহারা করো না, মীনাক্ষী!

ঘৃণা করো?—নারী জানতে চাইলো।

তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে কঙ্কর বললে, জানতে চেয়ো না প্রাণরহস্য।

মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, যদি চলে যাই তোমাকে ছেড়ে?

ছুটবো তোমার পিছু পিছু।

যদি ধরা দিই তোমার হাতে ?

কঙ্কর বললে, পালাব তোমার বাঁধন কেটে।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মীনাক্ষী তার হাতখানা ছাড়িয়ে স'রে এলো। মেহগনির পালঙ্কের নরম বিছানা থেকে নেমে বললে, এইবার তাহলে চুপ ক'রে ঘুমোও, কেমন ?

যথা আজ্ঞা, দেবী!

হেসে মীনাক্ষী বললে, যুদ্ধে জয় হোলো, না পরাজয় ?

হাসিমুখে কঙ্কর বললে, সন্ধি করলুম।

সন্ধি ? এ কোন্ রাজনীতি ?

অহিংস সন্ত্রাসবাদ।

বটে! দেশের নরনারী যদি তোমার এই নীতি না মানে ?

কঙ্কর বললে, তবে আমরণং উপবাস।

মীনাক্ষী পাছতলার দিকে গিয়ে কঙ্করের পা দুখানা একত্র ক'রে নিজের ওষ্ঠাধর তার উপরে স্পর্শ করে বললে, ছলনায় সিদ্ধ তুমি, তোমারই জয় মেনে নিলুম।—এই ব'লে মশারিটা সযত্নে ফেলে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে হাসিমুখে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

*

* *

মালী চা এনে হাজির করবার আগে মীনাক্ষী স্নান সেরে প্রস্তুত হয়েছিল। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে মালী জিজ্ঞাসা করলো, বাবুকে ডাকবো কি ?

ডাকো, ডাকো—সেই যে মশারীর মধ্যে সায়েব গিয়ে ঢুকেছে, সকাল আটটা অবধি সাড়া নেই। ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো,—এবার কিন্তু কানে জল ঢেলে দেবো গিয়ে।—মীনাক্ষী নিজের কণ্ঠস্বরটা ছুড়ে নীচের তলা পর্যন্ত পৌছে দিল।

নীচের থেকে মেজবৌদিদির সাড়া পাওয়া গেল। তিনি বললেন, খাবার নিয়ে এখুনি যাচ্ছি ভাই, বাবুমশাইকে ডাকো।

মীনাক্ষী বললে, আমরা গরীবের মেয়ে মেজবৌদি, ভোর বেলাতেই উঠতে হয়। বাবুমশায় জমিদার, ওঁর ঘুম ভাঙাবার জন্যে লোক রাখতে হয়।

মেজবৌদিদির হাল্‌কা হাসির শব্দ শোনা গেল।

কঙ্কর উঠে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মালী একখানা চেয়ার টেনে টেবলে চা রেখে চ'লে গেল। দু'জনের সহাস্য দৃষ্টিবিনিময় হোলো। কঙ্কর বললে, 'প্রভাতে উঠিয়া ও-মুখ দেখিনু, দিন যাবে আজি ভালো!' সিঁথিতে সিঁদুর পরালে কে, ছলনাময়ি?

হাসিমুখে চুপি চুপি মীনাক্ষী বললে, তোমার টেবলে লালকালি শুকিয়েছিল, তারই গুঁড়ো মেখেছি।

আর ওই সোনার পাড় দেওয়া রেশমি শাড়ী?

তোমার সিন্দুকের চাবি যে আমার আঁচলে থাকে!

সিন্দুক? টাকা পয়সা ছিল না কিছু!

না থাকলে কি কেবল বক্তৃতা দিয়ে জীবনযাত্রা চলে?

কই আমি ত কিছু খুঁজে পাইনি?

মীনাক্ষী বললে, চোরাগলিতে ছিল, মেয়েমানুষ ছাড়া তার সন্ধান কেউ পায় না।

কঙ্কর হাসলো।

ভয় নেই গো ভয় নেই, এখনো অনেক টাকা আছে। আছে অনেক অলঙ্কার তোমার মায়ের। সব খুঁজে বা'র করেছি।

বলো কি? তাহ'লে ত এবার সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করার সুবিধে পাওয়া গেল। হে ঈশ্বর, সবই তোমার অনুগ্রহ! সবসুদ্ধ কত আছে বলো ত?

পরিমাণ বলব না।—মীনাক্ষী বললে, আমি আজ থেকে তোমার খরচপত্রের ভার নিলুম।

কঙ্কর বললে, তোমার এই বেআইনী অধিকার গ্রহণের হেতু?—এই ব'লে সে চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

মীনাক্ষী বললে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

যদি গ্রাহ্য না করি?

তবে নারীহরণ আর শ্লীলতাহানির অভিযোগ আনব।

বেশ, তার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কতো?

জীবনস্বত্ব।—ব'লে মীনাক্ষী হেসে উঠলো।

এমন সময় দুই হাতে খাবারের থালা নিয়ে নীচে থেকে মেজবৌদিদি উঠে এলেন। কঙ্কর উঠে গিয়ে তাঁর দিকে একখানা চেয়ার টেনে দিয়ে এলো। তিনি হাসিমুখে খাবারের থালা টেবলের উপর রেখে বললেন, দেওর-ভাজে কেবল কথার ছুরিখেলা। আজ কটার গাড়ী শুনে নিই আগে।

কঙ্কর বললে, রাত সাড়ে দশটায়।

বেশ, রাতেও খেয়ে যেতে হবে কিন্তু। আমি ওঁকে বাজারে পাঠিয়েছি। এদিকে রান্না চড়িয়েছি। তারপর, কি ঝগড়া হচ্ছিল শুনি?

মীনাক্ষী বললে, চাবিটা নিয়ে আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তাই জন্যে উনি পুলিশ ডাকতে চলেছেন। আপনি এর একটা আপোষ নিষ্পত্তি করে দিন্ ত মেজবৌদি।

দিচ্ছি।—ব'লে তিনি নিজের আঁচল খুলে কয়েকখানা দশটাকার নোট বার ক'রে কঙ্করের কাছে রাখলেন। বললেন, দুমাসের ভাড়া—এই নিয়ে আপনি যা খুশি খরচ করুন, আর ঠাকুরঝির আঁচলে থাক আপনার চাবি। কেমন, হোলো ত?

কঙ্কর বললে, আপনার কাছে ভাড়াও নেবো, আবার পাতও পাড়বো, এ কেমনতরো হোলো?

মেজবৌদিদি বললেন, আপনার বিয়ের আগে পর্যন্ত এই ব্যবস্থা। এ আপনার মাসোহারা, বাড়ীভাড়া নয়। বিয়ের পরে সব শোধ ক'রে দেবেন, হাসিমুখে নেবো।

তার আগে যদি আপনাদের তুলে দিই?

তবু দেনা আপনার দেনাই রইল। জানেন ত মেয়েরা ম'রে পেত্নী হয়, তখন দেনা শোধ না ক'রে আপনি যাবেন কোথায়?

কঙ্কর বললে, আপনারা হীনজাতি শূদ্র আর আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ,—আপনাদের ঘরে আমরা পাত পাড়বো কেন?

মেজবৌদি বললেন, তবে কেন আপনি মুসলমান বাবুর্চির হাতে খেতেন?

তারা আমাদের ভাই—হিন্দু-মুসলমান মিলন!

তাহ'লে হরিজনরাও আপনার দাদা, তাদের হাতে বেশ খাওয়া যায়।—এই ব'লে হাসিমুখে মেজবৌদিদি চ'লে গেলেন এবং শাসিয়ে গেলেন যে, কঙ্করের জন্য তিনি একটি পাত্রী খুঁজে বা'র করবেন।

মৃদুকণ্ঠে বিদ্রূপ ক'রে কঙ্কর বললে, 'যোগাযোগে'র শ্যামার কথা জানলে মেজবৌদি আর এ-আবদার ধরতেন না।

মীনাক্ষী জবাব দিল, নূরনগরের মেয়ে এসে দাঁড়ালে শ্যামা গা-ঢাকা দেবে, ভয় নেই।

তারপর?

তারপর মধুসূদনের ঔরসে আর কুমুদিনীর গর্ভে শ্যামার অভিসম্পাতের সঞ্চার। তারপর অমীমাংসিত গল্পের ওপরে যবনিকা পতন।

কঙ্কর বললে, রবিঠাকুরের গল্পে আর উপন্যাসে যৌন দুর্নীতিটা পথের বাইরে পা দেয়নি, সবই অন্তঃপুরে সংঘটিত।

কি রকম?

অনেকটা প্যাথলজির কোঠায় পড়ে। কেমন একটা রোমাণ্টিক্ মরবিডিটি।

তাঁর উপন্যাসে চারিত্রিক অশুচিতা আত্মীয়জনের মধ্যেই যেন আবদ্ধ। অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অশুচি প্রণয় লালাসিক্ত জিহ্বায় যেন পরস্পরকে জন্তুর মতো লেহন করে,—অথচ তাদের বাইরেটা আভিজাত্যের রাংতায় মনোহর ; শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাকচিক্যে হৃদয়গ্রাহী। কঙ্কর বললে, ভাষা, ভঙ্গী আর কবিত্বের আবরণ ঘুচিয়ে নষ্টনীড়ের বিচার করো, বিচার করো চোখের বালি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, মালঞ্চ, দুইবোন। কেউ দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নি, কেউ বৌদি, কেউ শ্যালী, কেউ বা বন্ধু-স্ত্রী,—অর্থাৎ বাঙ্গালী গার্হস্থ্য জীবনের যেগুলি স্তম্ভ,—ঔপন্যাসিকের হাতে তাদেরই লাঞ্ছনা। বাইরে থেকে তারা আহরণ ক'রে আনে না, ভিতরে ভিতরে ঘূণ ধরায়।

মীনাক্ষী বললে, ধনী লোকের কথা পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। তারা খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে বাইরে লাম্পট্য করে না, অন্তঃপুরেই তাদের গতিবিধি।

কঙ্কর বললে, রবিঠাকুরের গল্পে অভিজাত সমাজ সকলের চেয়ে বেশী অপমানিত হয়েছে। তাদের নোংরামি, তাদের স্ববারি—

মীনাক্ষী বললে, 'শেষের কবিতা' এর ব্যতিক্রম।

কঙ্কর বললে, সেইজন্য বইখানা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে অত মধুর হয়ে উঠেছে।

জলযোগের পরে মালী এসে একগোছা চিঠিপত্র রেখে চ'লে গেল। নানা রঙের খাম, নানা জাতের কভার, নানা আকারের প্যাকেট। কেবল চিঠিপত্র নয়, তার সঙ্গে কতকগুলি সাময়িক পত্র, কয়েকখানা বই।

মীনাক্ষী সেই স্তূপীকৃত কাগজপত্রের দিকে চেয়ে বললে, প্রেমপত্র আছে নাকি এক-আধখানা ?

খুঁজে দেখো, পেতেও পারো।

সুব্রত বলেছিল যে, তুমি নাকি কোন্ একটি তরুণীকে নিয়ে একদিন সিনেমায় গিয়েছিলে, মেয়েটির পরিচ্ছদের চটক পথচারীদের বিভ্রম ঘটিয়েছিল। সেটি কে ?

কঙ্কর বললে, সে একটি সাময়িক প্রণয় কাণ্ড। অনেকটা বেনোজলের মতন। আমার এক গদ্য কবিতা প'ড়ে মেয়েটি চিঠি লেখে, এসে আলাপ করে। সাহিত্যিক-শিকারে জনকয়েক কলেজী মেয়ে ভারি অভ্যস্ত।

মীনাক্ষী মুখ টিপে বললে, তাহলে সাহিত্যিক খ্যাতিটুকু কাজে লাগিয়েছ বলো?

লাগলো কোথায়, মেয়েটা যে চ'লে গেল।

গেল কেন?

মনে করেছিল জীবনটাও বুঝি নভেল্, তরুণীপনা করে বেশ কাটানো যায়। প্রথম দিনেই আমি তার জীবনের মূল ধ'রে টান দিলুম। বললুম, সঞ্চয় কি আছে শুনি? সে কেবল বললে, আমি আপনার ভক্ত। বললুম, তোমার পরিচয় কি? নিজের জীবনের কোনো বড় ব্যাখ্যা দিতে পারো? সে বললে, আমি মেয়েমানুষ, অত বুঝিনে।—কলেজে পড়া সেই তরুণীকে আমি সিনেমা থেকে বেরিয়ে বললুম, মেয়েমানুষ কিনতে পাওয়া যায় পথে ঘাটে, দাম দুটো টাকাই যথেষ্ট!—মেয়েটি আমার দম্ভ দেখে সেই যে চ'লে গেছে, আর খোঁজ খবর নেয়নি।

মীনাক্ষী বললে, এইটুকু সাহিত্যিক খ্যাতিতেই এত অহঙ্কার, না জানি আরো বড় হ'লে—

সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, মীনু। সাহিত্যের চেয়েও আমি বড়, আর আমার চেয়েও বড় আমার জীবন।

সাধে কি আর চাবিটা আঁচলে বেঁধেছি।—এই ব'লে মীনাক্ষী হেসে নিচে নেমে গেল। কঙ্কর মনোযোগ দিল চিঠিপত্রে।

চিঠিপত্রগুলির আকর্ষণ কম নয়। ব্যাঙ্ক থেকে এসেছে নোটিশ, তার সঙ্গে সুদের হিসাব। শেয়ারের ডিভিডেণ্ড্‌এর দরুণ একখানা চেক্। পিতার যে একটা মোটা টাকার ইন্‌স্যুওরেন্স ছিল, সেটা উদ্ধার হওয়ার একখানা বিজ্ঞপ্তি।

এ ছাড়া মাসির চিঠি, মামার চিঠি, বোনের চিঠি। অনেকগুলো দিন বিষয়-বৈরাগ্যে কেটে গেছে। গরীবের ছেলে না হওয়ার সুযোগটা নিয়েছে সে পদে পদে। জীবনে সে কোথাও মিল দিয়ে চলতে পারলো না, তাই গদ্য কবিতা লিখে চললো সে অবিশ্রান্ত। কিন্তু মিল না দিলেও ছন্দের দিকে কান রাখা দরকার; সেইজন্য সে ঠিক করলে আজ সব চিঠিগুলোরই জবাব দেবে এবং মধ্যাহ্নের আহার শেষ ক'রে সে বিষয়কর্মে আজকের দিনটা নষ্ট করবে এবং ফিরে এসে রাত্রের আহার শেষ ক'রে মীনাক্ষীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে।

*

*　　　　*

সন্ধ্যার পরে মেজবৌদিদি উপরে উঠে এলেন। চোখে হাসি, মুখটেপা রাগ, মনে মনে কৌতুক। তিনি এসে উপরের বাথরুমে কান পাতলেন। শুনলেন, ভিতরে জলধারা যন্ত্রের অশ্রান্ত ঝরো ঝরো শব্দ, তরুণীর আপন মনে নিভৃত কলগুঞ্জন আর দুই দরজার মিলন-রেখায় কুসুমগন্ধী সাবানের মিষ্ট গন্ধ।

তিনি হাসিমুখে বললেন, ও ঠাকুরঝি, গোলাপের পাপড়ির ওপর এত চিত্রাঙ্কন কেন গো?

ভিতর থেকে জবাব এলো, তা নয় বৌদি, নির্জনে নার্সিসাস নিজের চেহারা দেখে অভিভূত।

কী অবস্থায় রয়েছে, সে দেখতে ইচ্ছে করছে।—ব'লে চোখ টিপে মেজবৌদি হাসলেন।

সত্যি? ললিতকলা-কল্পনাকে সত্যিই দর্শন করতে চাও?

মেয়েরা সব পারে। খুট ক'রে দরজাটা খুলে গেল, কিন্তু সে একটি পলক মাত্র। রূপ আর দেহের অদ্ভুত প্রাচুর্যে মেজবৌদিদির চক্ষু বিস্ময়ে অভিভূত হবার আগেই ঝপাৎ ক'রে দরজাটা পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভিতর থেকে কলকণ্ঠে প্রশ্ন এলো, এবার হয়েছে ত? ও মেজবৌদি, সাড়া দিচ্ছেন না যে?

মেজবৌদিদি বললেন, এই যে—

কী ভাবছেন?

নিশ্বাস ফেলে তিনি জবাব দিলেন, ভাবছি যদি আমি পুরুষ হতুম!

ভিতর থেকে কেবল স্ফটিকের পাত্র চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার মতো একরূপ উচ্ছৃঙ্খল হাসির আওয়াজ জলধারা যন্ত্রের সঙ্গে মিলে মেজবৌদিদির কানে এসে বাজলো! উত্তরে তিনি পুনরায় বললেন, শিগগির বেরোও, আজ তোমাকে সাজিয়ে দেবো।

কিছুক্ষণ পরে বাথরুমের আলো নিবলো, ধারাযন্ত্রের আওয়াজ থামলো। দরজা খুলে মীনাক্ষী হাসিমুখে বেরিয়ে এলো।

ঠোঁট উলটে হেসে মেজবৌদিদি বললেন, নিজের রূপ নিজের চোখে বুঝি খুব ভাল লাগে?

মীনাক্ষী বললে, না, মেজবৌদিদি, রূপের চেয়ে রূপের অহঙ্কার আমার বেশি প্রিয়।

ছেলেপুলে হ'লে থাকবে এত রূপ?

আরো বাড়বে।—মীনাক্ষী বললে, তখন উর্বশী হবেন দেবী জগদ্ধাত্রী।—এই ব'লে সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পিছনে পিছনে মেজবৌদিদি এলেন। মালী একবার এসে ঘরের আলো আর পাখা খুলে দিয়ে গেল। স্নিগ্ধ হাওয়ায় ব'সে মীনাক্ষী বললে, মেয়েদের স্নানে পরিশ্রম বেশি। আমি যদি সম্রাট নেপোলিয়নের ভগ্নী হতুম, তবে একটা কাফ্রী চাকর রাখতুম, সে আমাকে স্নান করাতো দুবেলা!

ওমা, পুরুষ মানুষ যে!

হেসে মীনাক্ষী বললে, নেপোলিয়নও আপনার মতন বলেছিলেন, পুরুষ মানুষ

যে! উত্তরে বোন পলিন অবাক হয়ে বলেছিলেন, দাদা, কাফ্রী আবার পুরুষ নাকি?

মেজবৌদি বললেন, কী বেহায়া মেয়ে বাবা তুমি! এসো আজ তোমাকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দেবো, ঠাকুরঝি।

কী দিয়ে সাজাবেন?

যেমন ক'রে সাজায় ফুলশয্যের কনেকে?

বেশ, কিন্তু ভ্রমর কই? গুনগুন করবে কে ফুলের পাপড়ির গায়ে গায়ে?

ভয় নেই গো, ভয় নেই—মেজবৌদিদি বললেন, রাত পোহালেই পাবে। গিয়ে দেখবে মোহিনীমূর্তিটি দেখবার আশায় পথের ধারেই বর ব'সে আছেন।

একটু আনমনা হয়ে মীনাক্ষী বললে, কে জানে, হয় ত বিরহী পথে-পথেই বাসা বেঁধেছে।

মেজবৌদি খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন। পরে বললেন, সারাদিন ধরে বরের যে-বর্ণনা করেছ, দেখেই তোমার বরকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।—এই বলে তিনি প্রসাধনের সাজসজ্জা বা'র করলেন।

মীনাক্ষী আত্মগোপন ক'রে বললে, ভাল ক'রে জানলে ভালোবাসবেন কিনা সন্দেহ।

কেন? ভায়ে-ভায়ের বুঝি একই স্বভাব?

হুবহু।—মীনাক্ষী বললে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এটি লক্ষ্মীছাড়া, ওটি উদাসী। এটির চক্ষু পথের দিকে, ওটির চক্ষু আকাশের কোণায়।

তোমাকে ভালবাসেন খুব?—ব'লে মেজবৌদি তার চুল বাঁধতে বসলেন। জরির ফিতা দিয়ে বেণী দুলিয়ে দিলেন দুমিনিটে।

ভালবাসলে কি আর রূপকে অপরূপ করবার চেষ্টা করতুম, মেজবৌদি?—চোখ টিপে মীনাক্ষী বললে।

ভালোবাসতে শেখাও না কেন?

ওমা—মীনাক্ষী বললে, যত রাঁধি ততই বাঁধন কাটে। খাঁচা পেতে ব'সে থাকি খাবার হাতে নিয়ে। ছোঁ দিয়ে খেয়ে পালায় কিন্তু ফাঁদে এসে ঢোকে না।

হেসে মেজবৌদি বললেন, বেশ, এবার শেষ ফাঁদ পাতো। আজ এমন সাজ সাজিয়ে দেবো যে, ফাঁদে ধরা দিতেই হবে।—ব'লে তিনি মনোযোগ সহকারে তাকে অলঙ্কৃত করতে ব'সে গেলেন।

মীনাক্ষী বললে, তবেই হয়েছে! সাজসজ্জা ক'রে পিছু পিছু ছোটাই সার হবে মেজবৌদি, ধরা ছোঁয়া পাব না।

আচ্ছা, দেখো কেমন সাজিয়ে দিই। ছোট দেওরটির পর্যন্ত মাথা ঘুরে যাবে।—এই ব'লে মেজবৌদিদি উঠে তাকে রেশমী শাড়ী রাজপুতানী ভঙ্গীতে পরিয়ে দিলেন। চেহারাটা দাঁড়ালো অবাঙ্গালী মেয়ের, বুকের আঁচলটা গেল ডানদিকের স্কন্ধে। আর চেনা যায় না।

কিন্তু সাবধান।—মীনাক্ষী হেসে হেসে বলতে লাগলো, দেওরের মাথা ঘুরলে চলবে না। পথ অনেকখানি, যেন শেষ পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

মেজবৌদিদি হেসে তার চিবুক নেড়ে দিলেন। বললেন, মন্দ কি, আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি লাগবে।

সবুজ রঙের বেনারসীর উপর সোনার জড়োয়া পাড—এমন শাড়ীই ঐ দেহটির যোগ্য। শাড়ীখানায় আধুনিককালের সুলভ মূল্যের চোখ ঝলসানো চাকচিক্য নেই, কিন্তু আভিজাত্যের সম্ভ্রমটা ষোল আনা পাওয়া যায়। হাতভরা হোলো সোনার কাঁকন, জড়োয়া মণিবন্ধ, উপরে বাহু-বন্ধ রত্নখচিত। কটিতটে চন্দ্রমালা। কণ্ঠে লাল ও সবুজ স্ফটিকখচিত স্বর্ণলহরী দোলা। কালো বেণীতে জড়ানো রূপালী জরির ফিতা,—কপালে হীরক চন্দ্রতিলক, মাথায় সোনার সর্প বিসর্পিত, সিঁথিমূলে অভ্র-মিশ্রিত রক্তসিন্দুর দীর্ঘরেখাঙ্কিত, মুখের উপরে শুভ্ররেণুর সঙ্গে রাঙা কুঙ্কুমের আভাস। অধর তাম্বূলরাগরঞ্জিত—যেন পুরুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তরেখা। পদপ্রান্তমূলে অলক্তলেখা।

মীনাক্ষী বললে, চরণে নূপুর-মঞ্জরি কই, মেজবৌদি ?

ওটা এখনকার ফ্যাশন নয় ভাই।

ফ্যাশনটাই বড় হোলো, আর পুরুষের বক্ষস্পন্দনের সঙ্গে তাল দেওয়া কিছুই নয় ? তবে কোমরের গোটটাও খুলে নিন ?

মেজবৌদিদি এবার একটু কবিত্ব ক'রে সাধুভাষায় বললেন, চন্দ্রহার খুলে নিলে নিতম্বিনীর মূল্য কী রইল ! ওরে পাগলি, মেয়েমানুষের এমন সুন্দর দেহও রক্ত-মাংস ছাড়া আর কিছু নয়,—কিন্তু এর নিটোল লাবণ্যকে আরও মনোহর করা যায় অলঙ্কারে। মায়া রইলো তোর যৌবনে, লালসা রইলো তোর আচ্ছাদনে, মোহ সঞ্চারিত হোলো অলঙ্কারে।—এই ব'লে মেজবৌদিদি পরম স্নেহে মীনাক্ষীকে আদর ক'রে খুশী হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মীনাক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধ'রে বললে, দেখলেন ত, গোলাপের গায়ে চিত্রাঙ্কন আপনিই ক'রে গেলেন, আমি নয় !

মেজবৌদি তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললেন, সর্বনাশিনি, আয়নার দিকে চেয়ে ব'সে থাকো, ততক্ষণ আমি রান্নাবান্না সেরে নিইগে। তোমাদের গাড়ীর সময় হোলো।—এই ব'লে তিনি হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর চ'লে যাওয়ার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। শাড়ী জড়ানো বধূর সাজে মীনাক্ষী বেরিয়ে গেল, চরণক্ষেপে বাজতে লাগলো অলঙ্কারের শিঞ্জনী, সেই আওয়াজ তার নিজের কানেই বাজলো মধুর হয়ে। নিজের এই চেহারাটা নিজেরই কাছে অপ্রাকৃত, এর কোনো কৈফিয়ৎ নেই। সর্বাঙ্গকে ঘিরে কেমন একটা মধু-উৎসবের সঙ্কেত এসে পৌছয়—যেন একটা আত্মবিস্মৃতির আলস্যে মনটা ক্লান্ত হয়ে আসে। মীনাক্ষী এ-মহল থেকে ও-মহল পর্যন্ত পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগলো।

সাজসজ্জা আর প্রসাধনে কোন্ মেয়ের বৈরাগ্য ? তবু ত অস্বস্তির ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে দেহ। এমন সজ্জা সইছে না তার, এমন বন্ধন নারীর

জীবনে সে কল্পনা করতে পারে না। পৃথিবী তার মুখের উপর বিদ্রূপ ক'রে বলছে, মীনাক্ষী, এ তুমি কী করলে? কিছুই সে করেনি, মাত্র নারীপ্রকৃতির চিরকালীন পরিচয় দিয়ে ফেলেছে। জীবনে এর কোনটা সত্য? সবগুলোই —মীনাক্ষী ভাবতে লাগলো, একটার সঙ্গে অন্যটার বিচ্ছেদ নেই। স্বভাবের মূল থেকে উঠে আসে পরস্পর-প্রতিবাদশীল চিন্তার ধারা। বিপ্লব বাধায় একদিকে অবিশ্রান্ত, রক্ষণশীলতায় অন্যদিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে অক্লান্ত,—কেন এমন হয়? জীবনের ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট নিরীখ্ কোনটা? প্রতারণা তার জীবনে কোথাও নেই, কুলবধূত্বের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ সে খুঁজে পায়নি, অলঙ্কার প্রসাধনের উপর তার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা,—কিন্তু তবু এই চিত্তবৈলক্ষণ্য যেন নতুন লাগছে। নতুনটা, যেমন সচরাচর হয়, অতি যন্ত্রণাদায়ক। ভালো লাগছে, কিন্তু অভ্যাস নেই, পরিচয় নেই,—সুতরাং তাকে ত্যাগ করো। নতুন ব'লেই ওটা মন্দ, ওটাকে মানতে পারবনা, তাই ওকে ভাঙো, ওকে তাড়াও, ওকে লাঞ্ছিত করো। বিপ্লবের মধ্যেই মীনাক্ষী শান্তিতে ছিল, শৃঙ্খলাহীনতা আর অনিয়মের মধ্যেই তার ছিল প্রাণের স্বাচ্ছন্দ্য, আচার এবং রীতিনীতি না মেনে চলার মধ্যেই পাওয়া যেত সহজ গতি, —কিন্তু নতুন এসে উৎপাত ঘটায় কেন? কেন এসে ভাঙতে চায় তার স্বাচ্ছন্দ্য, কেন বিড়ম্বিত করতে চায় তার বৈপ্লবিকতাকে? মীনাক্ষী হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলো, ভাঙতে ভাঙতে ভাঙারই নেশা ধরেছে, বিপ্লব প্রচার করার জন্য সর্বত্র বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানোর অভ্যাসটাই হয়ে উঠেছে তার জীবনে একটা রীতি, শেষকালে কি তাকে বিপ্লবের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ প্রচার করতে হবে? অবশেষে নিজের বিপক্ষেও আনতে হবে একটা অপ্রীতিকর বিচার? ধ্বংসের দিকটাই দেখবে, ঝরাপাতাই মাড়িয়ে যাবে, আর দেখবে না তার পিছনপথে সৃষ্টি হয়ে চলেছে নব বসন্তকালের নবাঙ্কুর?

অন্ধকার মনে হচ্ছে চারিদিকে, সমস্তটা যেন সমস্যায় ঘন অন্ধকার ; পথ

হাতড়ে না পাওয়ার দুর্গম অন্ধকার। ভালোয় মন্দয়, আলোয় ছায়ায়, সত্যে মিথ্যায়, বাস্তবে ও আদর্শে অগ্রগমনের পথটা যেন বড জটিল। বিচার ক'রে দেখার উপায় নেই, যাচিয়ে নেবার কষ্টিপাথর নেই,—পিছন থেকে ঠেলছে, সুমুখের দিকে টানছে। অতীত ভবিষ্যৎ—দুদিকেই অন্ধকার, মাঝখানে অস্তিত্বের বিন্দুর পরে একটু আলো—শিশিরবিন্দুর মতো জীবনটা ঝলোমলো।

ঘটনা ঘটলো অপ্রত্যাশিত। মীনাক্ষী দালানময় আলোগুলি জ্বালিয়ে দিল। মালী ঝাঁটা দেওয়ার জন্য ঘরগুলো খুলে রেখেছিল, সে গিয়ে ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিল। আলো জ্বালিয়ে সে একবার দেখুক নিজেকে। প্রসাধন নয়, অলঙ্কার আচ্ছাদন নয়, রূপ আর যৌবনও নয়—একবার দেখে নিক আত্মপ্রকাশটাকে। ছিল সে মীনাক্ষী, সাজ করলো গৃহাঙ্গনার,—কিন্তু দুইয়ের রাসায়নিক মিশ্রণে দাঁড়ালো তৃতীয় কোন্ মেয়ে? নিজেকে পরিষ্কার ক'রে দেখবার জন্য এ-মহলার শেষ ঘরখানায় ঢুকে সে আলো জ্বাললো। কিন্তু একটি মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণে সভয়ে সে আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

পালঙ্কের উপর কঙ্কর জেগে বসেছিল। সে কখন ফিরেছে জানা যায়নি। বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে সে মীনাক্ষীর দিকে চেয়ে রইল।

এবং তাও একটি মুহূর্ত। চক্ষের পলকে মীনাক্ষী হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিল। কাঁকন বেজে উঠলো।

ঘরের ভিতরে বাতাস যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, নিশ্বাস যেন রুদ্ধ। কঙ্কর ধীরে ধীরে বললে, কাছে এসো।

মীনাক্ষী সাড়া দিল না। অন্ধকারে বোঝা গেল না সে দাঁড়িয়ে রয়েছে, না পা টিপে টিপে পালিয়ে গেছে।

কঙ্কর পুনরায় ডাকলো, মীনাক্ষী?

স্তব্ধ, নিশ্চল!

মীনু?

কিন্তু সাড়া না পেয়ে কঙ্কর উঠে এলো। মীনাক্ষীকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসালো পালঙ্কে তার পাশে। তারপর বললে, কথা বলছ না যে? একি, গা যে পাথর! এত ঘেমেছ কেন, মীনু? হঠাৎ যেন তুমি হয়ে গেলে বিয়ের কনে —যেমন নম্র, তেমন সলজ্জ।

মীনাক্ষী অস্পষ্টকণ্ঠে বললে, আমাকে ক্ষমা করো।

ক্ষমা করব? কেন?

আমি আগে বুঝতে পারিনি।

কঙ্কর বললে, এমন চমৎকার ক'রে সাজালে কে তোমাকে? ক্ষমা চাওয়ার কথা পরে, আমি ভাবছি ট্রেনে উঠলে আমার এমন সোনার সহধর্মিনীটিকে ডাকাতরা কেড়ে নিয়ে না যায়। মীনু, এমন বাসর-সজ্জাটা মাটি করবে ট্রেনে উঠে? দাঁড়াও, আলোটা জেলে ভালো ক'রে একবার দেখি তোমাকে।

মীনাক্ষী ব্যাকুল হয়ে তাকে চেপে ধরলো,—না, দেখতে দেবো না তোমাকে। বাইরের লোক দেখুক যত খুশি, তুমি দেখো না।

সে কি? কেন?

তোমার জন্য সাজিনি, কাঁকর। আমাকে বিশ্বাস করো, একটা নিতান্ত লোভের তাড়নায় আমার এ-দৈন্য। তোমার জন্যে সাজবো, এত বড় অসম্মান তোমাকে করতে পারব না।—এই ব'লে মীনাক্ষী পালঙ্ক থেকে নেমে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। চোখে তার জল এসেছিল শেষের দিকে।

কঙ্কর হাসিমুখে তার ছেলেমানুষীর দিকে চেয়ে রইল।

এর পরে আর এল না মীনাক্ষী কাছাকাছি, খেলো না একসঙ্গে, দাঁড়ালো না পাশাপাশি। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, মেজবৌদি, এ এক বিভ্রাট ঘটলো। কেমন ক'রে মুখ দেখাই বলুন ত?

মেজবৌদিদি মুখ টিপে বললেন, একবার সব দেখিয়ে এসো, তারপরেই সহজ হয়ে যাবে।

## আঁকা-বাঁকা

আপনি টের পাননি ঠাকুরপো এসেছে চুপি চুপি। আগে বুঝতে পারিনি, ধরা প'ড়ে গেলুম একেবারে হাতে-নাতে। ভাগ্যি ঘরে ছিল অন্ধকার, তাই তেমন ঠাহর করতে পারেনি। ঠাট্টা ক'রে যেই আলো জ্বালতে যাবে, অমনি পালিয়ে এলুম।—এই ব'লে মীনাক্ষী গদগদ কণ্ঠে হাসতে লাগলো।

তার ভাবান্তরটা বড় স্পষ্ট, কেমন যেন একটা ঢলঢলে ভাব। বাঙালী ঘরে স্বামীসোহাগিনীরা যেমন সাজসজ্জা ক'রে স্বামীর কাছে এলানো-মেলানো হয়ে ওঠে, মীনাক্ষী হয়ে উঠলো যেন তারই একটা ছায়া। রস-জরজর আলুলিত ভঙ্গী, যেমন স্বামীসোহাগিনীরা—যেমন তারা বিয়ের পরে স্বামী-ঠকানো একটা মদালসভঙ্গী আয়ত্ত করে, যেমন বিয়ের জল ভালো ক'রে পড়বার আগে তাদের চলনে-বচনে একটা অর্বাচীন চটুলতার প্রলাপ চোখে পড়ে,—সেই স্বামী-সোহাগিনীর রুগ্ন বিকার ভঙ্গীটা মীনাক্ষীর সর্বাঙ্গে উচ্ছলিত। এক চোখে প্রাণেশ্বর, অন্য চোখে প্রিয়তম,—যেমন নতুন স্বামীর চিঠি এলে স্বামী-সোহাগিনীর চক্ষু হয়ে ওঠে রসকল্পনায় ঢুলুঢুলু, যেমন চতুর ভাষাবিন্যাসের অন্তরে অন্তরে অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে তারা তপস্বিনী বিড়ালের মতো অলস গতিতে ঘুরে বেড়ায়,—ঠিক তেমনি একটা বিলোল বেহায়াপনায় মীনাক্ষীর গতিটা হোলো ক্লান্ত, ভঙ্গীটা হোলো রাজহংসীর একটা স্থূলভ অনুকরণ।

মেজবৌদিদি তাকে উলটে পালটে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুশী হয়ে বললেন, বেশ রোজগার ক'রে খাবার মতন চেহারা হয়েছে। খাসা! মনে করেছিলুম পারবে না তুমি। কিন্তু তুমিই পারবে ভাই। তুমি না পারলে আর কেউ পারবে না। মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত' দরকার।

স্বামীসোহাগিনীর মতো মীনাক্ষী হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কেমন একটা কষ্টে টানা হাসি, একটা অহেতুক বেহায়া হাসি,—মনোমোহিনীকে প্রকাশ করা যায় এমন একটা চেষ্টাকৃত খেলো হাসি মীনাক্ষী উদ্গীরণ ক'রে দিল।

মেজবৌদিদি মালীর হাতে দিয়ে কঙ্করের জন্য উপরে খাবার পাঠিয়ে দিলেন, তারপরে ট্রেনের সময় বুঝে ষোড়শ উপচারে স্বামীসোহাগিনীর হাত ধ'রে খাওয়াতে বসালেন।

যাবার সময় আসন্ন হয়ে এলো। মেজদাদা এসে উপর থেকে কঙ্করের কাছে বিদায় নিলেন। জানিয়ে গেলেন, ঠিকানা পেলে নিয়মিত তিনি বাড়ী-ভাড়া পাঠাবেন, এবং যতদিন তিনি এ বাড়ীতে আছেন ততদিন এ বাড়ীর স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তাঁর চলে যাবার পর মালী এসে ঘরে-ঘরে তালা লাগালো। কঙ্কর তার হাতে মোটা বকশিশ দিয়ে আদর ক'রে তার মাথায় একটা ঠোনা মারলো। মালী পায়ের ধূলো নিল।

মোটর এসে দাঁড়ালো ফটকের কাছে। মালী দুটো চামড়ার ব্যাগ নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিল। কঙ্কর বিদায় নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। মীনাক্ষী এলো মেজবৌদিদির হাত ধ'রে আড়ালে-আড়ালে। ঠাকুরপোর ঠাট্টাতামাসায় আজ তাকে গলায় দড়ি দিতে না হলে বাঁচি।

গাড়ীতে ওঠবার আগে মীনাক্ষী বিদায় সম্ভাষণ জানাবার চেষ্টা করতেই মেজবৌদিদির চেহারা গেল বদলে। তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললেন, এতবার ইঙ্গিত করলুম, কিন্তু আমাকে তোমরা বিশ্বাস করতে পারলে না ভাই?

সহসা মীনাক্ষী তাঁর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

সস্নেহ হাসিমুখে মেজবৌদিদি বললেন, আমাকে বোকা মনে করেছিলে, কিন্তু আমি যে জানতুম তোমরা ছেলেমানুষ! তোমাদের এই কৌতুক যদি মেনে নিতে না পারব তবে বয়সে বড হলুম কেন? আমার আশীর্বাদ রইল, একদিন যেন তোমাদের সব ভয়, সব সঙ্কোচ কেটে যায়। আসি ভাই।—এই ব'লে বিমূঢ় হতচকিত অপমানিত মীনাক্ষীর মুখের উপর দিয়ে তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

কঙ্কর পুনরায় গাড়ী থেকে নামলো। তারপর মীনাক্ষীকে টেনে গাড়ীর ভিতরে তুলে দিয়ে নিজে উঠে পাশে বসলো।

চলো, হাবড়া স্টেশন। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল।

মীনাক্ষী নিঃশব্দে খুললো মণিবন্ধ, আর বাহুবন্ধ কাঁকন আর গলার হার, চন্দ্রমালা আর ঝুমকো, সোনার টায়রা আর হীরকচন্দ্রতিলক,—সব অলঙ্কার খুলে সে রাখলো চামড়ার ব্যাগের মধ্যে ; তারপর কঙ্করের কোঁচার খুঁট তুলে নিজের মুখের রং আর পাউডার মুছে ফেললো। ঘষে ঘষে তুললো সিঁথির সিন্দুরের দাগ। শাড়ী আর জামা কেমন ক'রে ত্যাগ করা যায় তাই ভাবতে লাগলো।

কঙ্কর বললে, মেজবৌদি আমাদের জোচ্চুরি ধ'রে ফেলেছেন, এই ত? খুব সহজ, খুবই স্বাভাবিক। মেয়েদের চোখ বড় ভয়ঙ্কর, ওরা যা দেখে তার চেয়ে বেশি আবিষ্কার করে। তোমারো কিছু শিক্ষা হোলো। জীবনটা কেবলমাত্র উপন্যাস নয়, কিছু কিছু নাটকের অংশও এতে আছে! কি বলো, মীনু?

## দশ

কঠিন নির্বিকার মুখে মীনাক্ষী পথের দুই দিককার চলমান শহরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। কঙ্করের কথার জবাবে কেবল বললে, কাপড়ের দোকান দেখতে পেলে গাড়ী থামিয়ো।

থাক্ না আজকের মতন বেনারসীখানা পরণে—কঙ্কর হেসে বললে, তবু ত বন্ধুরা দেখলে খুশি হয়ে বলবে, ছোকরা অন্তত একদিনের জন্যও বিনামূল্যে একটা বউ পেয়েছে। দাও ঘোমটাটা মাথায় তুলে।

কিন্তু মীনাক্ষী শুনলো না, কাপড়ের দোকান দেখে সে গাড়ী থামালো।

কঙ্করকে বললে, যাও, একখানা মোটা চাদর আর যেমন-তেমন শাড়ী একখানা কিনে আনো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কঙ্কর শাড়ী আর চাদর এনে হাজির করলো। আবার গাড়ী ছেড়ে দিল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে কঙ্কর বললে, রাজপুতানীর ছদ্মবেশটা মানিয়েছিল ভাল। তবু মাথার দিকে চোখ পড়েনি! 'গলিত বেণী লোলনী'—এটা কিন্তু আমি খুলতে দেবো না।

কেন?—মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো।

ঘুমের ঘোরে তুলে নেবো বুকের পরে তোমার বেণী। স্বপ্নে দেখতে চাই, সাপ উঠছে গায়ে। মীনু, তোমার হঠাৎ পরিহাসবোধটা কমে গেল কেন বলো ত?

মীনাক্ষী এইবার বললে, একজন ভদ্রমেয়েকে প্রতারণা ক'রে এলুম, তার জন্যে তোমার অনুশোচনা নেই?

কঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠলো, চতুরের চাতুরী ধরা প'ড়ে গেছে, এই ত? বৌদিদি সেজে যখন বাড়ীতে ঢুকেছিলে, মনে ছিল না? বোকা ব'নে গেছ! একথা মনে রাখা ভালো, সংসারে আমরাই কেবলমাত্র বুদ্ধিমান নই। অনুশোচনা? কেন? জুয়া খেলতে যখন বসেছি, হার-জিতকে সমান আনন্দে নিতে হবে!

কিন্তু ছোট হয়ে গেলুম যে, কাঁকর?

ফাঁকি দিয়ে বড় হতে গিয়েছিলে কেন? সরল মনে স্বীকারোক্তি করোনি কেন যে, বৌদিদি, আমরা স্বামীস্ত্রীও নই, দেওর-ভাজও নই, আমরা হলুম গন্ধর্ব। পরোয়া করিনে কারো, আমরা শূন্যলোকে বিচরণ করি, মানুষের বিচারালয়ে আমরা কৈফিয়ৎ দিইনে।

মীনাক্ষী বললে, যদি ওঁরা ঘৃণা করতেন?

কঙ্কর বললে, মাথা পেতে নিতে। মানুষের শ্রদ্ধা আর ঘৃণা? দাম আছে কিছু? প্রতারণার দ্বারা শ্রদ্ধা পাওয়ার চেয়ে সততার দ্বারা ঘৃণা পাওয়া অনেক বড়, মীনাক্ষী। ডাকাতকে শ্রদ্ধা করা যায়, চোরের নোংরামি অতি ঘৃণ্য।

আমি বাইরের লোক।—মীনাক্ষী বললে, আমার সঙ্গে হয়ত ওদের আর দেখা হবে না। কিন্তু বাড়ীর ভাড়াটেদের কাছে তোমার চরিত্র যে কলঙ্কিত হোলো?

এইটুকুতেই যদি ওরা আমার চরিত্রের বিচার করে তবে অমন ভাড়াটে উঠিয়ে দেবো, ভয় নেই। মীনাক্ষী, একে কোনদিন অন্যায় মনে করো না, একে বলতে পারো স্বভাবের খেলা। যেটা সহজ, সেটা স্বাভাবিক, যেটা পৃথিবীর আবহমানকালের নিয়ম, তাকে বলব কলঙ্ক? সস্তা মন্ত্রপাঠের ছাড়পত্র পেয়ে যারা গার্হস্থ্যজীবনের অন্ধকূপের ভিতরে ব'সে অশ্লীল অসংযমে দিন কাটায় তারা হবে বড়, আর আমরা যারা বড় পটভূমির উপরে দাঁড়িয়ে জীবনকে বিচার করলুম, প্রাণের অলিগলি খুঁজে রত্ন উদ্ধার ক'রে বেড়ালুম—তারা হবে কলঙ্কিত? কেন ছাড়লুম পাঁজজনের সেবা নিয়ে থাকার আরাম, কেন তুমি ছেড়ে এলে ঘরের মায়া? টাকা পয়সার অভাব ছিল না, মদ খেয়ে জুয়া খেলে পতিতার আড্ডায় কিংবা পাঁচটা ভদ্রঘরের মেয়েকে নষ্ট ক'রে দিন কাটাতে পারতুম, চেহারাটাও ছিল তার যোগ্য,—আর তুমি শ্রীমতী মীনাক্ষী, তোমার দেহের আগুনে পোড়াতে পারতে অনেক পতঙ্গের ডানা, কিংবা পারতে হয়তো কোন ধনী পুত্রকে বিয়ে ক'রে পুত্রকন্যা নিয়ে বিলাসের জীবন-যাপন করতে,—কিন্তু কেন আমরা মানিনি সেই জীবনকে? কেন আমাদের এই অসন্তোষ, কেন এই নির্বিকার ভবঘুরে বৃত্তি? উত্তর দাও মীনাক্ষী?

মীনাক্ষী বললে, হয়ত এও একটা বিলাস, কাঁকর।

কঙ্কর বললে, বিলাস, কিন্তু স্বভাবধর্মের বিলাস। এ-ধর্মে নিধন হবো কিন্তু অন্য ধর্ম মানবো না। গার্হস্থ্যজীবনের বিরুদ্ধে আমি বিপ্লব ঘোষণা করিনি,

কিন্তু যে-জীবন কল্পনাবিহীন, স্বল্পে তুষ্ট, উচ্চাভিলাষশূন্য, যে-জীবনে তরঙ্গ নেই, আবর্ত নেই, বিপর্যয় নেই,—সেই জীবনের বিরুদ্ধেই আমার বিদ্রোহ ঘোষণা। আঘাত পেয়ে যে কাপুরুষরা কেবল কাঁদে, ব্যর্থতায় যে-মেরুদণ্ডহীন নুইয়ে পড়ে, দুঃখে যারা হয় হতশ্রী, তাদের আমি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না। মীনাক্ষী, আত্মীয়-পরিজন সন্তান-সন্ততি নিয়ে যারা পাঁচজনের মুখে অন্ন দিয়ে ভদ্রজীবন কাটায় তাদের আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু ভদ্রজীবনই একমাত্র জীবন নয়, দুঃখে দুর্গমে দুরন্তপনায় বৃহত্তর মানব-সংসারকে কেন্দ্র ক'রে যারা জীবনকে বিস্তৃতভাবে আস্বাদ করেনি তাদের আমি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা দিতে পারব না।

মীনাক্ষীর আর উত্তর দেওয়া হোলো না, হাবড়া স্টেশনে ঢুকে টিকেট ঘরের কাছে গাড়ী এসে দাঁড়ালো।

চামড়ার ব্যাগ দুটো এক কুলী নামিয়ে নিল। গাড়ী থেকে নেমে কঙ্কর মোটরভাড়া চুকিয়ে দিল। কুলী প্রশ্ন করলো, কোন্ গাড়ীতে তারা যাবে। কঙ্কর বললে, তুম্ লোক একটু বাদে আসোগে, ভেবে চিন্তে উত্তর দেগা।

মীনাক্ষী গিয়ে বাঁ হাতি মেয়েদের ওয়েটিং রুমে ঢুকলো এবং মিনিট পাঁচেক পরে সম্পূর্ণ ঘরোয়া মেয়ের সাজসজ্জায় বেরিয়ে এলো। চামড়ার ব্যাগ খুলে বেনারসীখানা তুলে রেখে দিল। বললে, বাঁচলুম, ভূত ছাড়লো এতক্ষণে।

কঙ্কর বললে, মানালো এবার। 'সবার পিছে, সবার নিচে, সব-হারাদের মাঝে।' কোথায় যাওয়া যায় বলো ত মিনু ?

মীনাক্ষী বললে, যেদিকে খুশি। টাকা আছে, সোনা আছে, স্বাস্থ্য আছে, আর বুকে আছে সাহস—যেদিকে খুশি চলো !

কোথাকার টিকিট কিনবো ?

দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আসাম—যে -কোনো দিকে।

সেই ভালো।—ব'লে কঙ্কর এগিয়ে গিয়ে দুখানা সেকেণ্ড ক্লাসের জিলুয়ার টিকিট কিনে নিয়ে এলো।

মীনাক্ষী বললে, লিলুয়ার টিকিট! করলে কি! এত দূরে যাবে?

কঙ্কর কৌতুক ক'রে বললে, সংসারে আর থাকবো না, বিবাগী হয়ে যাবো।

সেখানে কি কোনো আশ্রম আছে?

অদ্ভুত সেই দেশ! সেখানে সব পরীর দেশ! টাকায় আটমণ চাল? সেখানে বাঘে গরুতে জল খায়। কণ্বমুনির আশ্রম, সেখানে দেখা যাবে শকুন্তলাকে।

হাসি চেপে মীনাক্ষী বলল, চলো, সেই ভালো, আমি চাইবো দুষ্মন্তকে।

কুলীর মাথায় ব্যাগদুটো চাপিয়ে দুজনে প্লাটফরমের ভিতরে ঢুকলো। রাত সাড়ে দশটায় গাড়ী, গাড়ী ছাড়তে আর দেরি নেই।

ট্রেনের কামরার কাছে এসে মীনাক্ষী বললে, সত্যি, কোথায় যাচ্ছি বলো ত?

কোথায় যেতে চাও তুমি?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

সত্যি বলব?

মিথ্যেও বলতে পারো।

আমি চাই ভ্রমণ। রোজ ঘুম থেকে উঠে যেন দেখি নতুন দেশে আমি উপস্থিত। মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে থামবো, আবার চলবো। দেখতে দেখতে দেখা যেন না ফুরোয়।

আর কিছু নয়?

আরো কিছু।—লোকারণ্যের দিকে চেয়ে মীনাক্ষী জবাব দিল, আরো কিছু, কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা করে।

অকপটে বলো।

তাই বলবো। তোমার মতন একটা অদ্ভুত অবলম্বন। যার দায়িত্ববুদ্ধি নেই, ভালোমন্দ বিবেচনা নেই,—যার নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত স্বভাব কোনো দুর্গম, কোন বিপদকেই ভয় পায় না। তোমার নিভৃত সঙ্গ।

নমস্কার, কঙ্করবাবু।

কঙ্কর সহসা ফিরে দাঁড়ালো।

আরে, কঙ্করবাবু যে, কোথায় চলেছেন?

আপনিই কঙ্করবাবু? নমস্কার।

কি হে কঙ্কর? কদ্দূর?

কেমন আছিস কঙ্কর? অনেককাল পরে দেখা।

ওরে কঙ্কর, পাগলা, কোথায় পালাচ্ছিস?

ব্রাভো কঙ্কর, গুড্ ইভ্‌নিং।

গন্থ কবি, কঙ্কর? কেমন আছো বন্ধু?

দেখতে দেখতে একদল বন্ধু কঙ্করকে ঘিরে দাঁড়ালো। কঙ্কর তাদের সকলের প্রশ্নের একটা যেমন তেমন জবাব দিয়ে নিষ্কৃতি চাইলো। বললে, তোমরা, আপনারা সব কোথায় চলেছেন? সবাই ত দেখছি ছোট বড় মাঝারি সাহিত্যিকের পাল! যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

কাশীতে সাহিত্য-সম্মেলন। যাবি?

কঙ্কর বললে, সাহিত্যশাখাবিহারী কে?

ভুজঙ্গভূষণ ভঞ্জ।

ওরে বাবা, সেই দাঁত উঁচু মহাশয়? তান্ত্রিক সাহিত্যের সেই বামাচারী? দেখলে ভয় করে!

একজন সাপ্তাহিক সম্পাদক নিবেদন করলেন, আসুন না কাঁকরবাবু, আপনাকে পেলে বেশ—

একজন হাত ধ'রে টানলো। সবাই অনুরোধ জানাতে লাগলো। কঙ্কর বললে, আপনারা সবাই যাচ্ছেন?

নিশ্চয়। সেখানে যে এবার দক্ষযজ্ঞ। ভুজঙ্গ ভঞ্জের সাহিত্যিক অভিভাষণ—আধুনিক সাহিত্যের ধাপ্পা।

রবিঠাকুরের আশীর্বাদ পাওয়া গেছে ?

হ্যাঁ, দু'লাইন। বছর পাঁচেক আগে আদায় করা। 'তোমাদের সম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।'

খাওয়া দাওয়া কেমন ?

ওঃ আয়োজন প্রচুর। তাই জন্যেই ত এত ভীড়।

তরুণ সাহিত্যকে গালাগালি দেবে কে কে ?

ভূজঙ্গ ভঞ্জ, অনুকূল হাতী, যাদব মৌলিক, হরিকেশব হালদার, কুশল খাস্তগীর, করঞ্জাক্ষ কারফরমা,—সব বড় বড় রথী মহারথী। গদাযুদ্ধে ধূলো উড়বে খুব, মাথা নিয়ে সব বাড়ী ফিরলে হয়।

তবে দাঁড়ান্, আগে অনুমতি নিই।—এই ব'লে কঙ্কর গাড়ীর ভিতরে মুখ বাড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, মীনাক্ষী, আমাকে নিয়ে যাবার লোভ এদের কেন বুঝতে পেরেছ ?

ঠোঁট কেটে মীনাক্ষী চুপি চুপি বললে, তোমাকে নিয়ে গেলে আমারো সান্নিধ্য পাবে এই আশা। ওদের মধ্যে কবি আছে ক'জন ?

ওরা ত সবাই কবি-প্রতিভা !

তাহলে ত আমার আব্রু ঘুচিয়ে দেবে ! ছোট গল্প লেখক আছে কেউ ?

সকলেই।

তাহলে ত আমার শাড়ীর আঁচল নিয়ে কেচ্ছা লিখবে ! চরিত্রহীন আছে ক'জন ?

কঙ্কর বললে, বেচারিরা বড় গরীব, চরিত্রহীন হবার মতন পয়সা ওদের নেই। একটু আধটু নোংরামি করে মাত্র।

মুখোসটা ভদ্র ?—মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, সেইজন্যই বিপজ্জনক।

বেশ ত, চল না একটু মাতিয়ে তোলা যাক্।—ব'লে মীনাক্ষী গাড়ী থেকে

নেমে এলো। পিছনে অস্পষ্ট কানাকানি হ'তে লাগলো তার দেহটা আর রূপটা নিয়ে। চামড়ার ব্যাগ দুটো ব'য়ে নিয়ে চললো কঙ্করের দুটি ভক্ত মীনাক্ষীর মুখ চেয়ে। এমন অনুগত ভক্ত সংসারে বড দুর্লভ।

রিজার্ভকরা ইণ্টার ক্লাশ কামরা। স্ত্রীলোক আর দ্বিতীয় নেই, মীনাক্ষীই কেবল একমাত্র মক্ষিরাণী। গায়ে চাদর জড়ানো, মাথায় ঘোমটা,—কঙ্করের কাছ ছাড়া মীনাক্ষী আর কোথাও ঘোমটা খোলে না,—তবুও ওরই মধ্যে সাহিত্যিকের দল তৃষিত দৃষ্টিতে দেখে নিল, কালো চুলের বেণী তার রূপালী জরির ফিতায় আলিঙ্গনাবদ্ধ। কালো আকাশে বিজুরির দোলা। একজন নব্য কবি পেয়ে গেল কবিতার বিষয়বস্তু। চলন ভঙ্গীটা কেমন? বনহংসী?—একজন কবি তার দিকে তাকালো। ছোটগল্পলেখক ভাবলো, গজেন্দ্রগামিনী,—নাঃ তেমন স্থূলাঙ্গিনী নয়! বয়স কত জানা গেল না,—কাপড় দিয়ে মীনাক্ষী মুখ চেপে রইল। আগুন, একজন ভাবলো, কিন্তু চাদরে ঢাকা সর্বাঙ্গ, যা দেখলে নেশা ধরে তা দেখবার উপায় নেই! চরণ দু'খানি কবির বুকের রক্তে রাঙা; দুই কালো চোখে কবির অতলতলে তলিয়ে-যাওয়া মরণ! মীনাক্ষী মুড়িসুড়ি দিয়ে পা-দুখানা ঢেকে বেঞ্চের এক কোনে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। প্রতিজ্ঞা করলো, ওদিকে মুখ ফেরাবে না, গায়ের চাদর খুলবে না। দেবে না হাসির টুকরো, দেবে না আগুনের ফুল্‌কি!

বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

কঙ্কর জায়গা নিল সকলের মাঝখানে। অর্থাৎ যার সঙ্গে অমন বিচিত্র-রূপিণী, তাকে সকলের মাঝখানে ঠাঁই না দিলে প্রাণের তৃপ্তি নেই। রূপবতী তরুণী সঙ্গে থাকলে যেমন সম্ভ্রান্ত আসরে অহেতুক খাতির পাওয়া যায়, আই-সি-এস-স্বামীর সঙ্গে গেলে মেয়েমহলে যেমন মেয়েদের পদমর্যাদা বাড়ে। তেমনি ক'রে সাহিত্যিকের দল গদ্যকবি কঙ্করকে—কঙ্করের প্রতি তাদের গোপন ঈর্ষা, আক্রোশ এবং অবহেলা থাকলেও—তারা আদর ক'রে বসালো। একজন

কটাক্ষে মীনাক্ষীর দিকে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে এমন কথাও বললে, কঙ্কর, তোমার কবিতাগুলোর ওপর একটা প্রবন্ধ লিখবো ঠিক করেছি। ও মেয়েটি কে ভাই?

মীনাক্ষীর ওষ্ঠাধর একবারটি দেখতে পাওয়া গেল, যেন পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি! বয়স্ক সাহিত্যসমালোচক তখনই পুলকিত হয়ে বললে, কঙ্কর, 'জগজ্জ্যোতি' মাসিকপত্রে তোমার শেষ কবিতাটা প'ড়ে খুব আনন্দ পাওয়া গেল। অন্তত বুঝতে পারলুম গদ্যকবিতার একটা সম্ভাবনা আছে।

যারা সাহিত্যিক মহলে তার কুৎসা রটায়, যারা সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় খোঁচা মারে, তারাই আজ কঙ্করের সহযাত্রী। কিন্তু চাকাটা কোন্ পথে ঘুরলো সঠিক অনুধাবন করা কঠিন। তাকে ঘিরে একটা অন্ধ স্তাবকতা সুরু হয়ে গেল। যিনি অতিশয় অবহেলায় মৌখিক সৌজন্যে কঙ্করের রচনার উপর দীর্ঘকাল ধ'রে অভিভাবকত্ব ফলিয়ে এসেছেন, স্বয়ং সেই ধনঞ্জয় তলাপাত্র মীনাক্ষীর দিকে অলক্ষ্যে চেয়ে-চেয়ে কঙ্করের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

এদিকে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ সুরু হয়ে গেল। কবি-সাহিত্যিকদের বাচন-ভঙ্গী মীনাক্ষীর অস্তিত্বের স্পর্শদোষে দুষ্ট হোলো। কারো অতি-বিনয়, কারো বুদ্ধির খেলা, কারো বা কথায় ও কাজে চেষ্টাকৃত মননশীলতার পরিচয়—পরস্পর প্রতিযোগিতায় এমন প্রকট ক'রে তুললো যে মীনাক্ষীকে ফিরে চাইতে হোলো। মীনাক্ষীর জানবার চেষ্টা, তাদের জানাবার আয়োজন। মীনাক্ষী দৃষ্টিপাত ক'রে জানতে চাইল, এরা কোন্ জাতের জীব, আর ওরা জানাতে চাইল, আমরা সাধারণ মানুষের চেয়ে সরেস, সব জাতিগোত্রহীন, একদল মানব-ভাগ্যবিধাতা। বসন্তকাল শিউরে ওঠে আমাদের কলমের খোঁচায়, সাধারণ মেয়ে হয়ে ওঠে বিপ্লবী নায়িকা, কামুকতা হয়ে ওঠে প্রেম, আর জীবন হয়ে ওঠে অবাস্তব স্বপ্ন।

গাড়ী চলেছে, অন্ধকার রাত্রি ভেদ ক'রে। ট্রেনের গতি আর দোলা আর ভিতর-বাহিরের আলো-অন্ধকার মিলে কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্যিকদের মনে একটা

নেশা জাগিয়ে তুললো। কারো চক্ষে রসের আবেশ, কারো মাদকতা, কারো বোহেমিয়ান্ মন চলেছে ডানা মেলে দুই পাশের অরণ্য উত্তীর্ণ হয়ে, কেউ বসেছে গভীর কাব্য সমালোচনায়, কেউ জীবন ব্যাখ্যায়, কেউ বা মেতে উঠেছে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনার অতিরঞ্জনে।

মীনাক্ষী একটু নড়ে চড়ে বসলো। একখানা হাত বের ক'রে মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিল। হাতখানার নিটোল মসৃণ পেলবতায় ওদের পাড়ায় একটা মনস্তত্ত্বের আলোড়ন জেগে উঠলো। চন্দ্রের চক্রাবর্তনে সমুদ্রে যেমন দোলা লাগে জোয়ার ভাঁটার।

কবি শশীকান্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো, নবীন চাটুয্যে জামার বোতাম এঁটে দিল, হরিচরণ সরখেল মাথার চুলটা ঠিক ক'রে নিল, আর হেসে মুখ ফেরালো হলধর গুপ্ত। আর যিনি সর্বাপেক্ষা তরুণ, শ্রীমান্ অনিল রায়, তিনি প্রবল উৎসাহে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অনেকেই এখানে উপস্থিত, চলন্ত গাড়ীতেই আজ একটা সাহিত্য সম্মেলন হোক্ না?

মুখ ফিরিয়ে কঙ্কর বললে, বিষয়টা কি, অনিল বাবু?

ধরা যাক্ 'যুদ্ধপরবর্তী সাহিত্যের স্বরূপ।'

মীনাক্ষী ঠোঁট উল্‌টে হাসলো। কঙ্কর বললে, আপনার বক্তব্য প্রকাশ করুন, অনিলবাবু?

অপাঙ্গে শ্রীমান্ অনিল রায় তাকালেন মীনাক্ষীর হাসিমুখের প্রতি। নায়িকার মুখে সুধা-সঙ্কেত লক্ষ্য ক'রে তরুণ কথা-সাহিত্যিক শিখার মতো আলোকিত হয়ে উঠলো। বললে, আমরা ঠিক করেছি এখানে আপনিই হবেন বক্তা। আমরা সকলেই একমত।

অগ্রজপ্রতিম ধনঞ্জয় তলাপাত্র বললেন, দু'কথা বলই না হে কঙ্কর, শুনতে শুনতে ঘুমোই।

উঠে দাঁড়িয়ে কঙ্কর পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে নিল। মায়াবিনী মোহিনীর

দিকে একবার তাকালো চোরা চাহনীতে। অধরে হাসির রেখা, মাথার উপরকার প্রদীপ থেকে একঝলক আলো পড়েছে কপালের ভাঙা চুল বেয়ে সেই অধরের মরণ-তীর্থে—ওইটুকুই যথেষ্ট; একটা প্রমত্ত উৎসাহের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হোলো তার রক্তে রক্তে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী—কঙ্কর নিঃশব্দে মীনাক্ষীর অনুমতিজ্ঞাপক ইসারা পেয়ে আরম্ভ করলো,—যুদ্ধপরবর্তী সাহিত্যের মূলে তিনটি বিষয় বর্তমান। নব্য অর্থনীতিশাস্ত্র, সাম্যবাদ ও মনোবিশ্লেষণ। এই তিনটি বিষয় মানবলোকে এনেছে নতুন আবর্তন। গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রাচীন পৃথিবী জীবিত ছিল, তার মৃত্যুর পরে এসেছে নবজীবন। অর্থনীতিশাস্ত্রে দেখলুম পৃথিবী দুই দলে বিভক্ত—একদল ধনী, অন্য দল দরিদ্র; সাম্যবাদে পেলুম পৃথিবীর সমবেত সর্বসাধারণ,—তারা সকল শ্রেণীর শ্রমিক সম্প্রদায়, তারা চলেছে এক মহাসংগ্রামে, তাদের বিপক্ষে যারা ধনতন্ত্র-রাজকে অবলম্বন ক'রে জগতের ক্ষয় ও ক্ষতি আনছে পদে পদে; মনোবিশ্লেষণে পেলুম সংশয়, অবিশ্বাস, নাস্তিক্যবাদ, অশ্রদ্ধা। ধ্যান, ধারণা, নীতি, ধর্ম, প্রেম, মানবতা—একে একে সব বিপন্ন হোলো। বিজ্ঞানের প্রচণ্ড উন্নতির সঙ্গে এসে পড়লো পৃথিবীজোড়া নিরীশ্বরবাদ। ঘর ভাঙলো, সমাজ ভাঙলো, মন ভাঙলো। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, উড়ো জাহাজ, রেডিয়ো, টেলিভিশ্যন্, সিনেমা, মুদ্রাযন্ত্র, উগ্র জাতীয়তাবাদ,—সমস্তটায় আবিল হয়ে উঠলো সভ্যতা। জীবন হোলো দ্রুত, মরণ হোলো দ্রুততর। পৃথিবী ছিল বিশাল আর অনাবিষ্কৃত, এখন হয়েছে অতি ক্ষুদ্র, প্রায় গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। এই হোলো যুদ্ধপরবর্তী সাহিত্যের পটভূমি। আজ সাহিত্যসৃষ্টির নির্দিষ্ট কোনো পন্থা ও নীতি নেই, কারণ এই সব পরস্পর-বিরোধী জটিল আদর্শবাদের প্রবল সংঘর্ষে মানুষের মনে প্রতিদিন অনন্ত সমস্যা ও উদ্‌ভ্রান্ত চিন্তার বিড়ম্বনা দেখা দিচ্ছে। সাহিত্যের চিরন্তন নীতি, মানুষের আদিম রোমান্স্, নরনারীর চিরকালীন সম্পর্ক, সমাজের সুপ্রাচীন শৃঙ্খলা—আজ সমস্তই বিঘ্নসঙ্কুল। বন্ধুগণ, আধুনিক

ভারতবর্ষ ইউরোপের মন্ত্রশিষ্য। রাজনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, বিজ্ঞানবুদ্ধি, সামাজিক আদর্শ, ন্যায়নীতি বিচারের ধারা—সমস্তই সাগরপারের। কিন্তু গুরুর অবস্থা যখন অমন দিশাহারা, শিষ্যের অবস্থা তখন অতি কাহিল। মনোবিশ্লেষণ আর সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে আবার একটা প্রবল শক্তি, তারা হচ্ছে ধনতন্ত্ররাজেরই একটা হিংসাত্মক সংস্করণ, তাদের নাম ফাসিষ্ট। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি বারুদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—একদিকে অসন্তুষ্ট বঞ্চিতদের দল চাইছে মানব সাধারণের সমান অধিকারবাদ, আর অন্যদিকে ফাসিষ্টনীতি-প্রভাবান্বিত ধনিকতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার চাইছে পৃথিবীতে এক-কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা—এই দুইয়ের সংঘর্ষে জমে উঠছে প্রচণ্ড বিদারণ-শক্তি। আধুনিক সাহিত্যের অন্তরে সেইজন্য বীভৎস আবিলতার বাষ্প সঞ্চারিত হয়েছে। এরই ভিতর থেকে প্রাণীন পদার্থ তুলে নিতে হবে আধুনিক সাহিত্যিকদের। ভাবীকালের যে সকল প্রতিভা আজো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, তাদের রচনায় কেবলমাত্র দুঃখবাদ, নিরাশা, বেদনা, অপমানিত প্রেম, ভ্রান্ত ধর্মবুদ্ধি, উদ্‌ভ্রান্ত আদর্শ, জটিল সমস্যার আলোড়ন—ইত্যাদি বিষয় থাকবে না। তাদের বলবান জীবনের আদর্শবাদ জগতে আনবে শৃঙ্খলা ও শান্তি। আমাদের কঙ্কালের ওপরে তারা গ'ড়ে তুলবে নতুন মানব-সভ্যতা। যুদ্ধপরবর্তী সাহিত্যের প্রাণের ভিতর থেকে আমরা এই সঙ্কেত পাচ্ছি। প্রগতি সাহিত্যের পথ এই দিকেই।—এই ব'লে কঙ্কর ব'সে পডলো এবং মীনাক্ষীকে খুশি করার জন্য সাহিত্যিকের দল হাততালি দিয়ে উঠলো।

শ্রীমান্ অনিল রায় লাফিয়ে উঠে বললে, চমৎকার, অদ্ভুত, যুগান্তকারী! বামাচারী ভুজঙ্গভূষণের চেয়ে কঙ্করবাবুকেই সাহিত্য-শাখার সভাপতি করা উচিৎ ছিল। ধনঞ্জয়দা, আপনি কি বলেন?

প্রবীন ধনঞ্জয় নাকে নস্য দিয়ে বললেন, উঁ!

বক্তৃতা কেমন লাগলো আপনার?

নিজের মুখের উপর হাত বুলিয়ে ধনঞ্জয় তলাপাত্র বললেন, তা বলেছে বটে। হুঁ। মানে—কঙ্কর কিছু কিছু পড়াশুনা করেছে দেখছি। তা বেশ!

বেণা বনে মুক্তো!—মীনাক্ষী ঠোঁট উলটে হাসলো।

কঙ্কর বললে, খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়াশুনা করিনি, ধনঞ্জয়দা।

তার কথায় চাপা বিদ্রূপ মিশানো ছিল। কনিষ্ঠ সাহিত্যিকের দল হেসে উঠলো।

ট্রেন চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে। কতগুলো স্টেশন্ পার হয়ে গেছে জানা নেই। সাহিত্য সম্মেলনটা জমে উঠেছে মন্দ নয়।

কবি শশীকান্ত বললে, ভুজঙ্গ ভঞ্জের সভাপতির অভিভাষণটা কি নিয়ে লেখা জানেন, ধনঞ্জয়দা?

ধনঞ্জয় বললেন, খুব সম্ভব যারা ধাপ্পা দিয়ে বর্তমান সাহিত্যে বিখ্যাত হতে চায়, তাদের ওপর কটূক্তি!

আর যাদব মৌলিকের কিছু আছে?

আছে বৈ কি, তিনি বলবেন, আধুনিক সাহিত্যে দুর্নীতি।

সামাজিক, না যৌন-দুর্নীতি?

দুটোই। প্রাচীন সাহিত্যের শুচিতা আধুনিক লেখকরা মানে না। তারা অশ্লীল, অসংযত,—তাদের লেখা মা-বোনের হাতে তুলে দেওয়া যায় না,—এই বিষয় নিয়ে যাদববাবু আন্দোলন তুলবেন।

তাঁর পক্ষে উকীল কে-কে আছেন?

প্রধান হলেন আমাদের প্রসিদ্ধ সমালোচক বুল্-ডগ্ সাহেব। তিনি একাই যথেষ্ট।

শ্রীমান্ অনিল রায় আবেদন জানালেন, সাহিত্যে দুর্নীতি সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য একটু প্রকাশ করুন না?

কঙ্কর হাসিমুখে বললে, ওটা বিড়ালের কোঁদল। ওতে মেয়েরা আনন্দ পায়। ওটা মেয়েলি-তর্ক।

মীনাক্ষী হেসে মুখের উপর কাপড় চাপা দিল। কিন্তু উপস্থিত একজন ভদ্রমহিলার চরিত্রের উপর একটা আকস্মিক প্রতিফলনে সাহিত্যিকরা চমকে উঠলো।

নবীন চাটুয্যে বললে, আপনি কি বলতে চান মেয়েরাই এই আলোচনা তুলতে পারে ?

কঙ্কর বললে, আমি বলতে চাই নারীই নরকের দ্বার, অতএব ওর বিচারের ভার মেয়েদের হাতে থাকাই ভালো—পুরুষের অনেক কাজ আছে।—এই ব'লে সে মীনাক্ষীর দিকে কটাক্ষ করলো।

চাপা গলায় হরিচরণ সরখেল্ বললে, যদি আপনার সহচারিণীকে এই বিষয় কিছু বল্‌তে আমন্ত্রণ করি, আপনার আপত্তি হবে ?

বিন্দুমাত্র না।—কঙ্কর মীনাক্ষীকে আহ্বান ক'রে বললে, শ্রীযুক্তা সহচারিণী দেবী, সাহিত্যে দুর্নীতি সম্বন্ধে আপনাকে একটি আবেগময়ী বক্তৃতা দিতে হবে। আসুন।

দ্রুতগতিশীল সম্মেলন গৃহটি শুব্ধ হয়ে গেল। বিস্মিত-বিমূঢ় সাহিত্যিকের পাল হতবাক হয়ে দেখলো, তাদের কবিকল্পনা যেন প্রাণ পেয়ে উঠে এলো।

কঙ্কর বললে, আপনাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মীনাক্ষী দেবী, এম, এ। এঁর পেশা শিক্ষকতা, ইনিই বাংলা দেশে মন্টেসরী প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য বহু ইংরাজী কাগজপত্রে প্রবন্ধ লিখে থাকেন—অবশ্য বেনামিতে। ভারতবর্ষে সম্প্রতি চল্লিশ কোটি জনসংখ্যা দেখে ইনি আর সংসার করেন নি। এঁর এক পরিচয় হোলো ইনি একজন গোঁড়া সমাজতন্ত্রী, এঁর প্রকৃতির মধ্যে একটা সাম্যবাদের ইসারাও আছে; এঁর অন্য পরিচয় হোলো ইনি একজন সুগায়িকা, রবিঠাকুরের সাহিত্যের ভক্ত।

সুহাসিনী যুবতীমূর্তি দেখে ধনঞ্জয় তলাপাত্রের ভিতরেও যেন একটি জোয়ার এসে পৌঁছল। তিনি সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, কঙ্কর, তোমার মতন লক্ষ্মীছাড়াকে ওঁর সঙ্গে দেখলে একটু দুর্ভাবনা আসে।

হাসিমুখে মীনাক্ষী জবাব দিল, ভয় নেই আপনার, আমার চকচকে পরিচয়টা এতক্ষণ শুনলেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমিও অলক্ষ্মী!

সাহিত্যিকরা আর্তনাদ ক'রে উঠলো প্রাণের আনন্দে।

মীনাক্ষী আরম্ভ করলো—

প্রিয়বরেষু, এই সভার সভাপতি নেই সেজন্য ধন্যবাদ। এইমাত্র যিনি আমার প্রশস্তি উচ্চারণ করলেন তাঁকেও জানাই সাধুবাদ। মেয়েদের মনে বোধ হয় সাহিত্যিকের বাসা আছে, সেইজন্য সুখ্যাতি পেলে তৃপ্তি পায়, আর সাহিত্যিকদের মনে যে মেয়েমানুষের বাসা তার প্রমাণ, তারা ললিতকলার চর্চায় আনন্দ পায়। অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ভারতী—যিনি সতীত্বের আদর্শ মানেন না। সাহিত্যের দুর্নীতির মূল এইখানে।

হিয়ার হিয়ার—

মীনাক্ষী বললে, দুর্নীতি আর তথাকথিত অশ্লীলতাই সাহিত্যের প্রাণ। এই দুটিই সুন্দর হয়েছে যে প্রতিভার হাতে তাকেই আমরা বলি অপরাজেয় শিল্পী। রামের বউ রামের সঙ্গে ঘরকন্না করতে লাগলো, এই কথা বললেই গল্প মাটি কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি বললেন, না, রামের বউকে রাবণ নিয়ে পালালে তবে হয় সাহিত্য। দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুন ঘরকন্না করলে হয়ত মানানসই হোতো, কিন্তু বেদব্যাস বললেন, না, একটা মেয়েকে পাঁচজনে মিলে দখল করলে তবে লেখা যায় মহাভারত। আয়ান ঘোষের বিছানা ছেড়ে শ্রীমতী রাধা গেলেন যমুনার কূলে কুলত্যাগ ক'রে ব্যভিচার করতে—অমনি দুর্নীতির আনন্দে কীর্তন গেয়ে উঠলো সারা ভারত। হ্যাম্‌লেটের মা দেবরের সঙ্গে গেলেন দুর্নীতির তলায় তলিয়ে—অমনি সেক্‌সপীয়রকে সবাই প্রণাম জানালো। আরো আসুন

এগিয়ে একালে। নাম বলব না, কিন্তু চেয়ে দেখুন, যৌন-দুর্নীতির নিচেকার অশ্লীলতাকে যারা প্রশ্রয় দিয়েছে তারাই পেয়েছে দেশময় হাততালি। সবাই বলেছে, এই ত উঁচুদরের আর্ট। এর কারণ কি? এর কারণ স্বয়ং দেবী ভারতী দুর্নীতিপ্রিয়, এর কারণ মানব সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে রয়েছে চরম অশ্লীলতার বিশাল অগ্নিকুণ্ড—তার থেকে আপনাদের ভুজঙ্গ ভঞ্জ আর বুল-ডগ সাহেব কেউ বাদ যায় না।

হিয়ার, হিয়ার,—চমৎকার, আরো বলুন—

মীনাক্ষী বললে, প্রিয় সখাগণ, স্বামীস্ত্রী, অথবা মাতাপুত্র নিয়ে এক প্রকার অবজ্ঞাত সাহিত্য হয় বটে, নরনারীর স্থূল দেহকে নিয়েও এক প্রকার নোংরা সাহিত্য প্রচার করা যায়—কিন্তু এ দুয়ের স্থানই বটতলায়। নোংরা সাহিত্য সবাই লিখতে পারে কিন্তু দুর্নীতি সাহিত্য লিখতে প্রতিভার দরকার। নীতি প্রচার ক'রে সাহিত্যের সংস্কার করা যায় না, বরং রসের আদর্শ প্রচার করলে কাজ দেবে বেশী। মডেল্ কাছে থাকলে প্রতিমা গড়া সহজ হয়। একথা আপনারা জানেন উঁচুদরের দুর্নীতি আর অশ্লীলতাকে কেন্দ্র ক'রে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্ট সৃষ্টি হয়েছে—একথা স্বীকার করতে লজ্জা কিছু নেই। তবু আমি বলব এদের ব্যবহার করার একটা শিক্ষা ও যোগ্যতা আছে। একই বিষয়বস্তু—কিন্তু একটা যায় বটতলায়, অন্যটা যায় রসসাহিত্যের মণি-কোঠায়। বারুদ যারা ব্যবহার করতে জানে তারা অন্ধকার রাত্রে আকাশে ফুল ফোটায়, কিন্তু যারা জানে না তারা যায় হাত পুড়িয়ে হাসপাতালে। ভালো লাঠিয়ালের হাতে লাঠিখেলা দেখতে আনন্দ, কিন্তু কাঁচা হাতে হয় কেবল মাত্র লাঠালাঠি। বন্ধুগণ, দুর্বল কামুকতা দেখলে গা ঘিন্‌ঘিন্ করে, কিন্তু বলিষ্ঠ অশ্লীলতায় সমস্ত প্রাণ পুলকে সাড়া দিয়ে ওঠে।—এই ব'লে মক্ষিরাণী অশ্রান্ত করতালির মধ্যে স্বস্থানে গিয়ে বসে পড়লো। তরঙ্গ তুললো সাহিত্য সম্মেলনে, যেন জীবন-মরণ দুলিয়ে দিল।

ভক্তের দলে সুখ্যাতির আলোচনা সহজে থামতে চায় না, কারণ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী যুবতীর মতবাদের প্রতিবাদ করবার সাহস ওদের নেই।

*

* *

রাত দুটো বাজে, কিন্তু ঘুমলো না কেউ। ধনঞ্জয় তলাপাত্র নস্য নিয়ে ঝিমোতে লাগলেন, আর অন্যান্য সাহিত্যিকরা বারে বারে এদিকে তাকিয়ে মনে মনে বিপ্লবী নায়িকাকে দাঁড় করিয়ে গল্প ও কবিতা ভাবতে লাগলো। এটা একটা অভিজ্ঞতা বটে, তরুণীর মুখে দুর্নীতির পক্ষ সমর্থন, এটা তাদের অনেকেরই পক্ষে আন্‌কোরা অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাটা কেমন ক'রে কাজে খাটাবে, এই ভাবনায় তারা ভিতরে ভিতরে আন্দোলিত হ'তে লাগলো।

অর্ধমুদ্রিত চক্ষে এক সময়ে ধনঞ্জয় বললেন, সবই ত বুঝলুম কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না, বুঝলে হরিচরণ ?

হরিচরণ ফিস ফিস ক'রে বললে, এর বেশী বোঝবার কি আছে, ধনঞ্জয়দা ?

কি জানো হে, এই ধরো ওদের সম্পর্কটা—

আজ্ঞে, কঙ্করকে জানেনই ত আপনি,—সম্প্রতি আবার বাপের সম্পত্তিটা হাতে এসেছে। মানে, আমি বলতে চাই—

তুমি কি বলতে চাও জানি। তবে কি জানো ?—ব'লে ধনঞ্জয় অসীম ঔদাস্যসহকারে মুখের উপরকার সমস্ত ভাব অনুভাব গোপন ক'রে কানে-কানে বললেন, মেয়েটির কথাবার্তা যাই হোক, কিন্তু স্বভাব চরিত্রটা—

হরিচরণ বললে, বোধ হয় তেমন সুবিধে নয়।

ধনঞ্জয়ের ছোট ছোট চোখ একবার যেন জলজ্বল ক'রে উঠলো। তিনি বললেন, নাঃ, আমি ওসব সন্দেহ করিনে, তবে কি জানো—

কি বলুন ত ?

ওই ছোকরাকে আমি বড় স্নেহ করি হে।

স্নেহ যদি করেন তবে আপনি বেনামে সেই থিয়েটারী সাপ্তাহিকখানায় কঙ্করের ব্যক্তিগত নিন্দে লিখেছিলেন কেন ?—হরিচরণ প্রশ্ন করলো।

বোঝোনা কেন হে।—ধনঞ্জয় বললেন, স্নেহ করি বলেই ত শাসন করি।

কাগজে কুৎসা রটিয়ে শাসন, ধনঞ্জয়দা ?

অসীম ঔদার্যসহকারে ধনঞ্জয় তলাপাত্র বললেন, সত্য অপ্রীতিকর হ'লে চটো কেন তোমরা ?

হরিচরণ হেসে বললে, আপনার কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের চুরি করা থিসিস যখন কাগজে কাগজে ধরা পড়লো,—কই, আপনি ত তখন অপ্রীতিকব সত্য প্রকাশ করেননি ?

তোমরা বড় দাম্ভিক হয়ে উঠছো দিন দিন।—ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ধনঞ্জয় বললেন, বয়স না বাড়লে একথা বুঝবে না যে, যেখানে অন্ন বাঁধা সেখানে সাবধানে চলতে হয়।

হরিচরণ চুপ ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ধনঞ্জয় বললেন, ওরা এতক্ষণে গোলমাল থামালো দেখছি,—ওই যে, তরুণের দল ঘুমোবার চেষ্টা করছে। আচ্ছা হরিচরণ, তুমি কি মনে করো কঙ্কর ওকে বিয়ে করবে ?

হরিচরণ বললে, করা না করা ওদের পক্ষে একই কথা।

অবস্থা কি দাঁড়াবে ?—মানে, ভবিষ্যতের কথা বলছি।

আধুনিক কালে অর্থের সাচ্ছল্যই সামাজিক সমস্যার প্রতিবিধান করে।

কিন্তু ব্যক্তি-পরিচয় ?

টাকার জোরে সৃষ্টি হবে।

পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি ?

নতুন পরিবার গ'ড়ে উঠবে নতুন ব্যবস্থায়। বিলেত থেকে যে সব এদেশী অপোগণ্ড মেম বিয়ে ক'রে আনে তারা ঘরকন্না করে কি ভাবে, ধনঞ্জয়দা ?

বিয়ে ত বটে !

হরিচরণ বললে, সেটা যদি বিয়ে হয় এটা তার চেয়ে কম নয়।

ধনঞ্জয় চোখ বুজে চাপা গলায় বললেন, বুঝলুম, কিন্তু এতগুলো যুবকের সামনে কঙ্করকে দাঁড় করিয়ে অমন অশ্লীল ভাষায় মেয়েটি বক্তৃতা দিয়ে গেল কেমন ক'রে হরিচরণ ? এর ওপর আবার কঙ্কর দিলে প্রশ্রয় ? প্রণয়িণীর এই দুর্ধর্ষ দুর্নীতি কোনো প্রেমিক সহ্য করে ?

ওটা শিক্ষার পরিমাপ। আপনি হয়ত অতটা আলোকপ্রাপ্ত এখনো হননি তাই আপনার গায়ে বিঁধেছে।

নিজের মুখের উপর সহসা হাতখানা ঘষে সংশয় অবিশ্বাসের রেখাগুলি মুছে দিয়ে দাদা ধনঞ্জয় বললেন, কি জানো, সাহিত্যিক হয়ে আমার এই নোংরা কৌতূহল না থাকাই উচিৎ। কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে···মানে, তুমি কি বলো ?

হাসিমুখে হরিচরণ বললে, আপনি ধরা দিতে চান না, আমার মুখ দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে চান—কেমন ? মেয়েটি যদি সম্ভ্রান্ত সমাজের পতিতাও হয়, কিছু যায় আসে না—ওর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই সাহিত্যিকদের কল্পনার বিষয়বস্তু।

একটি মুহূর্তমাত্র সন্দেহ ও অশ্রদ্ধায় ধনঞ্জয়ের মুখখানা বিকৃত হোলো কিন্তু তারপরেই একমুখ হেসে তিনি হরিচরণের পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, তোরা আজকাল বড় দুষ্ট হয়ে যাচ্ছিস, হরিচরণ।

হরিচরণ হেসে উঠে বন্ধুদের মাঝখানে বসলো। মনে মনে কটাক্ষ ক'রে বললে, জানি তোমাকে ধনঞ্জয় তলাপাত্র !

ঘুম নেই মীনাক্ষীর চোখে, তন্দ্রার ছায়া পড়েনি কঙ্করের মুখে। মীনাক্ষী ওদের দিক থেকে পিছন ফিরে ব'সে তার সঙ্গে অনর্গল কথা কয়ে চলেছে। কথা তার ফুরোয় না, যেমন ফুরোয় না নদীর প্রবাহে উর্মিমালা। গাড়ী গমগম শব্দে তীরবেগে ছুটেছে। দুইধারে বনময় অন্ধকারে প্রেতকায় গাছের সারি

সন্ সন্ শব্দে চলেছে পিছন দিকে। দ্রুতগামী ট্রেনের দোলায় আর চাকার আর্তনাদে আর বাতাসের একটা দুরন্ত প্রলাপে মীনাক্ষীর অনর্গলতায় সঞ্চারিত হয়েছে একটা চঞ্চল প্রাণময়তা।

এদিকে ওরা একে একে কবিকল্পনার নেশায় ধীরে ধীরে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এলো। যাকে ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন, সে ত হাতের কাছেই রইল, দিনের আলোয় তার সঙ্গে হবে বোঝাপড়া—আজকের রাতটা আরামে ঘুমিয়ে নিলে বরং শরীর আর মুখের চেহারা আগামী কাল নারী-মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে। ধনঞ্জয় তাঁর নাকে শেষবার নস্য দিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুলেন, সাহিত্য সম্মেলনের বক্তৃতাটা মনে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে একসময় ঘুমিয়েও পড়লেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হরিচরণেরও নাক ডেকে উঠলো।

বসন্তকালের রাত্রি অল্পই বাকি ছিল, ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে তরুণ প্রভাতের আলো ফুটে উঠলো দিকদিগন্তে। বন্ধুরা জেগে উঠে পরস্পর তাকাতে লাগলো এদিক ওদিক—চোখে তাদের বিস্ময় ও কারুণ্য; তারা সহসা কলরব ক'রে উঠলো। সেই কলরবের মধ্যে ব্যাকুল হয়ে একসময়ে শ্রীমান্ অনিল রায় ধনঞ্জয়ের গা ঠেলে আর্তনাদ ক'রে উঠলো, উঠুন, উঠুন ধনঞ্জয়দা, ওদের কাণ্ডটা শুনেছেন ত? আশ্চর্য—অদ্ভুত!

কবি শশীকান্ত জড়িত বিস্ময়ে বললে, রাত্রে কখন নেমে কোথায় দুজনে চ'লে গেছে।

সাহিত্যরস প্রয়োগ করে মৌলিক বললে, অজানা দেশের দুস্তর অন্ধকারের দুর্গমে!

## এগারো

মনুভূমির সোনার চুলে কানাকানি ক'রে গেল
সাগরের হাওয়া,—
চেঙ্গিস খাঁ ঘোড়া ছোটালো মধ্য এশিয়ার বালুর ঝাপটায়
বেদুঈন মেয়ের হাতে খেজুরের মদ খেয়ে।
বাঘ পালালো অরণ্য থেকে আকাশের আষাঢ়ে,
গর্জন ক'রে ডাক দিয়ে বললে, আমার আত্মার সঙ্গে
পৃথিবীজয়ী হিটলারের আত্মীয়তা।
সিংহ তার লেজ কেটে বাঘের পূজা উপচার সাজিয়ে দিলে
বললে, পশুরাজ নই, শৃগালের অনুকরণ।

আমার ভিতরে এসে বাসা বাঁধলো সাগর পাখীর
অসহায় কলরব,
আর ঈগলের ডানার ঝাপট,
তার সঙ্গে বায়রণের শোচনীয় মরণের নিঃশব্দ
হৃদয়বিদারক কারুণ্য। অসুরের মৃত্যু!
আমি উঠলুম কেঁপে
গ্রামের শস্যের ভীরুতার গন্ধে
ভিজামাঠের পরে রোদপড়া নীল-বেগুনী মরীচিকায়—
আমি খুঁজে পেলুম ঈশ্বরের কঙ্কাল!
শীতার্ত দিনের পিঠ-এলানো রোদে উঠে এলো
আদিকালের মুনিঋষির ফসিল্।
ঝিলিমিলি ঝালর কাঁপছে নদীর আলোছায়ায়,
আমেরিকানরা ফিয়োর্ডের ধারে পাল তুলে
ব'সে গেল মাছ ধরতে।

## আকা-বাঁকা

মানুষের পূর্বপুরুষ উঠে এলো জালে
প্রবালের হাড়ের উপরে ব'সে গেল তাদের সভ্যতা
আর ঈর্ষা, আর মহানুভবতা,
ব'সে গেল প্রেম আর রক্ত চুষে খাওয়ার কেন্দ্র।
মুনিঋষির ফসিল্ উড়ছে আলোছায়ায়।

আমি ঘরে প'ড়ে আছি বীজমন্ত্র জপতে,
অহিংসা নয়, চেঙ্গিস খাঁ,
ঈশ্বরভীরুতায় আমার অশ্রদ্ধা আর বিরক্তি—
মন্দিরের ধূপের গন্ধে পেলুম উৎপীড়িত
মানবাত্মায় শেষ নিঃশ্বাসের ইসারা।
আর প্রেম আবিষ্কার করলুম কুঁড়ে ঘরে
হাবসী মেয়ের বোবা চোখে,
কদর্য মাংসপিণ্ডময় প্রণয়ীর অন্ধ, পঙ্গু অধরে—
বিষাক্ত বাষ্পের ছোঁয়ায় সে মৃত্যুর মতন ঠাণ্ডা।
বাৎসল্যের উদাহরণ
ফ্রাঙ্কোর রণক্ষেত্রে—
পুরুষের বেশে মা, বরফের হাওয়ার কণায়
আর দুস্তর মৃত্যুর প্রান্তরে
আর অন্ধকারে—
মা চলেছে বুকের তলায় প্রদীপ নিয়ে
মরণজয়ী সন্তানের শেষ দৃশ্যে!
সহসা প্রহরীর বুলেটের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হোলো ছদ্মবেশিনী মা!

ভারি সুবিধে হয়েছে তোমাদের, নয়?—মীনাক্ষী চোখ পাকিয়ে বললে, গদ্যকবিতা একেবারে রক্তবীজের মতন ছেয়ে গেল, ব্যাপারটা কি শুনি?

# আঁকা-বাঁকা

কঙ্কর বললে, গতিশীল গদ্যময় জীবনের ওপর কবিতার ছায়াপাত।

গদ্যকবিতা মানে কি ?

তেল আর জলের ঘন আলিঙ্গন।

ভারি সুবিধে ! মিল দেবার জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না, অক্ষর গোণবার হাঙ্গামা নেই, আর সব চেয়ে মজা,—চিন্তাসঙ্গতি মেনে চলবার বালাই নেই। খ্যাতির পথ অতি পরিষ্কার।—মীনাক্ষী বললে, বাঙ্গালা সাহিত্যে নতুন উৎপাত একটা লেগেই আছে।

আমার কবিতা তোমার কেমন লাগে, মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী কাছে এসে হেসে বললে, সত্যি বলব ?

নির্ভয়ে।

কবিতার চেয়ে তুমি অনেক মিষ্টি। তোমার কবিতা তাদের ভালো লাগুক যাদের জন্যে তুমি লেখো, কিন্তু আমি-যে পেলুম স্বয়ং কবিকে।

কঙ্কর বললে, শুনতে তেমন ভালো লাগলো না।

মীনাক্ষী বললে, গঙ্গার প্রবাহে অবগাহন করুক জনপদবাসীরা, কিন্তু সাক্ষাৎ গঙ্গোত্তরী যে আমার অধিকারে।

আলাপটা চলেছে বিহার প্রদেশের এক ক্ষুদ্র রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে। বেতমোড়া একখানা বেঞ্চের উপরে ঘুমিয়ে মীনাক্ষীর রাত কেটেছে, আর কঙ্কর শুয়েছিল টেবলটার উপর। সোনার গহনা আর নোটের তোড়াসুদ্ধ চামড়ার ব্যাগদুটো গাছতলায় পড়েছিল উপেক্ষিত। নির্দিষ্ট কোথাও যাবার তাগিদ নেই তাদের—নিশ্চিন্ত নিস্পৃহ দুজনে গা এলিয়ে ভোর থেকে ধরেছে কাব্যচর্চা।

অদ্ভুত লাগে ওয়েটিং রুম ! কত মানুষের আনাগোনা, কত অপরিচয়।—মীনাক্ষী বললে, আর দেখেছ ওই বুড়ো ওয়েটারকে—উদাসীন, নির্মম,—যেন একখানা প্রকাণ্ড হিসাবের খাতা।

কঙ্কর বললে, মহাকাল!

আর দেখো চেয়ে ঘরের সব আসবাবপত্রের দিকে। এদের গায়ে যেন শত সহস্র অশরীরি আত্মার ছায়া। একা থাকে যখন, কথা কয় পরস্পর।

এমন সময় একজন স্থানীয় কুলি এসে ঢুকলো। হিন্দুস্থানি ভাষায় প্রশ্ন করলো, আপলোক কিধর্ যায়েগা?

মীনাক্ষী বললে, নির্দিষ্ট কর্কে বলা কঠিন হ্যায়।

মাষ্টার সাব্ পুছ্তি হৈ।

কঙ্কর বললে, মাষ্টার সাব্কো জানায়কে দাও হামলোক পথভ্রান্ত তরুণ-তরুণী হ্যায়।

মীনাক্ষী হেসে ফেললো। বললে, কিছু কিছু পথ জান্তা হ্যায়। আচ্ছা কুলীজি, ইধর খাদ্যবস্তু কাঁহা মিলতা?

কৌন চীজ?

পুরি, ভাজি, মিঠাই, দুধ—

হম্‌নে লায়ে দেই?

বহুৎ মেহেরবানি, আনো দেখি কিছু খাবার। মীনু, পয়সা দাও।

পয়সা নিয়ে কুলী চ'লে গেল। মীনাক্ষী বললে, সত্যি, কোথায় যাওয়া যায় বলো ত।

কঙ্কর বললে, রবিঠাকুরকে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।'

মীনাক্ষী হেসে বললে, তিনি একথাও বলতেন, 'ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে।'

আচ্ছা, মীনাক্ষী,—কঙ্কর উৎসাহিত হয়ে বললে, বেশ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা যায় না?

সুন্দরের ধারণা এক একজনের এক এক রকম। তোমার কোন্‌টা?

কঙ্কর বললে, বলা কঠিন, কারণ জীবনটা হচ্ছে সকল রকম আদর্শেরই প্রতিবাদ। যিনি বললেন, 'ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে', তিনিই একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা-কেন্দ্রের জটিল কর্মব্যস্ততায় জীবনপাত করলেন। জীবনটা হচ্ছে কি জানো? বিপরীতমুখী বিভিন্ন কর্ম ও আদর্শের একটা তালগোল পাকানো বাণ্ডিল। কাজের সঙ্গে কথার মিল নেই, কথার সঙ্গে মনের মিল নেই, আর মনের সঙ্গে মিল নেই প্রাণের! জীবন একটা প্রকাণ্ড অসঙ্গতি আর অসমন্বয়ের তালিকা, এর ভিতরে কোথাও ঐক্য নেই, সরলতা নেই, কোথাও সুস্পষ্ট পথের ইঙ্গিত নেই।

এমন সময় স্টেশন মাস্টার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

কি চান্?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

মুখের রেখায় দেখা গেল তিনি বাঙালী। প্রশ্ন করলেন, আপনারা কোথায় যাবেন?

কঙ্কর বললে, ভ্রমণে বেরিয়েছি সুতরাং যেখানে-সেখানে যেতে পারি।

তিনি বললেন, ভ্রমণের পক্ষে এদিকটা অবশ্য মন্দ নয়, জল-হাওয়াও ভালো। পশ্চিম দিকে গেলে গয়া জেলা পাওয়া যায়, পূর্বদিকে শোন নদী, আর উত্তরে জঙ্গল। আপনারা মোটরবাসে যাবেন ত?

তার কোনো মানে নেই।—কঙ্কর বললে, গাড়ী পেলেও খুশী হবো।

গরুর গাড়ী?—মাস্টার মশায় দুজনের আপাদমস্তক তাকালেন, তারপর হেসে বললেন, আপনারা কেন গরুর গাড়ীতে চড়তে যাবেন?

মীনাক্ষী বললে, ক্ষতি কি মাস্টার মশাই? ফেরবার অথবা পৌছবার কোনো তাড়া নেই,—তাছাড়া ভ্রমণটা আস্তে আস্তে হওয়াই ভালো। হেঁটে গেলেও মন্দ হয় না।

তাই কি হয়, কষ্ট হবে আপনাদের। আচ্ছা, বলুন ত, এখন আপনারা কোন্ দিকে যাবেন?

কঙ্কর বললে, কিছুকাল বাস করবার মতন জায়গা এদিকে কোথাও আছে ?

মাস্টার মশায় বললেন, আপনাদের যোগ্য জায়গা,—এই ধরুন, স্টেশন ছাড়িয়ে গেলেই আর ত কোথাও কিছু পাওয়া যায় না। বাজার হাট কোথাও কিছু নেই, এমন একটি লোকও দেখতে পাবেন না যার সঙ্গে আলাপ করা চলে। হ্যাঁ, যদি যান্ শোন নদীর দিকে, সে প্রায় ত্রিশ মাইল, তাহলে একটা ছোট হাট দেখতে পাওয়া যায়। আজ শনিবার, সোমবার সেখানে হাট বসবে। যাবেন সেদিকে ? পথটা কিন্তু খুব ভালো নয়।

অর্থাৎ ?

বুঝলেন না, বিদেশী আপনারা, এদিককার লোক দরিদ্র, রাত ভিত, রাস্তাও খারাপ,—ভুট্টার ক্ষেত, বালি-নদী—এসব পার হয়ে যেতে হবে।

মীনাক্ষী বললে, মাস্টার মশাই, আপনি একখানা গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দিন, শোন নদীর রাস্তাতেই আমরা যাবো।

মাস্টার মশায় হতচকিত বিস্ময়ে এই দুঃসাহসিকার প্রতি একবার তাকালেন। এ-মেয়ে বাঙ্গালী, কিংবা ভারতীয়া—একথা বিশ্বাস করতে বাধে। অশ্রদ্ধা-সহকারে এর প্রশংসা করতে ইচ্ছা করে। মেয়েটির প্রতি তাঁর মন যেন বিরূপ হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর ভাবান্তর দমন ক'রে কঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারো কি তাই মত ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—কঙ্কর জবাব দিল। বললে, সকল রকম সুখ-সুবিধের খোঁজ নিয়ে তারিখ হিসেব ক'রে যারা ভ্রমণে বেরোয় আমরা তাদের মতন নই। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ওই ব্যবস্থাই ক'রে দিন্।

আপনাদের সঙ্গে বিছানাপত্র কই ?

কঙ্কর তাকালো মীনাক্ষীর প্রতি, আর মীনাক্ষী তাকালো কঙ্করের চোখে। চলবার কথাটাই তারা ভাবে, শয়নের সমস্যাটা তাদের মনে আসে না। কিন্তু বহুবার বহু অসুবিধাজনক অবস্থায় তারা যে কল্পনাশীলতার পরিচয় দিয়ে

এসেছে, এখানেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। দুজনে প্রথমে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। তারপর কঙ্কর বললে, সে কথা আর প্রকাশ না করাই ভালো, মাস্টার মশাই। এক মিনিট থাকতে এসে পৌছলুম হাবড়া স্টেশনে, তাড়াতাড়ি ব্যাগদুটোর কথাই মনে ছিল, বিছানার বাণ্ডিলটা কোথায় যে সট্‌কান দিলে, ধরতেই পারলুম না। লগেজের ভাড়া দেবার ভয়ে বিছানার মধ্যে রান্নার বাসনগুলোও লুকিয়ে এনেছিলুম—সে দুঃখের কথা আর বলবেন না।

এমন ঘটনা খুবই সচরাচর। মাস্টার মশায় বিশ্বাস করলেন।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির প্রতি অহেতুক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারায় ও তাদের কিছু উপকারে আসায় একটু আনন্দ আছে। মাস্টার মশায় বললেন, আচ্ছা, আমি গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। পৌছতে একদিন আর একবেলা লাগবে। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি আপনাদের কিছু সাহায্য করতে পারি। আমার বাসা এই কাছেই।

আপনি কি এখানে সপরিবারে থাকেন?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

হ্যাঁ, তা একরকম বৈ কি। রাত জেগে গাড়ীতে এসেছেন, আপনারা বাঙ্গালী, আসুন না আমার ওখানে একটু বিশ্রাম ক'রে যাবেন?

গেলেই ত আপনি খাওয়াতে চাইবেন মাস্টার মশাই?

সেটা কি এতই অন্যায় হবে? আপনাদের সঙ্গে রান্না-বান্নার আয়োজন নেই, বিছানাপত্র নেই,—এই বেপোট্ দেশ, আপনাদের ছেড়েই বা দিই কেমন ক'রে? এলে আমি খুব খুশী হতুম।

কোট-প্যাণ্টপরা টুপি মাথায় দেওয়া রেলকর্মচারী ছাড়া এঁকে এতক্ষণ আর কিছু মনে হয়নি। মীনাক্ষী সহসা মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকালো। যুবক নয়, প্রৌঢ়ও নয়,—অথচ বয়সটা ঠিক ঠাহর করা যায় না। রংটা ফর্সা কিন্তু স্বাস্থ্যশ্রী কম। শরীরের হাড়গুলি চওড়া কিন্তু মুখখানা কেমন যেন শীর্ণ, কিছুটা রক্তহীন। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এইবার দেখা গেল, শাদা ময়লা জিনের

কোটের উল্‌টো ঘরায় ছাপমারা পিতলের বোতামগুলো লাগানো। এমন অনবধানতা স্টেশন মাস্টারের পক্ষে শোভন নয়।

কি বলো তুমি?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

নারীর আদিম কৌতূহল জানবার বাসনায় কথা ক'য়ে উঠলো। মীনাক্ষী বললে, চলো, যাওয়াই যাক্।

কিন্তু ইতিমধ্যে যদি আপনার গাড়ী আসে?

একটা মেল্ পাস্ করবে দুপুরবেলায়—তার জন্য আমার য়্যাসিস্ট্যাণ্ট আছেন। চারটে-পঁচিশের প্যাশেন্‌জারটা আমি য়্যাটেণ্ড্ করব, এবেলায় আমার ছুটি। আসুন তাহলে?

এমন সময় আগেকার কুলিটা খাবার নিয়ে এলো। মাস্টার মশায় বললেন, ডেরামে লে চলো।

ওরা দুজনে উঠে অগ্রসর হোলো। মীনাক্ষী খাবারের ঠোঙ্গাটা হাতে নিল। কুলী মাথায় নিল ব্যাগ দুটো। অপ্রত্যাশিত অপ্রার্থিত আতিথ্য জুটে গেল অজানা পথে। স্টেশন পেরিয়ে মাস্টার মশায় দুজনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। স্টেশনকে কেন্দ্র ক'রেই আশপাশে সামান্য একটা বিহারী পল্লী। তারই একান্তে রেল কোম্পানীর একটি পাকা বাসায় সবাই গিয়ে উঠলো।

*

* *

ভিতরে মাটির উঠানে আর দালানে তিন চারিটি ছেলেমেয়ে হুটো-পাটি করছিল, সহসা নবাগত দুজনকে দেখে তারা বিদ্যুদ্বেগে কে-কোথায় পালালো। মাস্টার মশায় পথ দেখিয়ে তাদের ভিতরে আনলেন।

মীনাক্ষী বললে, ওদের মা কই, মাস্টার মশায়?

মাস্টার মশায় সবিনয় হাস্যে জবাব দিলেন, আগে বিশ্রাম করুন, সবই দেখবেন একে একে।

অপরিচিত জায়গা, অপরিচিত মানুষ সুতরাং কথা না বাড়িয়ে মীনাক্ষী

চুপ ক'রে গেল। মাস্টার মশায় তাড়াতাড়ি একখানা সতরঞ্চি পেতে দিলেন, আর কুলীটা ব্যাগ দুটো এক জায়গায় নামিয়ে রেখে অদূরবর্তী কুয়া থেকে দু'বালতি জল এনে দিল।

আপনারা বসুন, আমি চা পাঠিয়ে দিই। ওরে সুখন্, হাত ধুয়ে চায়ের জায়গা ক'রে দে।

দশ মিনিটের মধ্যেই কোন্ অলক্ষ্য রান্নাঘর থেকে গরম চা এসে পৌছল দু' পেয়ালা। মীনাক্ষী বললে, মাস্টার মশাই, খাবারগুলো আমি ছেলে-পিলেদের হাতে দিতে চাই।

মাস্টার মশায় বললেন, নতুন মানুষ দেখে ওরা ভয়ে পালিয়েছে। ডাকলে এখন কিছুতেই আসবে না।

ওরা সব ক'টিই আপনার ছেলেমেয়ে ত?

নতমস্তকে তিনি জবাব দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একরকম বলতে পারেন বৈ কি।

কঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে, এ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে আপনার?

মাস্টার মশায় তাদের হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না, অসহায় অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চেয়ে একটু থতিয়ে তিনি বললেন, নাঃ—সন্দেহ আর কি বলুন।

তাঁর কষ্টক্লিষ্ট জবাবে ওদের মুখের হাসি থেমে গেল। চায়ের পেয়ালার দিকে চেয়ে মীনাক্ষী বললে, তাহলে খাবারগুলো আপনিই হাতে ক'রে ওদের দিয়ে দিন্।

আপনারা খাবেন না কিছু ওর থেকে?

এমন সময় দুই হাতে ডিমভাজা আর পাঁপরভাজা নিয়ে কুলীটা এসে মাটিতে নামালো। খুশি হয়ে কঙ্কর বললে, আমাদের এতেই হবে, খাবারে আর দরকার নেই। আপনি ওদের দিয়েই দিন্।

মাস্টার মশায় বললেন, তুলে নে রে সুখন, লেড়কা-লেড়কিকো বট্ দেও। সুখন্ কুলী নয়, আমারই চাকর, তবে যাত্রীদের মোট বয়ে দু'চার আনা রোজগার করে। বাসন কোসন অবশ্য মাজে না। আপনাদের চা খাওয়া হ'লে এই ঘরে আসবেন, এইটেই একরকম বাইরের ঘর। সুখন্ থাকুক এখানে, সব আপনাদের দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি একটু স্টেশন থেকে—

হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ ত।

মাস্টার মশায় বেরিয়ে গেলেন।

আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা ক'রেও ছেলেমেয়েগুলোকে আর দেখতে পাওয়া গেল না, তারা একেবারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। অগত্যা দুজনে উঠে ঘরে গেল, ঘরের ভিতরেই সুখন্ ব্যাগ দুটো রেখে এলো। ঘরের ভিতরে কড়িকাঠ পর্যন্ত একটা কাঠের পার্টিশন, এবং পার্টিশনের অপরদিকে যে রান্নাঘর এতে আর সন্দেহ রইল না। কড়া-খুন্তি, থালা-গেলাসের আওয়াজে মীনাক্ষীর বুঝতে বাকি রইল না যে, তাড়াতাড়ি রান্না চড়ানো হচ্ছে। কিন্তু অভিমান ক'রে লাভ নেই, মাস্টার মশায় নিজে থেকে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না, বাড়ীর গৃহিণীও স্বেচ্ছায় রইলেন আত্মগোপন ক'রে, এমন অবস্থায় কৌতূহল প্রকাশ করা সামাজিক অসৌজন্য,—এবং যে-কারণেই হোক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে যারা নারাজ, তাদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্যটা নিতান্তই বেমানান। মীনাক্ষী নীরবে একে স্বীকার ক'রে নিল। কঙ্কর চুপি চুপি বললে, খাওয়া দাওয়া সেরেই বেরিয়ে পড়বো ত?

রাগ ক'রে মীনাক্ষী জবাব দিল, তবে না ত কি মাস্টারের গিন্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ করবে ব'সে ব'সে?

বউটার চেহারাটাও ত দেখা হোলো না।

মানে?

মানে—পরকীয়া সম্পর্কের যোগ্য কিনা—

চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তা জানো ?

'এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে!' স্ত্রীলোক কোন বয়সেই উপেক্ষার যোগ্য নয়।

আমি তবে মাস্টারকে ধরি ?

ধরেই ত এলে তার বাড়ীতে!

আমার সতীত্বের প্রতি তোমার এ কটাক্ষ সহ্য করব না।

আমার লাম্পট্যের প্রতি তুমি প্রথমে কটাক্ষ করেছ।

মীনাক্ষী বললে, আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধালে বউটা। ওর দেমাক আমার অসহ্য।

কঙ্কর বললে, তোমার সহ্যশক্তির দিকে চেয়ে উনি দেমাকের ছাঁচ গড়েন নি। আমি ওঁর দলে।

হেসে মীনাক্ষী বললে, চুপ চুপ, শুনতে পাবে, করো কি ?

বেলা এগারোটা লাগাৎ মাস্টার মশায় ফিরে এলেন। এসে দেখলেন অতিথিদের স্নান হয়ে গেছে। মীনাক্ষী চেয়ে দেখলো, এবারে তাঁর সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর বেশ। পরণে ধুতি, গেঞ্জী! সে বললে, আপনিও স্নান করুন, মাস্টার মশাই।

এই যে, আর একটু। আপনাদের বড় কষ্ট হোলো

কঙ্কর বললে, নিশ্চিন্ত থাকুন, ডিম আর পাঁপর এখনও হজম হয়নি।

তিনি সবিনয়ে বললেন, আপনারা ঘরেই থাকুন দয়া ক'রে, নৈলে ছেলে-মেয়েগুলো কিছুতেই কাছে আসবে না। আমি ওদের চান করিয়ে দিই।

বেশ ত, আমরা ঘরেই আছি। বরং দরজাটা ভেজিয়ে রাখি।—এই ব'লে মীনাক্ষী সত্যসত্যই দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

দরজা বন্ধ হোলো বটে, কিন্তু রান্নাঘরের দিকে কান পেতে ওরা নিভৃত আলাপ সম্বন্ধে সংযম ক'রে রইল। সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে ওরা বেমানান, সেইজন্য নির্জন মাঠে ঘাটে মানুষের নাগালের বাইরে ওদের মন খোলে ভালো। এমন মনে করা যেতে পারে, ওরা ঘরজীবী মানুষ নয়, চলা বন্ধ হ'লে ওদের প্রাণের মধ্যে আবর্জনা জমতে থাকে, আর চলতে চলতে ওরা খুঁজে পায় নিজেদের, থামলেই ওরা চমকে ওঠে।

তক্তার উপরে গা এলিয়ে মীনাক্ষী বললে, লোকজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালে ভয় করে কেন বলো ত ?

কঙ্কর তার একখানা হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে বললে, পাপ মন তোমার।

ওহে পুণ্যাত্মা, দাম কিছু দিতেই হয় মনে রেখো। সত্যি বলছি, তৃতীয় ব্যক্তি এসে দাঁড়ালেই নিজেদের দিকে চোখ পড়ে। কে আমরা? কী আমরা ?

কবিত্ব ক'রে কঙ্কর বললে,—'আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হ'তে।—তুমি এত রবিঠাকুরের ভক্ত, আর তাঁর কাব্য থেকে প্রয়োজন মতো কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওনা ?

বুঝলুম। কিন্তু এরা আমাদের জন্যে কী ওষুধ বাৎলাবে বলো দেখি ?

কি ?

মীনাক্ষী বললে, লাঠ্যৌষধি !

কঙ্কর হেসে উঠলো। তারপর বললে, আচ্ছা তুমি কি চাও বলো।

মীনাক্ষী বললে, 'ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে।'

আমাকে নিয়ে, না বাদ দিয়ে ?

যে-হাতের উপরে কঙ্করের মাথাটা শোয়া ছিল, সেই হাতেই মীনাক্ষী কঙ্করের মাথাটা জড়িয়ে ধ'রে বললে, 'ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা।'

বুঝলুম, অর্থাৎ আমিও থাকবো। কিন্তু কবিতাটার মধ্যেই যে রয়েছে, 'এতটুকু বাসা!' তার মানে কি জানো? তার মানে হচ্ছে, ধোবার ফর্দ, গয়নার হিসেব, মুদির পাওনা, আর কচি ছেলের তড়কা হওয়ার জন্ম ডাক্তারের বাড়ী ছুটোছুটি।

পারবো না, পারবো না। তার চেয়ে ছেড়ে দিয়ো, কেঁদে বাঁচবো। ঘর বড় ভয়ানক। মীনাক্ষী উত্তেজিত হয়ে বললো।

কঙ্কর বললে, আমি বলি তার চেয়ে একটু কবিত্ব ক'রে জীবনটাকে উড়িয়ে দেওয়া যাক!

সেটা কেমনতরো?

হালকা সুরের কথা ক'রে হালকা চালে চ'লে। একটা খুব গুরুগম্ভীর জীবন যাপন করা চলবে না, মীনাক্ষী। কাজের জীবনটাই অকেজো, চোখে ঠুলি বেঁধে বলদের মতন ঘোরা।

মীনাক্ষী বললে, কিন্তু মৌমাছিরাও ত গড়ে মধুচক্র, কাঁকর?

ওটা তাদের গুনগুনানির আনন্দে। একদিন তারাও মধু খেয়ে পালায় পূর্ণিমার রাত্রে—নেশায় ঢুলু ঢুলু ঘোরে জ্যোৎস্নায়।

আর মক্ষিরাণী?

উড়ে যায় নিরুদ্দেশ শূন্যে সেই মায়াবিনী; খুঁজে বেড়ায় নতুন চক্রসৃষ্টির বিচিত্র পথ।

তাহলে মক্ষিরাণীর হৃদয়ের বালাই নেই?

হৃদয় থাকে পুরুষের, মেয়েদের থাকে প্রকৃতি।

অনেক কথার মাঝখানে দরজায় শব্দ হোলো। মীনাক্ষী ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো। বাইরে থেকে মাস্টার মশায় জানালেন, এবার আসুন আপনারা, আসন পাতা হয়েছে।

আজ্ঞে যাই।—মীনাক্ষী সাড়া দিল। তারপর দুজনেই বেরিয়ে এলো।

ষোড়শ উপচারে তিনটি থালা সাজানো হয়েছে। যার হাতে এমন নিখুঁত থালা সাজানো, দুঃখের বিষয় সেই দুখানি অন্নপূর্ণার হাত আগোচরেই র'য়ে গেল। কিন্তু আসন তিনখানির দিকে চেয়ে মীনাক্ষী হাসি সংবরণ করলো। একখানি ছিন্ন সতরঞ্চির টুকরো, দ্বিতীয়খানি ঘরের জানলার একপাটি পাল্লা, এবং তৃতীয়খানি কোন্ এক দৈনিক সংবাদপত্রের একটি পাতা।

মাস্টার মশায় বললেন, এত রোদ, সেইজন্যে দুধের চেয়ে দই আপনাদের জন্যে বন্দোবস্ত করেছি। আর ওটা এখানকারই মেঠাই, ছানার চেয়ে এদিকে ক্ষীরের চলন বেশী। মাছ, মাংস, ডিম—যা খুশি আপনারা খান্। আর কলাইয়ের ডাল খেলে আপনাদের শরীর ঠাণ্ডা হবে। ওখানে কলা, নেবু, চিনি রয়েছে, ভুলবেন না যেন।

মীনাক্ষী বললে, এই অল্প সময়ের মধ্যে এত আয়োজন দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কঙ্কর বললে, এরই নাম লক্ষীশ্রী।

মাস্টার মশায় বালকের মতো হেসে উঠলেন, লক্ষীশ্রী কা'কে বলে আমি জানিনে।

দুজনে সহসা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালো। কথাবার্তার ভিতরে সকাল থেকে বিশেষ একটি প্রশ্ন যেন তিনি বরাবরই এড়িয়ে চলেছেন। তাঁর সকৌতুক হাসির মধ্যে যেন একটা সুদূর বেদনার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি হাসিমুখে মাথা নীচু ক'রে খেয়ে যেতে লাগলেন, কথাটা আর বাড়ালেন না।

ছেলেমেয়েদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরা কেউ কাছে এলো না কিন্তু।

সেকথা আর বলবেন না।—মাস্টার মশায় বললেন, মনে করেছে আপনারা

বাঘ-ভালুক। চুপি চুপি খাওয়া দাওয়ার পর বাঁশবাগানে পালিয়েছে। আপনারা গেলে তবে বাড়ী ঢুকবে।

দুজনে হাসলো। খেতে খেতে কঙ্কর বললে, আমাদের গাড়ীর ব্যবস্থা কি করেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, এখুনি তারা বয়েল্-গাড়ী নিয়ে এলো ব'লে। যদি একদিন থাকতে চান্ অসুবিধে নেই, আর যদি যেতেই হয় তবে আপনাদের এখুনিই বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমাদের এখনি যেতে হবে মাস্টার মশাই। আপনার নিঃস্বার্থ আতিথেয়তায় আমরা সত্যই অভিভূত। আমরা আপনার স্মৃতি সগৌরবে বহন করব।

আহারাদির পরে সুখন পান-সুপুরি ইত্যাদি এনে দিল। মাস্টার মশায় বললেন, আপনারা একটু বিশ্রাম ক'রে নিন, এখুনি গাড়ী আসবে। ওরে সুখন, ওঁদের কাপড়গুলো পাট ক'রে গুছিয়ে দে। আপনারা ঘরে গিয়ে প্রস্তুত হোন্ আমি এখনি আসছি, একসঙ্গেই বেরোনো যাবে।—এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

ঘরে এসে পান চিবোতে চিবোতে কঙ্কর বললে, মীনাক্ষী, এইখানে আজ হোলো তোমার পরাজয়।

গায়ে জামাটা পরবার জন্য মীনাক্ষী দরজাটা ভেজিয়ে দিল। পরে বললে, কেন?

তোমার অহঙ্কার ছিলো কারো কিছু গ্রহণ করবে না। আজ এখান থেকে তুমি নিয়েই চললে, দিয়ে যেতে পারলে না কিছু।

মীনাক্ষী বললে, যা দিয়ে যেতে পারলুম সেটাকে তুমি সামান্য ব'লো না, কঙ্কর। কিছু জানতে চাইলে না, কিছু বলতে চাইলে না, অথচ পরিচ্ছন্ন আন্তরিকতায় সেবাই ক'রে গেল—আশ্চর্য!

কঙ্কর আর কথা বললে না। সুমুখের রেল-লাইনের উপর দিয়ে একখানা

মালগাড়ী মন্থর গতিতে পার হয়ে যাচ্ছিল, জানলায় মুখ বাড়িয়ে মীনাক্ষী বললে, কী নির্জন এদিকটা। কোথাও গ্রামের চিহ্ন নেই, কেবল মাঠের পর মাঠ। দূর দূরান্তর—

সহসা জানালার নীচে একটা ডোবার দিকে চোখ পড়তেই সে সবিস্ময়ে বললে, ওকি, মাস্টার মশাই কি করছেন ওখানে?—এই ব'লেই সে মুখ ফিরিয়ে শশব্যস্তে পুনরায় বললে, মাস্টার মশায়ের পেটে-পেটে এত কাণ্ড? দাঁড়াও ত দেখি একবার—

কোথা যাও?

আসছি—

ঘর থেকে বেরো'তেই সুখন বললে, গাড়ী আয়া হ্যায়, মা'জি।

আচ্ছা। ব'লে পিছনের দরজা দিয়ে মীনাক্ষী বাড়ীর পিছনের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলো, মাস্টার মশাই?

মাস্টার মশায় তখন একখানা খাটো কাপড় প'রে এক ডোবার ধারে সমারোহ সহকারে বাসন মাজতে বসেছেন। ছাইমাখা হাতখানা তুলে বললেন, এই যে, আমার হয়ে গেছে।

একাজ আপনি কেন করছেন, মাস্টার মশাই?—এই ব'লে মীনাক্ষী একেবারে ডোবার জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

হাসিমুখে তিনি বললেন, এ ত আমিই করি। আগে খুব অসুবিধে হোতো, এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।

তিনি একটা ঝি অথবা চাকর রাখেন নি কেন, এ প্রশ্ন করতে গেলে হয়ত তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হবে, কিন্তু তবু মীনাক্ষী তার উত্তেজনা এবং বেদনাকে দমন করতে পারলো না। বললে, ঝি রাখবার সুবিধে হয়ত আপনার নেই কিন্তু এ কাজগুলো আপনার স্ত্রী-ও ত করতে পারতেন!

স্ত্রী!—মাস্টার মশায় একখানা বাসন ধুয়ে রেখে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন,—বেশ বলেছেন যা হোক, বিয়ে করলুম কবে যে, স্ত্রী!

মীনাক্ষী স্তব্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল, তারপর মৃদু গলায় প্রশ্ন করলো, তবে এতক্ষণ ধ'রে রাঁধলেন কে, মাস্টার মশাই?

বারে আমিই ত রাঁধলুম। দেখলেন না কত ত্রুটি, কত বিশৃঙ্খলা,—আজ আপনাদের খাওয়াই হোল না।

মাস্টার মশাই, তাহলে ছেলেমেয়েগুলি?

বাসনগুলো সব ধুয়ে গুছিয়ে তুলে এনে মাস্টার মশায় বললেন, এলেন যদি তবে দয়া ক'রে একটু ধরুন, হাত পা ধুয়ে নিই। ছেলেমেয়েগুলি? ওরা আমার সব ভাই-বোন যে! তা একরকম ওরা আমার সন্তানের তুল্যই বৈ-কি। মেয়েটি আর একটি ছেলে আমার বৈমাত্রেয়, আর দুটি ভাই আমার সহোদর। বাবা গেলেন, দুই মা গেলেন, আমিই কেবল এখন আছি। কচি বেলা থেকে মানুষ করেছি—কি করব বলুন। আসুন—দিন্ এইবার আমার হাতে···ইয়া!

বাসনগুলি নিয়ে মাস্টার মশায় অগ্রসর হ'লেন।

এই যে আপনাদের গাড়ী এসেছে, তাহলে আর দেরী করবেন না। আমি কাপড় ছেড়ে নিই।

পা দুখানা যেন মীনাক্ষীর ভারি হ'য়ে এলো। চোখে জল তার কোনো কারণেই কখন আসে না, কিন্তু কেমন একটা উদ্গত আবেক গোপন করবার জন্য সে এদিকে ওদিকে চেয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলো। হঠাৎ চোখে পড়লো দেয়ালের হুকে মাস্টার মশায়ের সেই জিনের কোটটা ঝোলানো—আর কিছু না পেয়ে মীনাক্ষী সেই কোটটা নামিয়ে তার উল্‌টো ঘরা থেকে বোতামগুলো খুলে সোজা ঘরায় পরাতে লাগলো। কিছু সেবা ক'রে যেতে পারলে নিজের কাছেই সে যেন তৃপ্তি পেতে পারতো।

মাস্টার মশায় তখনো পাশের ঘরে সাজসজ্জা করতে করতে মনের আনন্দে

হাসছিলেন। বোধ হয় ভাবছিলেন, ভদ্রমহিলা তাঁর পাল্লায় প'ড়ে এযাত্রা খুব ঠ'কে গেলেন। এক সময় মুখ বাড়িয়ে পুনরায় বললেন, বিয়ে করবার সময়ই পাওয়া গেল না—বুঝলেন না ? ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো, রোগ ভোগ, রান্না খাওয়া, অল্প মাইনের চাকরি,—ওটা আর হয়েই উঠলো না। ওরে সুখন ব্যাগদুটো তুলে দে গাড়ীতে। এই গাড়োয়ান, আচ্ছা করকে বিচালি বিছায় দেও। এই ভদ্রলোকরা হামারা কুটুম্ব, সাবধানে লে যায়েগা—বুঝা হায় ?

বহুৎ আচ্ছা, সাব।

নমস্কার, প্রতি-নমস্কার, সামাজিক সৌজন্য ইত্যাদির পালা শেষ ক'রে তিনজনেই পথে বা'র হলেন। ব্যাগদুটো গাড়ীর মধ্যে নিয়ে গাড়োয়ান বলদ তাড়িয়ে চল্‌ল। স্টেশন পার হয়ে গিয়ে জেলাবোর্ডের পথ ধ'রে আপাতত তাদের যেতে হবে।

লেবেল্‌ ক্রশিং পার হয়ে গিয়ে মীনাক্ষী বললে, মাস্টার মশাই, ভাই-বোনেদের আমার আশীর্বাদ দেবেন। আর একটি নিবেদন আছে, যদি আপনার অনুমতি হয়—

বিলক্ষণ, বলুন, বলুন—

আমি কিছু চিহ্ন রেখে যেতে চাই আপনার এই মন্দিরে—

এবার বুঝি আমাকে বকশিশ দেবার পালা ?

আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হবে এমন কাজ করব না। আমি আমার ভাবী বৌদিদির জন্যে কিছু উপহার রেখে যেতে চাই।

ভাবী বৌদিদি ? ওঃ বুঝতে পেরেছি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ······ওরে গাড়োয়ান, দাঁড়া একটু,—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—ও মশাই, আপনি এগিয়ে যান কেন ? শুনে যান একবার আপনার স্ত্রীর কথা—

অদূর থেকে কঙ্কর হেসে বললে, ভাই বোনের নাটক হচ্ছে, আমি দর্শক মাত্র, মাস্টার মশাই।

হাতের মুঠোয় মুক্তোবসানো ঝুমকো দুটো নিয়ে মীনাক্ষী হেঁট হয়ে, তাঁর পায়ের কাছে রেখে বললে, এইটি আমার বড় সাধ হয়েছে, আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।

মাস্টার মশায় বললেন, দেখুন দিদি, কিছু পাবার আশায় আপনাদের সেবা করিনি, কিছু পেলুম ব'লে অপমানও মনে করব না। যা দিলেন মাথায় তুলে নিচ্ছি। আপনার ভাবী বৌদিদির জন্যে কিনা জানিনে, তবে বোনটার বিয়ের সময় এটা কাজে লাগবে—এই কথা জানিয়ে রাখলুম। মুখপোড়া মেয়ের কাণ্ড দেখেছেন? পরশু একটা গেলাস ছুড়ে মেরে এই দেখুন, একটা দাঁত ভেঙে দিয়েছে! এই ব'লে তিনি ভাঙা দাঁত দেখিয়ে স্নেহ-উদ্‌ভাসিত হাসি হাসতে লাগলেন।

আর একবার নমস্কার জানিয়ে কঙ্কর গাড়ীতে উঠলো, মীনাক্ষীও তার অনুসরণ করলো। গাড়ীখানা ধীরে ধীরে চলতে লাগলো, আর তার সেই ছইয়ের ভিতর থেকে দুইজন হাত যোড় ক'রে হাসিমুখে মাস্টার মশায়ের দিকে চেয়ে রইলো। তিনি তখনও তাঁর ভাঙা দাঁতে হাসছিলেন।

* * *

পথটা ফুরোবার প্রশ্ন ওঠে না, কারণ পথটা নিরুদ্দেশ। কথা উঠতে পারে, ওরা চলেছে কোথায়? উত্তর হবে, ওদেরও জানা নেই। তরী ভাসিয়ে দিয়েছে ওরা অকূলে। ওরা যে বিবাদ বিতর্ক ক'রে এলো কল্‌কাতায় দীর্ঘকাল ধরে, সেটা ওদের আসল পরিচয় নয়, ওরা চাইলো একটা দুর্বার বন্য জীবন পথে পথে। একজন কবি, অন্যজন কবিধর্মিণী—কিন্তু আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করার জন্য কিছু বাস্তববাদ ঘেঁষা। রাস্তা ওরা মাড়িয়ে চলে, কবিজনোচিত শূন্যতায় ভেসে বেড়ায় না। কবি বটে, তবে গদ্যকবিতার কবি।

মাঠের পথের ধূলো উড়িয়ে গাড়ী চলেছে। আন্দাজ মাইল চারেক পার হওয়া গেল। উঁচু নীচু পথের দোলায় খড়ের বিছানায় মীনাক্ষী ঘুমিয়ে পড়েছে,

তার এলায়িত তনুলতায় কেমন একটি পরনির্ভরশীলতার কোমল ভাষা জড়ানো। এম-এ পাশ করা জলপানি পাওয়া মেয়ে, ইন্‌টেলেকচুয়েল্‌ ব'লে তার বন্ধু সমাজে খ্যাতি—কিন্তু তার যৌবনোচ্ছল শ্রান্ত দেহলতায় যেন এই কথাটা লেখা,—যেখানে খুশি নিয়ে চলো, তুমিই ধর্ম, তুমিই স্বর্গ। এমন নিরুদ্বেগ কেবল মেয়েরাই হতে পারে পুরুষের আশ্রয়ে। কস্বর সস্নেহে তার চোখের উপর থেকে চুলের ঝালরটি সরিয়ে দিল। হাসিমুখে মনে মনে বললে, এই বোধ হয় ভালো।

এই ভালো কিনা সে নিজেও হয়ত জানে না। রূপালী জরির ফিতাটা অযত্নে বেণী থেকে খুলে এসেছে। খড়ের বিছানায় মাথায় দেবার একটা বালিশও জোটেনি। ধূলোমাখা দুখানি পায়ে বাসি আল্‌তার অস্পষ্ট দাগ। সাজসজ্জার আড়ম্বরের দিকে মোহ নেই, প্রসাধন-পারিপাট্যের প্রতি ঔৎসুক্য নেই—আর মেয়েদের পক্ষে যেটা সব চেয়ে লোভনীয়,—যার জন্য তারা অনেক সময়ে মান-সম্ভ্রম নষ্ট করতেও পশ্চাদ্‌পদ নয়—সেই অলঙ্কারের দিকে আসক্তি নেই। পরাশ্রিতা সেজেছে স্বেচ্ছায়, ভিক্ষাবৃত্তি নিল প্রাণের আনন্দে। মেয়েদের পক্ষে বাঁচার মূলধন যেটা অর্থাৎ গায়ের শাদা চামড়া আর কাঁচা বয়সের দেহের বাঁধুনি—এটা দিয়ে সে বাজিমাৎ করতে চাইলো না। নিজের তরুণ দেহের উপর পুরুষকে আসন দিল না, তাকে টেনে নিয়ে গেল আপন প্রাণের ঐশ্বর্যপুরীতে—যেখানে রসের ভাণ্ডার অফুরন্ত। এমনি ক'রে আগল খুলে দেওয়াই বোধ হয় ভালো।

মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে পথটা নিস্তব্ধ উদাসীন, কোথাও কোথাও অলক্ষ্য বৃক্ষচূড়ায় পাখীর শ্রান্ত কলকূজন, আর চৈত্র মাসের হাওয়ার ঝলক মাঝে মাঝে গান গেয়ে চলেছে বৈরাগীর মন্ত্রে। মানব-মানবী চলেছে কল্পান্তকালের যাত্রায়—অতীত আর ভবিষ্যতকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো মহাকালের মতো বৃদ্ধ গাড়োয়ান যষ্টি হাতে। এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে।

অনেকটা তারই সূত্র ধ'রে পিছনপথে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল কাঁচা মাটির উপরে দুইটা চাকার দাগ যেন দুইটি জীবনের ইতিহাসের উপর রেখা টানতে টানতে চ'লে এসেছে।

এমন একটি পরিপূর্ণ কবিতার ঘুম ভাঙিয়ে রসভঙ্গ করা চলবে না। বিপ্লবী ভাবলো জাগরণ মানেই আলোড়ন, উৎক্ষেপ। চৈতন্যকে ঘুম পাড়িয়ে দাও, বুদ্ধি আর মস্তিষ্কের উপরে পর্দা টেনে দাও, হৃদয়লোকে আনো অনাহত স্তব্ধতা,—তারপরে শুধু চেয়ে থাকো, চেয়ে দেখো। চেয়ে দেখাই যেন একান্ত ক'রে পাওয়া।

অথচ কঙ্কর ভাবলো, এত নিকটে যে, নিশ্বাসের উত্তাপে যেন জীবন-মরণের দোলা লাগে। এত নিকট যে, পাওয়ার জন্য কোনো সংগ্রাম নেই, বিরহ-মিলনের আন্দোলন নেই। অথচ কতটুকুই বা। পৃথিবীর কোটি কোটি নারীর এও একটি সামান্য পুনরাবৃত্তি, সেই বিরাট আইডিয়ার একটি বিন্দুবৎ ভগ্নাংশ মাত্র। সেই চুলের অরণ্য—যার রহস্যে চিরকালীন পুরুষ স্বপন বোনে; পুরুষের দস্যুতাকে সাদরে আহ্বান ক'রে আনার মতো দেহের সেই পুরাতন উপকরণ; সেই লাবণ্য, যার মধুর অবগাহনে আনন্দলোকের ঐশ্বরত্বকে উপলব্ধি করা যায়—সেই পুরাতনের কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম নেই। তবু সহজটাই যেন সহজ নয়। অতি পুরাতনের নবীন প্রকাশটাই যেন অতি বিচিত্র। যা কিছু দেখি, যেন প্রাচীনেরই নব্য রূপ। কঙ্কর ভাবলো সেই ফোটে ফুল, সেই ওঠে তারা, সেই নারীর দেহে আসে অলক্ষ্যে যৌবনের সংবাদ, পুরুষের বুকে সেই আদিম স্ফুলিঙ্গ। আর প্রেম? প্রেমই পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনী। জীবন যেমন হোলো অতি প্রাচীন, অতি আদিম, কেবল বারে বারে প্রকাশ পায় তার আধুনিক ভঙ্গী। বিষয়বস্তুটা আবহমানকালের, আঙ্গিক পদ্ধতিটাই কেবল নব্য রূপ পায়।

উঁচুনীচু চাকার ঝাঁকুনিতে একসময়ে মীনাক্ষীর ঘুম ভাঙলো। চেয়ে দেখলো কঙ্করের দিকে, চোখ তার তন্দ্রার নেশায় রাঙা। বিশ্বাস করলো না সে

কিছু। এ কোন্ দেশ, কোথায় চলেছে, কেন সে এই গাড়ীর মধ্যে শয়ান, কে এই সঙ্গীটি, নিজের কী পরিচয়,—তন্দ্রার ঘোরে কিছুই সে বিশ্বাস করলো না। নিদ্রার বিস্মৃতিটা তখনো তার জাগ্রত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, সর্বশরীরের প্রাণের চেতনা তখনো তার ললিত কণ্ঠের কাছে ধুক ধুক করছে। সমস্তটা যেন স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য, জাগরণের মতোই অলীক। নিশ্বাস ফেলে মীনাক্ষী আবার চোখ বুজলো।

কঙ্কর?—অনেকক্ষণ পরে সে চোখ বুজেই ডাকলো।

কি মীনু?

কি দেখছিলে এতক্ষণ চেয়ে-চেয়ে?

চেয়েছিলুম তোমার দিকে।

কেন?

কঙ্কর বললে, দস্যু অপহরণ ক'রে নিয়ে চলেছে এক নারীকে তার রাজ্যে, বনপ্রান্তর, নদ-নদী পার হ'য়ে এক অজানা দেশে, তাই ভাবছিলুম—

মীনাক্ষী বললে, উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার!

মীনাক্ষী হাসিমুখে উঠে বসলো। বললে, মনে করেছিলুম আমার সঙ্গে দস্যুও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। আগে জানলে সাবধান হতুম, দস্যুকে চেয়ে থাকতে দিতুম না। হয়েছে, এবার একটু শোও দেখি। নরম কম্বলখানা ভারি কাজ দিল।—এই গাড়োয়ান!

বুড়ো গাড়োয়ান মুখ ফিরিয়ে তাকালো। মীনাক্ষী বললে, বহুৎ মেহেরবানি, তোমার কম্বলসে হাম্‌কো খুব উপকার হুয়া।

গাড়োয়ান তার আপন ভাষায় বুঝিয়ে দিল, কম্বলটি মাস্টার মশায়ের দেওয়া তাদের ব্যবহারের জন্য; ওই কম্বল আর এই পুঁটলিটি। এই ব'লে একটি পরিচ্ছন্ন কাপড়ের মোড়ক তাদের দিকে সে এগিয়ে দিল।

পুঁটলিটি নিয়ে খুলে দুজনে অবাক হয়ে গেল। ভিতরে রাত্রের আহারের জন্য একরাশ লুচি, তরকারি ও মিষ্টান্ন। ছোট একটি কাগজে মোড়া একটু নুন ও একটা কাঁচা লঙ্কা, তার সঙ্গে একটুকরা জারক লেবু। মীনাক্ষী স্তব্ধ হ'য়ে সেগুলির দিকে চেয়ে রইল।

আশ্চর্য, না মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী এবার তাকালো পিছন পথের দিকে। মাঠের পথের ধূলায় আর রৌদ্রে অস্পষ্ট হয়ে আসা সেই ভাঙা দাঁতের স্বচ্ছ হাসিমুখ।—বিয়ে করলুম কবে, যে স্ত্রী ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—চৈত্রের মাঠের তপ্ত হাওয়ায় সেই বিষণ্ণ উদাসীন হাসিটা যেন দিগন্তরব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। মীনাক্ষী আবার প্রণাম জানালো মনে মনে।

অপরাহ্নের দিকে নেমে গেল রৌদ্র। মন্থরগতিতে গাড়ী চলেছে; থামার প্রশ্ন নেই, পৌঁছবার উদ্বেগ নেই। দ্রুতগতি এখানে মানায় না, সমস্ত দূরত্বটাকে বিন্দু বিন্দু উপলব্ধি ক'রে যাওয়া। এর নাম ভ্রমণ; পদে পদে নূতন পরিচয়, পদে পদে নব নব আত্মদর্শন। ক্লান্তি নেই মনে, মস্তিষ্কের উপরে পথের দূরত্বটা শ্রান্তি আনছে না, পথ ফুরোবার ঔৎসুক্য নেই। প্রাণকে যেন ছড়িয়ে দেওয়া, স্নায়ুতন্ত্রের অখণ্ড মুক্তি পাওয়া। এটা কোন্ দেশ, কোন্ গ্রামের পর কোন্ গ্রাম, কত মাইলের পরে কোন্ লোকালয়, কোন্ অরণ্যের পর কোন্ নদী—এসব তথ্যের হিসাব নেই; একেই বলা চলে ভ্রমণ। আপন প্রাণকে উপলব্ধি করা প্রতি তৃণফলকে, আলোয় ছায়ায়, উত্তপ্ত হাওয়ায়, অলস প্রকৃতির অবিশ্রান্ত একই চিত্র-লেখনে। এই মধুর ভ্রমণে দায়িত্ব নেই, বাধ্যবাধকতা নেই।

কঙ্কর আস্তে আস্তে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। হেসে বললে, ক্ষীরোদ সমুদ্র নয় বটে কিন্তু শয্যাটা অনন্ত,—পদপ্রান্তে সেবারতা লক্ষ্মী; বেশ লাগছে।

মীনাক্ষী বললে, কিন্তু নারায়ণের মাথায় সহস্রনাগের ছত্র কই ?

আধুনিক লক্ষ্মীর ছোবলের ভয়ে তারা বেরোয়নি। তুমিই ত নাগিনী।

এসো তবে। ব'লে মীনাক্ষী তার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে বললে, একটু ঘুমোও, রাত্রে জেগে উঠো অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে।

কঙ্কর বললে, কিন্তু ঘুম ভাঙাবে কে?

আপনি ভাঙবে। শুনেছি পথে আছে মহুয়ার জঙ্গল। মহুয়ার গন্ধে ভাঙবে ঘুম, কিংবা বনফুলের মুখচোরা আবেদনে।

ওরে বাবা, এ যে কবিত্ব! কঙ্কর শিউরে উঠলো।

অপরাধ কি, কাঁকর?—মীনাক্ষী বললে, স্পর্শগুণ মানো ত? ছুঁয়ে আছি যাকে, তার সঙ্গে চলেছে প্রাণের আনাগোনা। গাড়ীর দোলায় ভাঙন লাগছে হৃদয়ের তটে। পৃথিবী জনহীন। বসন্ত অবসন্ন হয়ে এলো অপরাহ্ণের রাঙা রোদে। পথহারানো মন অবলম্বনের ক্ষুধায় জরোজরো, শ্রান্ত শরীর আর শাসনের আগল মানতে চাইছে না। এমন অবকাশ কে পায়, গো?

অর্থাৎ?

মীনাক্ষী জবাব দিল, অর্থাৎ শাস্ত্রকার এবং মাস্টার মশাইরা যাকে বলেন সংযম, তার বাঁধটা পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্লাবনে ক্ষয় হয়ে চলেছে অতি দ্রুত।

কঙ্কর প্রশ্ন করলো, কিন্তু তার জন্য কি আমাদের এই নিরুদ্দেশ যাত্রার বিশাল পটভূমির প্রয়োজন ছিল?

তার কপালের রুক্ষ কোঁকড়া চুলের উপর হাত বুলিয়ে মীনাক্ষী আস্তে আস্তে বললে, তর্ক করো না, আগে একটু ঘুমিয়ে নাও।

কঙ্কর চোখ বুজে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ পরে কাঁকর আবার কথা বললে, তুমি আমার এত কাছে যে, বাঁধ ভাঙার প্রয়োজন নেই। ভোগের আনন্দ আমার দেহের অণুতে অণুতে, প্রতি লোমকূপে আমার আগুন জ্বালানো। অস্থিরতা আর অসংযম—এই

আমার ব্যক্তি-পরিচয়, নীতি আর নিয়মেব আগল আমার নেই। বুঝতে পেরেছ, মীনু?

আবার কথা বলে! এবার কিন্তু আমি লজ্জিত হবো।

কেন?

আমিই যে তোমাকে আমন্ত্রণ করেছিলুম।

মিছে কথা। কঙ্কর বললে, আসন আমার স্থায়ী। আমন্ত্রণ নেই, বিসর্জন নেই। মিলনের চটুল আনন্দ, আর বিচ্ছেদের সুলভ দুঃখ-বেদনা, এদের প্রশ্রয় সেখানে কোথায়? তোমার আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখবো না, তোমার অনিচ্ছার ইঙ্গিত শুনবো না। এগুলো থাকে উপরতলায়, যেখানে সংযম অসংযম, হাসি-অশ্রু, তর্ক-বিতর্ক আর লজ্জা-অলজ্জার ছিনিমিনি খেলা। প্রাণের ভিতরে এর তপস্যা চলছে অবিচ্ছিন্ন, স্নায়ুতন্ত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলেছে অবিরাম,—সেখানে আদি শক্তির বিপুল অগ্নিকুণ্ড। কা'কে বলবে ইচ্ছা? কা'কে বলবে সংযম?

কিন্তু লৌকিকতা মানবে না?—মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো।

এসো ফিরে তবে। লৌকিকতার চেয়ে বড় ক'রে তোলো বিচারবুদ্ধিকে, মনুষ্যত্বকে!—কঙ্কর বললে, পুরুষের অসংযম আক্রমণশীল আর মেয়েদের আত্মদাহিনী। একজন পোড়ায় আর একজন পোড়ে। চেয়ে দেখো বাইরের দিকে, মীনাক্ষী। সূর্যের থেকে সব সৃষ্টি, মানো ত? চেয়ে দেখো সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে কামনার রক্তঝলক, দেখো চেয়ে চৈত্রের আতপ্ত আকাশ লালসার মতো বিবর্ণ, দেখো নির্জন পলাশ আর কৃষ্ণচূড়ার লাল জঙ্গলে, শোনো মৌমাছির পাখার গুঞ্জনে বসন্তরাগ,—আর দেখো মানুষ নেই কোথাও, আমাদের চরম স্বাধীনতা। কেউ জানবে না, শুনবে না, ভাববে না, খুঁজবে না। চেয়ে দেখো মীনাক্ষী, আমাদের এই চৌর্যবৃত্তির দিকে কোন নীতির রক্তচক্ষু নেই, সমালোচকের বিষাক্ত ছুরির ফলক নেই, নিন্দা রটনা করবে না কেউ, বারণ করবে না কেউ এসে।

তুমি কী বলতে চাও, কাঁকর ?

সহসা হেসে কাঁকর বললে, বলতে চাই এই যে, গাড়োয়ান বুড়োকে তামাক খাবার লোভ দেখিয়ে কোনো গাছতলায় পাঠিয়ে দাও।

মীনাক্ষী তার মুখখানা হাত দিয়ে চেপে ধরলো,—ছি ছি, এতটুকু লজ্জা নেই তোমার ? তোমার মুখের জ্বালায় দেশ ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে করে। মুখসর্বস্ব, অকর্মণ্য !

অকর্মণ্য ! কঙ্কর ওঠবার চেষ্টা করলো।

হয়েছে, হয়েছে, থামো। দোহাই, আর চ্যালেঞ্জ করবো না।—এই ব'লে হেসে মীনাক্ষী আবার তাকে বাগ মানালো।

গাড়ীর দোলায় দুলতে দুলতে ওরা চলেছে। চলেছে দুধারি একটা জঙ্গল পার হয়ে অরণ্যের আবহে সাময়িক পথটা সুশীতল। দূরের কোন্ গ্রামে কা'র যেন গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—আওয়াজ জনহীনতাকে আরো যেন গভীর ক'রে তুললো।

মীনাক্ষী ?

কেন ?

এমন একটা অবকাশের মাঝখানে যদি বিপ্লব না ঘটাতে পারব তবে মিছেই লিখি কবিতা।

বিপ্লবটা কেমন ? মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো।

কঙ্কর বললে, চিরাচরিত প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ !

বিদ্রোহ ? মানে ?

মানে, বুকের ওপর হাত রেখে দেখো। একবিন্দু উত্তেজনা নেই, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। এখানে সংযম মানে বিদ্রোহ, মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী হেসে বললে, আমি যদি তোমাকে মাতিয়ে তুলি ?

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, যদি তাতিয়ে তুলি! যদি রাঙিয়ে তুলি পলাশের লালে!

হেসে কাঁকর তার আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে বললে, তুলবে না জানি, তাই ত তুমি আমার প্রিয়।

*

* *

সন্ধ্যার সময় এক গ্রাম পাওয়া গেল। দুচারটি মাত্র সামান্য কুটীর। চাকার শব্দ করতে করতে গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো এক ইঁদারার ধারে। এই গ্রাম তার পরিচিত। আশপাশে ছোট ছোট চাষীর ঘর, একপাশে স্তূপীকৃত খড়ের বোঝা, দুচারটি হিন্দুস্থানী নরনারীর গলার আওয়াজ। নূতন মানুষের আবির্ভাব দেখে কয়েকটা বালকবালিকা কলরব করতে লাগলো, গ্রামের গোটা দুই কুকুর ডেকে উঠলো।

ব্যাগদুটো হাতে নিয়ে গাড়োয়ান তাদের পথ দেখিয়ে এক চালায় এনে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে আরো দুএকটি প্রেতকায় লোক এসে হাত যোড় ক'রে দাঁড়ালো। তখনই রটনা হ'য়ে গেল, জমীদার এসেছে, সরকারকো সেলাম দেও।

ফল ফলতে দেরি হোলো না। গ্রামের যে-লোক মাতব্বর, সে এক স্বেচ্ছাসেবক পাঠালো। দুটো বড় বড় মাটির 'গাগরি' ভ'রে জল এলো, এলো দুখানা 'চার পাই'—আর তার সঙ্গে একটি হারিকেন্ লণ্ঠন; সমস্ত গ্রামের মধ্যে এই একটিমাত্র লণ্ঠন এলো সরকারের সেবায়। মাতব্বর যিনি, তিনি এক লোটায় ভ'রে আনলেন খাঁটি গো-দুগ্ধ। সকলেই যেন তটস্থ, সকলেরই জীবন-মরণ যেন 'রাণী-মার' ইচ্ছা অনিচ্ছায় বাঁধা।

বালক বালিকারা এক সময়ে সমারোহ দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল, অনাবশ্যক জনতা আপনা হ'তেই তরল হয়ে এলো। রইলো কেবল মাতব্বর, স্বেচ্ছাসেবক, গাড়োয়ান আর ওরা। মীনাক্ষী গিয়ে সেই কাপড়ের পুঁটলি খুলে প্রায় সমস্ত

আহার্য বস্তুগুলি তাদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিল। 'রাণীমা'র এই প্রসাদ তারা মাথায় তুলে নিল।

কঙ্কর বললে, তোমার শকট-চালকটি বেশ শিক্ষিত, কি বল ?

মীনাক্ষী বললে, সবই মাস্টার মশায়ের উপদেশ, দেখছ ত ?

রাত্রির কোন নির্দেশ নেই, অন্ধকার এবং আলোর মাঝামাঝি সময়ে সময়ের সঙ্কেত গ্রামের মধ্যে পাওয়া কঠিন। গ্রামের মধ্যে গাছপালায় ঘেরা চারিদিকে জটপাকানো অন্ধকার,—তারই মধ্যে নানা পক্ষী ও নানা জীবের সাড়াশব্দ, বসন্তকালের বুকভরা দুরন্ত হাওয়ায় গাছপালার সরসরানি, আর দূরের কোন্ পথে শৃগালের প্রাহরিক আর্তনাদের সঙ্গে গ্রামের কুকুরের কণ্ঠে প্রতিবাদ।

কঙ্কর এক সময়ে বললে, একটু চা খাবো, রাণীসাহেবা !

চা ? তার চেয়ে আমার মাথা খাও।—ব'লে মীনাক্ষী এগিয়ে বললে, সাহেব বিশ্রাম নেবেন, তোমরা এখন যাও।

এমন সময় একটি লোক খানচারেক কম্বল আর মোটা দেশী চাদর এনে হাজির করলো। এটির মধ্যেও বৃদ্ধ গাড়োয়ানের চক্রান্ত আছে, আর আছে মাস্টার মশায়ের দূরদর্শিতা। কম্বল বস্তুটি সকল দেশেই প্রাপ্তব্য, আর হিন্দুস্থানী চাদরগুলি প্রায় তেরপলের মতো। মীনাক্ষী খুশী হয়ে বললে, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক' তুমি, বুঝলে কাঁকর ?

কঙ্কর সোৎসাহে বললে, বিছানাটা নরম হবে ত ?

মীনাক্ষী তামাসা ক'রে বললে, নরম হবে কিন্তু কাঁকর ফুটবে।

মাতব্বর জানতে চাইলো, কিছু রান্নার আয়োজন করবে কিনা। মীনাক্ষী জানালো, না, দুধটা ফুটিয়ে আনলেই চলবে।

দুধের লোটা নিয়ে মাতব্বর সবিনয়ে চ'লে গেল এবং মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফুটন্ত দুধের লোটা, চিনি আর দুটো পিতলের গেলাস এনে এক পাশে ঢাকা

দিয়ে রেখে গেল। ওধারের ছায়ায় ততক্ষণ আগুন জ্বালিয়ে সেই স্বেচ্ছাসেবকটি ও গাড়োয়ান 'ডাল রুটি' পাকাতে লেগে গেছে। বলদ দুটোকে খাওয়াবার জন্য এক সময়ে নির্দেশ দিয়ে মীনাক্ষী এসে খাটিয়ায় বসলো।

কঙ্কর বললে, একটা কথা বুঝতে পারা গেল, যা আমরা চাই তা এখানে পাবো না।

মীনাক্ষী বললে, চেয়েছিলে নিভৃতি, সে ত পেয়েছ ?

কেবল ত নিভৃতি নয়, অপরিচিত হয়ে মিলে যাওয়া।—কঙ্কর বললে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই এখানে দেখা গেল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। আমরা পূজ্য, ওরা পূজারী—কিন্তু অনাত্মীয় হয়ে রইলো, মিলতে পারলো না। যেখানেই যাবে চেহারাটা হবে বাধা, ভঙ্গীটা হবে আড়ষ্ট। এত অভ্যর্থনা আছে ব'লেই এদের সঙ্গে একাকার হওয়া অসম্ভব।

যদি দরিদ্রের বেশে থাকি ?

তবে আরো হাস্যাস্পদ হবো, ওদের তাচ্ছিল্য আর করুণায় জীবন হবে অতিষ্ঠ; কেবল তাই নয়, ওরা মনে করবে এ বুঝি আমাদের ছলনা।

কেমন ক'রে ?—মীনাক্ষী জানতে চাইলো।

কঙ্কর বললে, দেখবে আমাদের দারিদ্র্যের ছদ্মবেশে ফুঁড়ে প্রকাশ পাচ্ছে আভিজাত্যের ইঙ্গিত,—চেহারায়, ভঙ্গীতে, আলাপে, চলনে। যতই যাবে ওদের মধ্যে, ততই যাবে ওরা দূরে স'রে। ওদের আদরের পিছনে ভালোবাসা নেই, আছে জমীদারের ভয়,—যেদিন বুঝিবে ভয় করবার দরকার নেই, সেদিন থেকে আমরা হবো কৃপার পাত্র। আমাদের ধূলোয় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা চলবে।

তবে কি ফিরে যেতে বলো তুমি ?

না, এগিয়ে যাই চলো। কেবল দেখে দেখে যাই।

থাকবে না কোথাও ?

কঙ্কর হেসে বললে, পথে পথেই থাকা যাবে; মন্দ কি ?

তাহলে কবিতা লিখবে কোথায় ব'সে ?—মীনাক্ষী জিজ্ঞাসা করলো।

যতক্ষণ তুমি থাকবে ততক্ষণ লিখবো না কবিতা।

সর্বনাশ !—মীনাক্ষী শিউরে উঠলো। বললে, কথা শুনলে ভয় করে। দুজনের মধ্যে একজন নেই—এমন অবস্থা তুমি ভাবতে পারো ?

কঙ্কর বললে, আরে, তাইজন্তেই ত সাহিত্য চর্চা ছেড়ে দিলুম।—এই ব'লে সে খাটিয়ার উপরে কম্বল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো। মীনাক্ষী এক সময়ে দুধ এনে তাকে খাওয়ালো।

পাশের চালায় দু'জন পাহারায় মোতায়েন রইল। পূর্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র উঠেছে, তাতে জ্যোৎস্নার আলো নেই, আছে শুধু আভা। সেই আভায় বনময় গ্রাম স্বপ্নলোকের মতো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। বসন্ত-বাতাস চলেছে গাছে-পালায় মর্মর জাগিয়ে। অপরিচিত অন্ধকারে আতঙ্কের অপেক্ষা বিস্ময়টাই যেন বড়। নিবিড়, নিস্তব্ধ ও নিরুদ্বেগ গ্রাম,—এদের মধ্যস্থলে আপন অস্তিত্বকেও যেন সত্য ব'লে মনে হয় না।

মীনাক্ষী তার খাটিয়াখানা কাছে এনে পাশাপাশি রাখলো। সমস্ত দিনের শ্রান্তি, দীর্ঘ দুই রাত জাগরণে কাটানো—অল্পকাল পরেই জানা গেল কঙ্কর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

মীনাক্ষী হাসলো, কিন্তু ডাকলো না। একসময়ে ধীরে ধীরে কঙ্করের খোলা জামায় বোতাম এঁটে দিল। অবিন্যস্ত একরাশ চুলের ভিতরে আঙুল চালিয়ে গুছিয়ে আনলো। তারপর কম্বলটা তুলে দিল গলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। এর পরে সেদিন রাত্রের মতো যবনিকা। সেও শুয়ে পড়লো বুনো লোমশ কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে। দুজনের নিদ্রার প্রহরায় জেগে রইল আকাশে তারকার দল।

* *

*

মাঝখানের চার পাঁচটা দিনের পরে আবার উঠলো গল্পের যবনিকা। এখানে ভ্রমণের বৈচিত্র্য কম, পথটা তাই দীর্ঘ হলেও একই পথের পুনরাবৃত্তি। ইতিমধ্যে আর একবার ব'লে রাখা ভালো, নায়ক-নায়িকার মতস্থিরতা ব'লে কোনো পদার্থ নেই; রাশটা ওরা আলগা ক'রে দিয়েছে নিয়তির টানে নয়, ভাগ্যকে ওরা বিশ্বাস করে না, ওরা ভেলা ভাসিয়েছে খেয়ালের তরঙ্গে তরঙ্গে। ভয়ের বাসা ওদের মনে নেই, কারণ ভয়ের জন্ম যেখানে, সেই মস্তিষ্কের মধ্যে ওদের একটা অহেতুক আনন্দের উৎস। ওরা ভয় পায় না কিছুতে।

ব'লে রাখা ভালো ওরা বেরিয়েছিল নিরুদ্দেশে, অর্থাৎ কবিকুঞ্জের সন্ধানে। সহজ জীবনটাই ওদের পক্ষে গ্রাহ্য, সেইজন্য বাঁধনটা সকল সময়ে আলগা। ওরা আধুনিক একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু আধুনিক হয়েও ওরা আধুনিকের প্রতিবাদ। যারা মোটর হাঁকায় শহরের চৌরাস্তায়, বিলেতী হোটেলে খানা খায়, ফরাসী দোকানে পোষাক তৈরী করায়, জাপানী কায়দায় ঘর সাজায়—তাদের সেই উপকরণবহুল জীবনের সঙ্গে ওরা অনেক চেষ্টাতেও কোনো আত্মিক যোগ খুঁজে পেল না। তার কারণ ওরা আধুনিক, এমন আধুনিক যে উপরতলাকার উপকরণবাহুল্যের চাপে উৎপীড়িত প্রাণের রুগ্ন চেহারাটাকে ওরা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। ওদের প্রাণের মধ্যে একটি অকৃত্রিম আতঙ্ক আছে তথাকথিত আধুনিক হওয়া সম্বন্ধে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এর প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রমাণটাই ওদের জীবন। পৃথিবীকে শাসন করবার জন্য দুজনের জন্ম নয়, আঘাত ক'রে নতুন পৃথিবী গ'ড়ে তোলবারও ওদের সময় নেই, তবু ওরা প্রতিবাদ জানালো। যে-রঙ্গমঞ্চে ওরা অভিনয় ক'রে চলেছে তার দর্শকবৃন্দ ওদের উপর হাততালি দেবে না, কারণ আর যাই হোক, ওরা বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি, ওরা কেবল জানিয়েছে একটা অসংলগ্ন প্রতিবাদ। তার ভাষাটা হয়ত প্রাঞ্জল হয়নি, প্রকাশ ভঙ্গীটা হয়ত

স্বষ্ঠু নয় এবং টেক্‌নিকেও যথেষ্ট গলদ আছে, তবু এমন অভিনয়ের বহুল প্রচার হয়ত বাঞ্ছনীয়।

ওরা সব ছেড়ে দিয়ে কেন চললো একটা শিশুসুলভ কল্পনার পিছনে পিছনে ? কে ছোটালো ওদের ? অল্প বয়সের একটা রসকল্পনা থাকা স্বাভাবিক, যাকে বলা যেতে পারে রোমান্সের মোহ। কিন্তু ওরা দেখলো পাপ, দেখলো জীবনকে নিয়ে গণিকাবৃত্তি, দেখলো প্রেমের পিছনে দায়িত্ব-জ্ঞানহীন হিংস্র কামুকতার তাড়না, আর দেখলো দিকে দিকে ব্যাধিগ্রস্ত আত্মার নোংরা অভিযান—এর পরে আর ওদের রোমান্স থাকার কথা নয়। তবু ছুটলো ওরা একটা প্রবল আত্মতাডনায়। এমন কথা স্বীকার করলো না যে, জীবনটা জুয়া। বললে না যে, খধূপের মতো এর ক্ষণিক পরমায়ু, স্থিতিস্থাপকতাকে করলো না বিদ্রূপ, শ্রদ্ধেয়কে করলো না অসম্মানিত,—কেবলমাত্র প্রাণের ক্ষুধায় পথ ধ'রে চললো নিরুদ্দেশে। প্রমাণ এইটে।

পাঁচ দিন পরে ওরা আবিষ্কৃত হোলো শোন নদীর ধারে। লক্ষ্মণ-বাজার পেরিয়ে গিয়ে পেয়েছিল এক ফসলকাটা মাঠ। তারপরেই নদীর অবকাশ। বসন্তকালের খরতাপে নদীর ধারে বিস্তৃত হয়েছে চড়া আর নদীর প্রবাহের মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে বিস্তীর্ণ চর। চরের উপরে এক এক সময়ে দেখা যায় মহাজনী নৌকা, আবার দেখা যায় পাখীর দল ডানা খুলে ঝাপটা-ঝাপটি ক'রে যায় জলে। সকালের স্নিগ্ধ খোলা হাওয়ায় এখনো প্রায়ই চোখে পড়ে নির্জন চরে বড় বড় হাঁসের পাল—এখনো তারা চ'লে যায়নি হিমালয়ের দিকে। সন্ধ্যার রক্ত আভায় নদীর কোন্ দূর নির্জন থেকে মাঝে মাঝে চক্রবাকের রূঢ় দীর্ঘ কণ্ঠস্বর জলের উপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে তাদের চালা ঘরে পৌঁছয়। চালা ঘরের আব্রু কিছু নেই, থাকার কথাও নয়। মাঝামাঝি কতগুলো গাছপালার একটা ঝুপসি জঙ্গল, কাঠগোলাপের কতকগুলো গাছ, একটা শুকনো খড়ের গাদা, একপাশে অড়হরের চারা স্তূপীকৃত,—হরিণের

উৎপাতে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কতকগুলো মরশুমী ফুলের চারা দেবার একটা বাসনা আছে, মীনাক্ষী বুঝি কা'র কাছে যেন আবেদন জানিয়ে রেখেছে। চালাঘরের সামনেই নদী, ডিঙ্গি বেয়ে গেলে ভিতরের সবটা দেখা যায়।

বুড়ো গাড়োয়ান বিদায় নেবার সময় এইটি তাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছে। এটি নিভৃত কবিকুঞ্জ। কিন্তু এখানেও কঙ্কর করলো বিদ্রোহ। কুঞ্জ সে তৈরী করলো না—যা ছিল, যেখানে যেমনটি, তাই রইল অবিকল। সাজিয়ে গুছিয়ে তোলাটা চিত্রশিল্পীর কাজ, কিন্তু সে তার চেয়েও বড়, সে হোলো প্রতিভা। এই অহঙ্কার তাকে বললে, কিছুতে হাত দিয়ো না। স্বভাবের কাঁচা চেহারাটা দেখে নাও, বেড়া বেঁধোনা মালতী লতায়, যুথি-মল্লিকার লোভে প্রাণের শান্তি নষ্ট করো না, কারিকুরি করা কবিকুঞ্জে তোমার প্রয়োজন নেই, সুপেয়-সুখাদ্য-সুবেশ এরা যেন তোমাকে না বাঁধে,—এই সহজ, সাধারণ অসংস্কৃত আবেষ্টনে খুঁজলেই রস পাবে। আধুনিক মন এখানে প্রকাশ করো না, উচ্চ শিক্ষার চিহ্ন এখানে না প্রকট হয়। তোমার ব্যক্তিগত রুচির বিশেষ চেহারা এদের মধ্যে প্রতিফলিত করা হবে অসঙ্গত,—এদের ঘুম ভাঙিয়ো না।

অদ্ভুত রসের অবতারণায় যারা আনন্দ পায় তারা কৌতুক পাবে এদের বর্তমান জীবনযাত্রায়। বেশ আছে দুজনে। মান, সম্ভ্রম, প্রসাধন, সামাজিক আদব কায়দা—এদের বালাই কেবল জনতায়, আশেপাশে লোকসমাজ না থাকলে এদের সমস্যা আর থাকে না। সুতরাং বাঁধনটা হয় ঢিলে। মীনাক্ষীকে এখন খুঁজে পাওয়া যায় ঝোপ জঙ্গলের আনাচে কানাচে। চেহারায় ভদ্র পালিশ নেই, চুল বেঁধে আত্মরঞ্জন করা অথবা ধোপদস্ত শাড়ী প'রে আধুনিকের মন ভোলানো, এ সব কাজে তার অবসর কম। খোলা রৌদ্রে আর অযত্নে থেকে চেহারাটা হয়ে উঠেছে চকচকে তামা, বেশবিন্যাসে গ্রাম্যতা—তাতে পাওয়া যাবে মাঠের ধুলো, বেলেমাটির দাগ, এলো চুল প্রায়

রংহারা বিবর্ণতায় জটা-জটিল। পরিচ্ছদের বর্ণনাটা দেওয়া চলবে না, প্রায় অশ্লীলতার কিনারা ঘেঁষে চলেছে। স্নান ক'রে আসে নদীতে, শাড়ীখানা গায়ে গায়ে, সিক্ত চুলের রাশ বেয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু জল। স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যের উপরে অবহেলার মাশুল বসিয়ে প্রাণের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়।

অন্য পক্ষেরও এই একই কথা। যেমন-তেমন ময়লা একখানা ধুতি কোমরে জড়ানো, কোঁকড়া চুলের বোঝাটা চৈত্রের মাঠের মতোই রুক্ষ, গোঁফ দাড়িতে মুখখানা যেন ফসল-কাটা ধানের ক্ষেত, পা দুখানা চাষ করবার উপযুক্ত, মুখখানা রোদ-পোড়া। দুজন পাশাপাশি এসে দাঁড়ালে কোনো ভদ্র ব্যক্তি বিচার ক'রে বলবে, ওরা আদিম যুগে ফিরে যেতে চায়; যার সরল অর্থ এই, লজ্জাসরম খুলে ফেলে ওরা পালাতে চায় প্রকৃতির মধ্যে; নগ্ন বন্য জীবনের দিকে ওদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ।

অসহ্য! নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেদিন অপরাহ্নে কঙ্কর বললে, অসহ্য এখানে থাকা। আজ সারাদিন একটি নৌকাও চলেনি, জানো?

উ-ই যে আসছে একখানা উত্তর দিক থেকে—মীনাক্ষী বললে—জানো, সকালে আজ একটা হাঙর উঠেছিলো? জালে ধ'রে নিয়ে গেছে লক্ষ্মণবাজারে।

কঙ্কর উত্তর দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, নাঃ ওখানা আসতে আসতে রাত হবে, দেখতে পাওয়া যাবে না।

কী দেখবে?

দেখতুম ভেসে যাওয়াটা। দাঁড়ের শব্দটা শুনতুম, একটু শুনতুম মানুষের গলা।

মীনাক্ষী বললে, দড়িটা কেটে আসতে পারোনি, আলগা ক'রে এসেছ।—এই ব'লে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

কঙ্কর কথার জবাব দিল না, কেবল চেয়ে রইল বহুদূরে উত্তর দিকে। তারপর নিশ্বাস ফেলে এক সময়ে বললে, নাঃ······প্রায় পনেরো মাইল। রাত হবে আসতে।

মীনাক্ষী কথা কইল না, কেবল নীরবে চ'লে গেল। নদীর মন্থর প্রবাহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে কঙ্কর আবার নিশ্বাস ফেলে নিজের মনে বললে, অসহ্য এখানে থাকা!

আরেকটি দিন কাটলো।

সকালের দিকে ভ্রমণ একা একা। নদীতীরের অন্ধিসন্ধি সব জানা হয়ে গেছে। কোথায় চোরাবালি, কোথায় ভাঙ্গন, কোথায় কাঁটালতা আর পাথুরে পথ—একেবারে মুখস্থ। যেটা মানুষের পথ নয়, সেই পথ বড় ক্লান্তিকর। বালুর চড়ায় আগেকার দিনের পদচিহ্ন পরের দিন গিয়ে কঙ্কর আবিষ্কার ক'রে আসে। এত নির্জন ব'লেই এত যন্ত্রণাদায়ক। অসহ্য এখানে থাকা!

মীনু?

উত্তর নেই। সে যেন হারিয়ে গেছে সর্বত্র। সমস্তটায় সে ভ'রে আছে, অথচ কোথাও তাকে দেখা যায় না।

লক্ষ্মী? রাণু? পাগ্‌লি? ও মীনাক্ষী?

অনেকদূর থেকে মীনাক্ষী এবার সাড়া দিল, এই যে গো—

কঙ্কর গিয়ে দেখলো একটা জঙ্গল জটলার পাশে এক গাছের ছায়ায় সে শুয়ে রয়েছে। তাকে দেখে বললে, কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ!

কোথায়?

মীনাক্ষী ক্লিষ্টকণ্ঠে বললে, এই মাটির নীচে। একটা ঘন নরম স্বাদ, ভীরু ভাষায় যেন ভিতর থেকে কথা ক'য়ে ওঠে।

কঙ্কর এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে বললে, আরে, তুমি বুঝি এখানে এই সব করো? কী এটা ডালপালায় বাঁধা?

জানিনে কী?

সময় কাটাবার ফন্দি বা'র করেছ মন্দ নয়। আরে, এযে একটা খেলাঘর! সন্ন্যাসিনীর হাতে আবার এই গৃহ রচনা?

হেসে মীনাক্ষী বললে, তোমার মুণ্ডু। আমি ওখানে পাখী পুষবো।

ওঠো এখন, ভারি রোদ ওখানে।—কঙ্কর বললে।

মীনাক্ষী বুক পেতে কান পেতে মাটি আঁকড়ে প'ড়ে রইল চোখ বুজে। বললে, আমি কোথাও যাবো না।

কিন্তু আমার যে ক্ষিধে পেয়েছে, মীনু?

ওই বললেই আমি উঠবো তুমি জানো, তাই বল্‌ছ, কেমন?—মীনাক্ষী সলজ্জ আরক্তিম মুখে করুণ কণ্ঠে বল্‌লে, কী খেতে দেবো শুনি? ক'দিন উপবাস হোলো?

কঙ্কর বল্‌লে, কম কি গো, যে-কদিন হয়েছে এতে গান্ধীজি হ'লে বড়লাট পর্যন্ত ছুটে আসতেন।

কিন্তু খাওয়াবো কি?

দেখবে চলো, আজ এনেছি নতুন জিনিস। রসনার ক্রিয়া না থাকলে রস আর জমছে না। আজ আমাকে বকশিশ দাও, নদী থেকে জল এনেছি ঘট ভ'রে। এসো।—ব'লে কঙ্কর সগৌরবে আগে আগে চললো।

চালার কাছে মীনাক্ষী এসে দেখলো একখানা মাটির সরায় একরাশি ভুট্টার খই আর হিন্দুস্থানী শক্ত খোয়া গুড়। পাশে এক কলসী জল। কঙ্কর সানন্দে বললে, শীঘ্র ব'সে যাও, এর পর ভাগে কম পড়বে কিন্তু।

দুজনে ব'সে গেল মধ্যাহ্নের আহারে! এমন সুস্বাদু আহার জীবনে বহুভাগ্যে জোটে। মোটা মোটা বড় বড় খই, তার সঙ্গে দাঁতভাঙা গুড় আর ঘোলাটে নদীর জল—বাঙ্গালী রসনার এমন অগ্নি পরীক্ষা আর কবে হয়েছে! পরম পরিতোষ সহকারে দুচারটি মুখে দিয়ে মীনাক্ষী প্রায় আধ কলস জল ঢকঢক ক'রে গিললো। কঙ্কর তার পরিতৃপ্তির দিকে চেয়ে খুশি মনে খেতে লাগলো। মীনাক্ষী উঠে পালালো।

দুজনের চেহারা শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হোলো। আত্মনিগ্রহের চিহ্ন দুজনের

সর্বাঙ্গে ফুটে উঠলো রেখায় রেখায়। গলার আওয়াজে দুজনের ভিতর থেকে এক প্রকার রুগ্নকণ্ঠ বেরিয়ে আসে—পরস্পরের চমক লেগে পরস্পর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অথচ হার মেনে আত্মসমর্পণ করা চলবে না, যেন একটা মর্মান্তিক খেলায় দুজনে মেতে উঠেছে। খেলা বললে ভুল হবে, এই স্বেচ্ছা-নিগ্রহের ভিতরে আছে যেন একটি পরম জিজ্ঞাসা। নিজেকে কঠিন ক'রে জানবার কেন এই আগ্রহ আসে মানুষের মনে? নিজেকে উৎপীড়ন ক'রে নিজেরই চোখের জল পান করার কেন এ খেয়াল? কিন্তু উত্তর খুঁজে পায় না, দুজনে রাত্রির অন্ধকারে ভিজা মাটির উপর কম্বল পেতে শুয়ে থাকে। কান পেতে থাকে প্রাণের দিকে, চারিটি চোখ অন্ধকারে রুদ্ধ ব্যাকুলতায় এদিক ওদিক তাকায়।

আরেকটি দিন কাটলো।

দেহ দুর্বল, মন আরো স্তিমিত। ধীরে ধীরে মীনাক্ষী নদীতে স্নান ক'রে আসে, কঙ্কর নদীপথ বেয়ে কতদূর চ'লে যায়। মীনাক্ষী তার দিকে চেয়ে থাকে। চোখ জ্বালা করে, মাথা ঘোরে, বুকের ভিতরে ধকধক করে। হঠাৎ হেসে বলে, পাগল!

পাগল ফিরে আসে রোদে পুড়ে। হাতের মুঠো খুলে বলে, এই ছাখো মীনাক্ষী, মরা পোকা। এরা দল বেঁধে চাষীদের ফসল নষ্ট করে। কত দুঃখের ফসল বলো ত?

তাই ব'লে মারলে তুমি?

মারিনি—কঙ্কর বললে, শুকনো মাঠে রোদে পুড়ে আপনিই মরেছে। মাঠে ত এখন ফসল নেই? কী সুন্দর দেখতে পোকাটা! বেগুনীর সঙ্গে সবুজের রেখা গায়ে, ডানা পালিশ করা, চোখ দুটিতে আকাশের মায়া।—এই ব'লে পোকাটা সে ছুড়ে ফেলে দিল। বললে, যাঃ—মরা!

মীনাক্ষী হেসে বললে, ফেলে দিলে? কিছু খাওয়ালে হয়ত বাঁচতে পারতো।

কঙ্কর তার মুখের দিকে তাকালো। কেমন একটা আকস্মিক সন্দেহে পুনরায় সে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চ'লে গেল। সেইখান থেকেই সে রুক্ষ স্বরে বললে, জানো না তুমি যে এখানে কিছু পাওয়া যায় না? কোত্থেকে খাওয়াবো?

কণ্ঠে তার কোথাও মাধুর্য নেই, যেন কেমন একটা বিচার-বিবেচনা-হীন নির্দয় রূঢ়তা। মীনাক্ষী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বসন্তকালের শুকনো নীরস পাতা যেন আগুনের তাত পেয়ে থর থর করছে,—জ্বলে উঠছে না দপ ক'রে, কিন্তু দগ্ধ হচ্ছে অন্তরে। কঙ্কর ক্ষমা চাইলো না, কেবল অন্য পথ দিয়ে নদীর দিকে নেমে গেল।

দূরের মাঠ তপ্ত রৌদ্রে তরবারির ফলকের মতো জ্বলছে। তৃষ্ণাদগ্ধ মৃত্তিকার নিশ্বাসের মতো এক প্রকার বাষ্প উঠছে উপর দিকে—তাম্র-নীলাভ মরীচিকার মতো; সেদিকে তাকালে চোখ জ্বালা করে। মীনাক্ষী পাষাণ মূর্তির মতো সেইখানে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কতক্ষণ পরে, মাঝখানে যেন একটা যুগ অতীত হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ পরে, কঙ্কর ফিরে এলো। সর্বাঙ্গে তার জল ঝরছে, মুখে চোখে জলঝরা চুলের রাশ নেমে এসেছে। নদীর সচ্ছলতাকে সে যেন সর্বশরীরে ভ'রে এনেছে। কাছে এসে ডাকলো, মীনু? ওকি, রাগ করেছ বুঝি?

মীনাক্ষী উত্তর দিল না, কেবল চেয়ে রইল তার দিকে। কঙ্কর এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো, বললে এসো আমার সঙ্গে। সেই থেকে তুমি দাঁড়িয়ে আছ এখানে?

নিরুপায় দুর্বল মেয়ে মানুষ; অনাহারে ক্লান্ত, উৎসাহহীন। কঙ্করের আকর্ষণে সে বাধা দিতে পারলো না, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রে সে নদীর জলে নেমে এলো।

কঙ্কর বললে, সাঁতার কাটো দেখি শৈবলিনীর মতন? কেউ কোথাও নেই, আজ সারাদিন কাটাবো নদীর জলে।—এই ব'লে সে মীনাক্ষীকে জলের ভিতরে ঠেলে দিল। নিজেও ডুব দিল। বিপরীত দিকে দুজনে বহুদূর সাঁতরে গেল।

জল থেকে উঠলো দুজনে, তখন অপরাহ্ণ। মীনাক্ষী তার ভিজা আঁচল নিংড়ে কঙ্করের মাথা মুছিয়ে দিয়ে বললে, কী দুরন্ত ছেলে!

আরেকটি দিন কাটলো।

* *

*

মীনাক্ষী? মীনু?

কঙ্কর ছুটতে ছুটতে এলো। মীনাক্ষী আঁচল পেতে শুয়েছিল চালাঘরের ঠাণ্ডা মেঝের উপর। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, শিগগির এসো, একখানা নৌকো ঠিক করেছি। পাঁচ টাকা বকশিশের লোভে রাজি হয়েছে, শিগগির এসো। ও কি, উঠতে পাচ্ছ না? আচ্ছা আমি ধরছি,—আজ শেষ করো দ্বীপান্তর বাস—

কঙ্কর গিয়ে তাকে তুলে ধরলো। আস্তে আস্তে তাকে হাঁটিয়ে এনে বললে, এই খেলাঘব স্মরণ ক'রে রেখো, মীনু। কিন্তু যাবার সময় এই প্রতিজ্ঞা করে চললুম, শহরকে এনে প্রতিষ্ঠা করব গ্রামে। যে-কদিন বাঁচবো, এই কাজেই লিপ্ত থাকবো।

মীনাক্ষী পিছন ফিরে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, এবার পাববো যেতে। তুমি ব্যাগ দুটো আনো।

কঙ্কর দৌড়ে গিয়ে চালাঘর থেকে ব্যাগ দুটো দু'হাতে আনলো। পিছনে তাকাবার আর প্রয়োজন নেই—অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে গ্রামবাসীর কাছে যে-ঘর পাওয়া গিয়েছিল, অতিশয় অবহেলায় তাকে ছেড়ে এলো দুজনে। এমনিই ওরা—এক হাতে গড়ে, অন্য হাতে ভাঙে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে। পৃথিবী নিতান্ত ছোট নয়।

গায়ে জামা নেই, কোমরে মালকোঁচা, খালি পা, রোদপোড়া অপরিচ্ছন্ন দেহ, এলোমেলো মাথার চুল—এমন চেহারায় কঙ্কর গিয়ে নৌকায় উঠলো। মীনাক্ষীর দিকে মুখ তোলা যায় না, সেই মীনাক্ষী নয়,—চাষীর ঘরে খুঁজলে এমন নোংরা কাপড়পরা এক আধটা মেয়ে পাওয়া যায় বটে। কঙ্কর তার দুই হাত ধ'রে নৌকার উপর সযত্নে তুলে নিল। বললে, আজ থেকে আবার নতুন যাত্রা, মীনাক্ষী।

ঘেরাটোপের ভিতরে সূর্যের তাপ বাঁচিয়ে দুজনে আশ্রয় নিল। নৌকা ছাড়লে হাত বাড়িয়ে নদী থেকে জল নিয়ে কঙ্কর মীনাক্ষীর কপালের উপর বুলিয়ে দিল। তারপর বললে, একটা আশ্চর্য দেখেছ? এ'কদিন দুজনের মধ্যে কোনো,—মানে,—

মুখ টিপে মীনাক্ষী বললে, তোমার সংযম আর অসংযম দু'রকমেরই বক্তৃতা শুনলে আমি ভয় পাই।

কেন?

মেয়েমানুষ হ'লে বুঝতে, ও দু'টোতেই হারাবার ভয়। তোমায় সংযম দেখলে হয় আতঙ্ক, আর অসংযমে হয় দুর্ভাবনা।—এই ব'লে হেসে মীনাক্ষী মুখ ফিরিয়ে নিল।

নদী নিস্তরঙ্গ। একান্তভাবে কান পেতে থাকলেও উপর থেকে নদীর কল্লোল শোনা যায় না। এমন অনেক কবি আছেন যাঁরা দূর থেকে নদী দেখলেই কল্লোলগীতি শুনতে পান—তাতে কবিতায় আবহ সৃষ্টির একটু সুবিধা হয় বৈকি। ফুল ফোটার শব্দ, তারকার কানাকানি, মৃত্তিকার গুঞ্জন, ডিম্বের ভিতরে পক্ষীশাবকের আর্তনাদ,—এমন অনেক ভেল্কি। তবু কঙ্কর কান পেতে রইল। স্তব্ধ নদীর ভিতরে যেন একটা ঘন, মূঢ়, অন্ধ প্রবাহ চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। দাঁড়ের শব্দ উপরের দিকে ছপ ছপ করছে। যতদূর দৃষ্টি চলে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে দুইপারে উদাসীন অরণ্যরেখা আকাশের শেষ সীমার দিকে অদৃশ্য হয়ে

গেছে। মাঝে মাঝে নামহারা কোনো কোনো গ্রাম সন্ন্যাসীর মতো নদীতীরে যেন জপে বসেছে। দূরে চরের উপর দিয়ে একখানা মাল বোঝাই নৌকার কয়েকটি লোক গুন টেনে চলেছে।

কঙ্কর প্রশ্ন করলো, কোন্ ঘাটে নামাবে মাঝি ?

মাঝি জানালো, আট মাইল দূরে মহাদেওগঞ্জে গিয়ে নৌকা ঘাটে লাগবে। সেখানে আজ অমাবস্যার মেলা, বাজার বসবে, থাকবারও জায়গা পাওয়া যাবে। 'তুম লোগ কাঁহা যায়গা ?

কঙ্কর বললে, রেল স্টেশন।

কৌন গাঁও ?

মীনাক্ষী তার গা টিপে বললে, চেপে যাও, বোকা ব'নে যেয়ো না।

ফস ক'রে কঙ্কর বললে, আমি বোকা! অসম্ভব!—এই মাঝি, কোন্ রেল-স্টেশনঠো নজ্‌দিগ্ ?

মাঝি এই কথা বললে, আপনারা কোন্ দিকে যাবেন জানতে পারলে ব'লে দিতে পারতুম। অনেক পথ অনেক দিকে গেছে।

রাগ ক'রে কঙ্কর বললে, জাহান্নমকা পথ বাৎলায় দেও।

মীনাক্ষী হেসে তাকে থামালো, তারপর বললে, তুমি চলো মাঝি, ওর কথা শুনো না। মহাদেওগঞ্জেই নামিয়ে দেবে চলো, আমরা মেলা দেখতে যাবো।

বহুৎ ভারি মেলা হ্যায়, মাইজি।

হাম্‌ভি জান্‌তা হ্যায়, চলো জল্‌দি জল্‌দি,—এই ব'লে মীনাক্ষী কঙ্করের দিকে ফিরে তাকালো। পুনরায় বললে, না খেয়ে খেয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে! অমন ক'রে ওদের সঙ্গে কথা কয় ? কবিকুঞ্জ তৈরী করতে গিয়েছিলে দুর্ভিক্ষের দেশে, এবার জব্দ হয়েছ ত ? মাটির তলায় শেকড় না থাকলে ওপর দিকে কখন ফুল ফোটে ?

ক্ষীণকণ্ঠে কঙ্কর বললে, কিন্তু আত্মনিগ্রহের পরীক্ষায় আমরা—

থামো !—মীনাক্ষী তাকে ধমক দিল, রস মেরে তত্ত্বের দিকে মন ছুটিয়ো না।

কঙ্কর অনুযোগ ক'রে বললে, তুমি কিন্তু মেলা দেখতে পাবে না, ব'লে রাখলুম! আগে আমাকে পুরি-তরকারি আর মিষ্টি খেতে দিতে হবে, নৈলে তোমার মতন অলক্ষ্মীর সঙ্গে আর বাস করবো না।

হাসিমুখে মীনাক্ষী বললে, রাগে একবারে গরগর করছে! খাবার দেখলে তুমি দেখছি ফাঁসীর খাওয়া খাবে।

তুমিই কোন্ না খাবে দুর্ভিক্ষের খাওয়া ?

হিসেব ক'রে কথাটা বলোনি। খাবার ইচ্ছেটা আছে, কিন্তু মুখের রুচিটা গেছে এই কয় দিনে। মনে রেখো যা খেতে দেবো তা কিন্তু তোমার ওসব নয়।

তবে ?—বিস্ময় প্রকাশ ক'রে কঙ্কর বললে, ভাত-রুটি ? পোলাও-মাংস ? দুধ-ছানা ? স্যালাড্-পোরিজ ? ফল-মূল ? দুধ-দই ?

ঘাড় নেড়ে মীনাক্ষী বললে, কিছু নয় !

তবে কি ? তবে কি খুন করতে চাও তুমি আমাকে ?—কঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলো। নৌকাটা একবার টাল খেয়ে গেল।

মীনাক্ষী তাকে বাঁ হাতে ধ'রে আবার শোয়ালো। তারপর এই বন্য ব্যাঘ্রের পিঠের উপর হাত বুলিয়ে বললে, বাবারে আমাকেই না খেয়ে ফেলো। কী সাংঘাতিক তোমার আত্মনিগ্রহের প্রতিক্রিয়া—

আগে বলো কী খেতে দেবে !

তোমার মতন মহাত্মার উপবাস ভাঙাতে হ'লে সকলের আগে দেবো কমলার রস অঞ্জলি ভ'রে।

যদি না পাওয়া যায় ?

তাহলে দেবো শাকসিদ্ধ ঝোল।

কঙ্কর তার প্রস্তাবে উষ্মা প্রকাশ ক'রে বললে, তার চেয়ে বরং বৃটিশ ভারতীয় ছাগলের দুধ দিয়ো।—এই ব'লে সে চুপ ক'রে পড়ে রইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, রেল স্টেশনের কথা জিজ্ঞেস করছিলে কেন? কল্‌কাতায় ফিরবে?

কঙ্কর বললে, পাগল নাকি? অত ছোট জায়গায় আমাদের ধরবে কেন?

মীনাক্ষী বললে, বেশ, সেই ভালো। আমিও যাবো না, তোমাকেও যেতে দেবো না। ছড়িয়ে থাকবো সারা ভারতবর্ষে। যেদিন সত্যিকার কাজ খুঁজে পাবো, সত্যি সত্যি যেদিন জানবো কী করতে হবে, সেইদিন দেশে ফিরবো।

কঙ্কর কেবল বললে, আমারও তাই মত। কাজের কথা ভাববো পথে পথে।

## বারো

এর পরে দুমাস পর্যন্ত দুজনের কোনো সন্ধান মেলেনি। পিছন পথের কোনো চিহ্ন নেই, চরণচিহ্ন-রেখা তারা মুছে মুছে চলে গিয়েছে—সম্মুখ ভবিষ্যতেরও কোনো নির্দেশ পাওয়া যায়নি। চৈত্র ও বৈশাখ মাস চ'লে গেছে, পশ্চিম দেশে যেটুকু সরসতা ছিল তাও আর কোনো পথে-প্রান্তরে খুঁজে পাওয়া যায় না। দিনের বেলা সমস্ত দেশ জুড়ে চিতা জ্বলে, রাত্রে তার নির্বাপিত ভস্মরাশি থেকে একপ্রকার উত্তাপ ঝল্‌সে উঠতে থাকে।

যারা অল্পে তুষ্ট নয়, যারা পৃথিবীর কোন আশ্রয়কেই অসন্তুষ্ট জীবনের সঙ্গে মানানসই করতে পারেনি তারা স্বতন্ত্র পথে চলে। তাদের পথে পথে দুর্যোগের হানা, তারা পদে পদে মান খোয়ায়, প্রাণ খোয়ায়,—পরম যত্নে বাঁধে নীড়, পরম উপেক্ষায় সর্বনাশ ক'রে পালায়।

নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলা অনেকটা কবিত্বময়, অনেকটা বয়োধর্মের একটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ অভিসার। কিন্তু তবু ত যাওয়াটা মিথ্যে নয়, এ যেন একটা স্বভাবধর্মের ভঙ্গী। এক রকমের মানুষ আছে যাদের শিক্ষা পথে পথে, যারা চলতে চলতে পায়, আর ফেলে ফেলে চলে। কিন্তু এটাও যেন একটু কবিত্বময় হোলো। তাহলে স্পষ্টই বলা যাক, এটা ওদের ভ্রমণের নেশা। কিন্তু নেশাটা মন্দ নয়। এই নেশাতেই পেতে পারে ওরা ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত, এই নেশাতেই পেতে পারে ওরা একটা গভীরতর উপলব্ধি—যেটা সহজে পাওয়া যায় না এবং একবার পেলে ছাড়া যায় না। স্পষ্ট ক'রে ওরা বুঝতে পারেনি দুজনের এই বেপরোয়া প্রবৃত্তি কোথা থেকে উৎসারিত হচ্ছে, সহজ ক'রে ওরা ধরতে পারেনি ওদের মধ্যে এই গতিশীলতার বেগ কেন। অথচ ওরা ছেড়ে দিয়েছে নিজেদের—যেমন ক'রে বসন্ত বাতাসের তাড়নায় ঝরাপাতা নিজেদের ছেড়ে দেয়।

যে-শক্তি ওদের চালিয়ে বেড়ায়, যেটা কেবলই ঠেলে দেয় সম্মুখের দিকে, যেটা ওদেরকে বাঁধন স্বীকার করায় না, সেটাকেই বলা যেতে পারে আত্মতাড়ন-শক্তি। তার মধ্যে কেবলমাত্র সংহারের বেগই নেই, কিন্তু সৃষ্টিরও আবেগ রয়ে গেছে। যেটা মরণশীল, ক্ষয়িষ্ণু, সেটার প্রতি ওদের মোহ নেই, সেটার জীর্ণতাকে ওরা রঙে রসে মমতায় মায়াময় ক'রে তুলতে চায় না। সেইজন্য ওরা নির্দয়ভাবে বাস্তবিকতার সম্মুখীন হোলো, আগে নিজেদের ঘরই ভেঙে দিল। নিজেদের কাছে নিজেরাই একটা ভাঙনের আদর্শ তুলে ধ'রে বললে, আমরা সেই জীবনকেই কামনা করি যার মধ্যে দয়া অথবা কৃপার অলীক

আত্ম-প্রতারণা নেই। বলশালিনী কল্পনার পরে ওদের একটা নিগূঢ় আকর্ষণ রয়ে গেছে, যেটা বৈষ্ণবী করুণায় পুরাতনের দিকে চেয়ে অশ্রুবিগলিত হয় না, যেটা স্থলভ দরদ প্রকাশ ক'রে জনপ্রিয়তার তোয়াক্কা রাখে না।

দুমাস পরে আবার দুজনে আবিষ্কৃত হোলো। মধ্য ভারতের পথ দিয়ে ওরা গিয়েছিল রাজপুতনার দিকে। উদ্দেশ্যটা ছিল স্পষ্ট। মীনাক্ষী ধ'রে বসেছিল, মরুভূমির চেহারাটা দেখে আসতে হবে। রাজপুতনার ভিতর দিয়ে ওরা গিয়েছিল কাথিয়াবাড়ের পশ্চিমে নির্জন আরব সমুদ্রের উপকূলে। কঙ্কর ধ'রে বসেছিল, সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখাবো, দেখবো প্রথম তারকার অভ্যুদয়। মীনাক্ষী বললে, মরুবাসিনী চিতোর আর উদয়পুর দেখাবো, হিন্দু শৌর্য আর বিক্রমের হাওয়ায় নিশ্বাস নেবো। তথাস্তু। কঙ্কর বললে, আমি দেখবো আধুনিক ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্র,—যেখানে নানা-সাহেব, তাঁতিয়া তোপী আর রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রথম ইংরাজের চক্রান্তকে ভেদ করেছিলেন। আধুনিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে তীর্থস্থান, কথাকথিত ইংরেজি ইতিহাসে যেটা সিপাহী বিদ্রোহ নামে কুখ্যাত,—দর্শন করবো সেই পুণ্য শ্মশান। মীনাক্ষী বললে, পরাধীনতার প্রথম প্রতিবাদ ওঠে এক স্ত্রীলোকের রক্তাক্ত কণ্ঠে, তারই রক্ত নিয়ে ইংরেজ লাল রঙ বুলিয়েছে সারা-ভারতে। কঙ্কর বলেছিল, আমি দেখবো সমগ্র উত্তর ভারত, যেখানে হিন্দু-সভ্যতার জন্মস্থান, যেখানে মোগল সাম্রাজ্যের সমাধিক্ষেত্র। সেখানে শুনবো নির্জন খররৌদ্রে দিল্লী দুর্গের দরজায় অন্ধ ফকিরের একতারা বাজানো দেহতত্ত্বের গান। মীনাক্ষী বলেছিল, আমি শুয়ে থাকবো একা আগ্রা-দুর্গের অন্ধকার সিঁড়ির নীচে,কান পেতে শুনবো প্রেত আর প্রেতিনীর নিঃশব্দ কান্না, যেখানে ক্ষুধার্ত আত্মার দল এসে দাঁড়াবে আমাকে ঘিরে। কঙ্কর বলেছিল, আমি যাবো বৃন্দাবনের পরপারে নিভৃত অরণ্যে, যেখানে প্রকৃতি চিররাধার বেশে মুখ তুলে রয়েছেন আকাশের চির ঘনশ্যামের দিকে লাখ লাখ যুগ ধ'রে।

নিরুদ্দেশ পথের সমুদ্রে তারা ডুব দিয়েছিল, দু'মাস পরে আবার তারা ভেসে উঠলো দূর উত্তর ভারতের এক ক্ষুদ্র স্টেশনের ধারে। কঙ্করের পরণে একটা আল্‌গা পায়জামা, গায়ে শার্ট ও কোট, পায়ে কাবুলী আংটা বাঁধা জুতো, হাতে একটা ছড়ি,—মাথায় হিন্দুস্থানী টুপি। টুপিটার তলা দিয়ে তাম্রবর্ণের ঘন কোঁকড়া চুল মালতীলতার গুচ্ছের মতো ঝুলে পড়েছে; মীনাক্ষীর পরণে জয়পুরী রেশমের শাড়ী পাঞ্জাবী মেয়েদের ধরণে দক্ষিণ স্কন্ধের উপর ফেলা; বামবাহু নগ্ন; বামবক্ষ সুস্পষ্ট—রেশমী জামার আবরণে ঝলসিত; দুহাতে কয়েকগাছি ভাটিয়া প্যাটার্ণের চুড়ি, বাঁ হাতের ছোট আঙুলে একটি হীরার আংটি, মাথার পিছনে খোঁপায় লাল মিনা-কাজকরা একটা সোনার ফুল, কানে গোল্ডষ্টোনের দুটি আঙট, গলায় সরু চেনের সঙ্গে একটি বড় স্বর্ণতারকা রক্তপ্রস্তর খচিত, পায়ে একজোড়া বেগুনী পালিশের বোম্বাই স্যাণ্ডেল্।

অর্থাৎ দুজনেই বাঙ্গালী নয়। একজন গুজরাটি মেয়ে, অন্যজন একটি সৌখীন পাঞ্জাবী যুবক। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সকলের ঈর্ষা উদ্রেক ক'রে দুজনে রাত্রে এক হোটেলে রাত্রিভোজন শেষ ক'রে স্টেশনে এসে দাঁড়ালো।

পরদেশী পোষাকটা তাদের চেহারার পক্ষে অনুকূল। দুজনের বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের পরে এসেছে একটি সুস্পষ্ট রক্তাভাস, যেটি বাঙ্গালীর পক্ষে সুলভ নয়—সর্বাঙ্গে একটি ফিকে গেরুয়ার রং ধরেছে। সাজসজ্জার বৈচিত্র্যটা তাদের প্রিয়। বর্মায় গেলে তাবা পরতো বর্মীর সাজ, দক্ষিণে গেলে তারা বেগুনী-পাড়ের উপর জরির আঁচলা দেওয়া পোষাক ব্যবহার করতে পারতো। কে বলতে পারে তারা উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে পরবে না শালোয়ার আর শিরোপা? বহুরূপের মধ্যে নিজেদের উপলব্ধি করা তাদের একটা প্রবল আকর্ষণ, পরিবর্তন-শীলতাব প্রতি তাদের একটা আজন্মের মোহ।

কোন্ দিকে যাবে বলো?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

মীনাক্ষী জবাব দিল, বাঙ্গলা দেশ ছাড়া যে কোন দিকে।

বাঙ্গলা দেশ নয় কেন ?

বিশ্রাম নেওয়া যাবে এমন একটা জায়গা বের করো।—মীনাক্ষী বললে, বিশ্রাম নেবার পর যাবো বাঙ্গলায়। গিয়ে কাজে নামবো।

একটি সাহেবী পোষাকপরা লোক তাদের লক্ষ্য করছিল, কঙ্কর এগিয়ে গিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলো, আপ ট্রেন কখন্ বলতে পারেন ?

কোথায় যাবেন ?

বিরক্ত হয়ে সে জবাব দিল, আপ ট্রেনে।

ঘড়ি দেখে ভদ্রলোক বললেন, বারোটা পাঁচ মিনিটে।

থ্যাঙ্কস্।—ব'লে সে ফিরে এলো। বললে, কোথাকার টিকিট করবো বলো ত ?

মীনাক্ষী বললে, গাড়ী যতদূর যাবে।

কিন্তু তুমি যে বললে বিশ্রামের জায়গা চাই। বলো, কোথায় বিশ্রাম নিতে চাও ?

স্থায়ী বিশ্রাম চাইলে বলতুম খুব দূরে চলো যেখানে খুব বড শহর—যেখানে বিলাসের উপকরণ প্রচুর, হাতে টাকা থাকলে যেখানে তুমি ছাডাও আমি বেশ আনন্দে কাটাতে পারি।—মীনাক্ষী বলতে লাগলো, কিন্তু সেই কুৎসিত বিশ্রাম আমি করতে চাইনে, কাঁকর।

তবে ?—কাঁকর প্রশ্ন করলো।

কঙ্করের হাত ধ'রে সাদরে মীনাক্ষী বললে, এমন একটা অস্থায়ী শান্তি-নিকেতন খুঁজে বা'র করো যেখানে তোমার এই হাত ছাডা মাথা রেখে শোবার আর কিছু নেই। যেখানে চারিদিকের ঐশ্বর্য ফেলে রেখে আমরা সর্বত্যাগ ক'রে থাকতে পারবো।

তার মানে কি, মীনাক্ষী ?

রাত্রির স্টেশনের আলোয় মীনাক্ষী একটি কিশোরী বালিকার মতো

পুরুষের হাতের পাশে মুখ লুকিয়ে বললে, গুছিয়ে বলতে পারিনে, তুমি ভেবে নাও।

হাসিমুখে কঙ্কর তার মুখ ফেরাতেই মীনাক্ষী লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। বললে, আজ অবধি একটি দিনও তোমাকে কাছে পাইনি, আর আমি শুনবো না।

কঙ্কর তার হাত ধ'রে বললে, চলো একটু বসি ওই বেঞ্চিটায়।

রাত্রির স্টেশনের একটা অদ্ভুত মোহ আছে। নানা লোক চলেছে নানা দিকে, কিন্তু তারই ভিতরে কেমন যেন একটি উদাসীন নির্জনতা। দুই জোড়া লৌহপথ যেন কোন্ অজানা পথ ধ'রে এসে অজ্ঞাত অন্ধকারের দিকে চ'লে গেছে, কেবল মাঝখানের অল্প আলোয় তারা কিছু দৃশ্যমান। যেন চারিটা লৌহরেখার একপ্রান্তে প্রাচীন অতীত, অপর প্রান্তে নিরুদ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। মানুষ যারা এখানকার, তারা যেন এক একটি ইতিহাসের ছায়ামূর্তি। কোথাও দুইটা এঞ্জিনের ঘর্ষণশব্দ, কোথাও অলক্ষ্য হুইসেলের আওয়াজ, কোথাও ফেরিওয়ালার অস্পষ্ট চীৎকার, কোথাও বা পথহারা ক্ষুধার্ত এক একটা কুকুরের আর্তনাদ। কত যাত্রী কত পথে ধাবিত হচ্ছে, কে কোথায় চলেছে, কোন্ কাজে, কোন্ টিকিটঘরে কোন্ মানুষের অন্তিম লক্ষ্যের হিসাব চলছে,—কোনো কিছুর কোনো ঠিকানা নেই। রাত্রির স্টেশনের আলোছায়া কোনোটাকেই যেন সত্য ব'লে মনে হয় না—নিজেদেরও যেন মনে হয় অবাস্তব কোনো স্বপ্নচারী জীব, —যাদের আবির্ভাব আর তিরোভাবের কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই।

বেঞ্চে ব'সে দুজনে সেইদিকে চেয়ে কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইল। আপ ট্রেনের এখনো দেরি রয়েছে। সারাদিনের একটা ক্লান্তি ছিল দুজনের দেহে। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে উঠে তারা দেখেছে প্রতি নূতন দেশ—একটি দেশে একদিন থাকা এই যথেষ্ট। কখনো সময়ের বেহিসাবে তারা থেকেছে ধর্মশালায়, কখনো দোকানঘরে, কখনো ওয়েটিং রুমে, আবার কখনো বা অভিজাতীয় কোনো

হোটেলে। কিন্তু আজ সারাদিনে তারা তিনবার যাত্রাভঙ্গ করেছে। সকালে চা ও প্রাতরাশ সেরেছে তিন শত মাইল দূরের এক শহরে, মধ্যাহ্ন ভোজন ও স্নান হয়েছে কুমায়ুনের এক জনপদে। আবার রাত্রে এখানে।

কঙ্কর বললে, ছি মীনাক্ষী, কী বললে তুমি বলো ত?

মীনাক্ষী ফস ক'রে চ'টে উঠে বললে, ওই অমনি একটা ছুতো পেয়ে তুমি লজ্জা দিতে চাও। সত্যি কথাই ত বলেছি, একদিনও তোমাকে কাছে পাইনি।

আর এই যে চারমাস ধ'রে রয়েছি তোমার সঙ্গে প্রায় দিবারাত্র?

চার মাস ধ'রে? মনে হচ্ছে চার মিনিটও নয়।

ছি মীনাক্ষী!

মীনাক্ষী তার মুখের দিকে একবার তাকালো, সহসা তার মুখের ভিতর থেকে উঠে এলো এক ঝলক হাসি—যে হাসি মায়াবিনীরাই কেবল হাসতে জানে এই জনহীন স্টেশনের নিভৃত আলোছায়ায়,—হেসে সে কঙ্করের পিঠের পাশে মুখ লুকিয়ে বললে, আর বলবো না, ক্ষমা করো। বড় দুর্বল আমি।

কঙ্কর বললে, তুমি দুর্বল? পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকলে পাথরও এতদিনে ভাঙতো,—একবিন্দু দুর্বলতাও তোমার নেই। মীনাক্ষী, মিছে কথা বলো না।

মীনাক্ষী বললে, হাতটা ছড়িয়ে দাও বেঞ্চির আগায়, মাথা রেখে ঘুমোই। ঘুম পেয়েছে।

হাতের উপর মাথা রেখে চোখ বুজে পুনরায় সে বললে, ভয় করে তোমাকে নিয়ে ফিরতে, পাছে তোমায় নষ্ট ক'রে ফেলি।

এ কেমন প্রলাপ তোমার?—কঙ্কর প্রশ্ন করলো।

ভয় করে পাছে তুমি পুড়ে খাক্ হয়ে যাও।

তোমার এই আত্মগরিমা প্রকাশের হেতু?

মীনাক্ষী হাসলো। বললে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখো দেখি আমার দিকে।

কঙ্কর বললে, এই ত দেখছি! কতকগুলো শরীর-বিজ্ঞানের লক্ষণ, কতকগুলো প্রাকৃতিক কার্যকারণ। আর দেখছি সর্বশরীরে একটা মনোহর অশ্লীলতা, যেগুলোর বর্ণনায় মাত্রাদোষ ঘটলে তরুণ সাহিত্য হয়ে ওঠে। আর যা আছে সেগুলো পুরাকাল থেকে পুরুষগুলোকে বোকা বানায়, নীচে নামায়। আরও যদি কিছু থাকে তবে তা সৃষ্টির চরম লক্ষ্যের দিকে নির্দেশ করে।

মীনাক্ষী বললে, এইটুকু মাত্র ?

এর বেশি একটুও না।

যদি বলি আরো আছে ?

সেটা মায়া।—কঙ্কর বললে, সেটা ছলনা। সেটাই মেয়েদের অস্ত্র, সেটাই তাদের দৈন্য। কেন পরেছ কাঁকন, কেন পরেছ মোহিনীর বেশ ? দেহসর্বস্ব মেয়েমানুষ বোঝে দেহকে অলঙ্কৃত না করলে তার অন্ন নেই। চোখে আছে মায়া, ভঙ্গীতে আছে ছলনা, দেহে আছে অলঙ্কার, পায়ে আছে নূপুরের নিক্বন,—এমন অদ্ভুত জীব, এমন বিচিত্র, তাই ত তোমাদের ওপর পুরুষের এত আকর্ষণ।

অনেক কথা শিখেছ।—ব'লে মীনাক্ষী হাসলো।

মানে ?

মানে, বিশ্রামের জায়গা এখনো দিতে পারোনি তাহলে দেখতে সব ছাড়িয়েও আরো কিছু রয়ে গেছে। দেখলে এতটুকু, পেলে তার চেয়েও কম,—সমুদ্রের ধারে ব'সে কেবল ঢেউ গুণেই কাটালে।

তুমি কি সত্যিই বিশ্রাম নিতে চাও, মীনাক্ষী ?

চোখ চেয়ে মীনাক্ষী মাথা তুললো। বললে, চাই, চাই, চাই! ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখলে, তিল তিল ওজন ক'রে নিলে, অথচ সমগ্রটার দিকে চোখ পড়লো না। পুঁজি যা ছিল তাই দিয়ে দিগ্বিজয় করতে পারতুম, কিন্তু তোমাকে পেতে গেলে যে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়—সব দিয়েও যা বাকি থাকে তাই নিয়েই তোমাকে পাবো এই আশা যে মনে।

কঙ্কর বললে, তুমি ত আমাকে সবই দিয়েছ, মীনু।

মীনাক্ষী বললে, দাম্ভিক তুমি তাই তোমার ধারণা এমন মিথ্যে। সব দিয়েছি ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত ? মিথ্যে, মিথ্যে। সারা জীবনেও তোমার নেওয়া ফুরোবে না, এত দান আমার হাতে রয়ে গেছে। দেহসর্বস্ব ব'লে ঠাট্টা করবে ? মায়াবিনী ব'লে করবে বিদ্রূপ ? হায় রে, এটা দেখলে না যে, সিংহশিশুকে নিয়ে খেলায় মেতেছি কোন্ মন্ত্রে ? সে কি কেবল দেহতন্ত্র, না মায়ামন্ত্র ?

স্তব্ধ হয়ে কঙ্কর বললে, কী বলতে চাও ?

বিশ্রামের নিভৃত কোটরে আগে নিয়ে চলো।—মীনাক্ষী বললে, সেইখানে যুদ্ধ ঘোষণা করো, তখন জবাব দিতে পারবো।

অর্থাৎ, সেখানে তুমি স্বভাবের আবরণ উন্মোচন করবে, এই ত ? একটা প্রবলতরো উন্মাদনা প্রকাশ করবে, কেমন ?

তার চেয়েও বেশী।—মীনাক্ষী ব'লে উঠলো, চিতা রচনা করবো, তুমি মরণান্ত জ্বালায় জ্বল্‌বে তারই ওপর। দেখবো তোমাকে যা কখনো দেখিনি, জানাবো তোমাকে যা জানতে পাবোনি। জনতাব মাঝখানে ঘুরিয়ে আমাকে ক্লান্ত করেছ, লোকলজ্জার বেড়াজালে বেঁধে আমাকে করেছ পঙ্গু, সভ্যতার বিধিনিষেধে আমাকে ক'রে তুলেছ তুমি আড়ষ্ট। একবাব সাহস ক'রে নিয়ে চলো সেই পটভূমির সামনে যেখানে থাকবে না আমার লজ্জা, ভয়, মান ; যেখানে যাবার আগে সকল পায়ের দাগ মুছে দিয়ে সহজ হয়ে যেতে পারবো, যেখানকার নিরুদ্দেশ নির্বাসনে সকল বাঁধন অবাধে আলগা ক'রে দেওয়া একটুও কঠিন হবে না,—পারো কাঁকর, সেই স্বর্গে নিয়ে যেতে ?

পারি।

তাহলেই দিতে পারবো আমার সত্য পরিচয়। একথা জানাতে পারবো, এতদিন যে-জীবন যাপন করেছি, সেটা কেবল বৃহত্তর পরিচয়ের ভূমিকা মাত্র। —এই ব'লে দৃঢ় হয়ে মীনাক্ষী মাথা উঁচু ক'রে বসলো।

কঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বেশ, নিয়ে যাব তোমাকে সেই স্বর্গে।—এই ব'লে সে টিকিট কাটতে চলে গেল।

গাড়ী এসে পৌছবার তখন ঘণ্টা প'ড়ে গেছে।

স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় ছিল চামড়ার ব্যাগছুটো। কেবল তাই নয়, ভ্রমণ উপলক্ষ্যে জুটেছে বিছানার সজ্জা—তার রেশমী তোষক, পশমী বালিশ,—হোল্ড্ অল্-এ বাঁধা। একটা তেরপলের আঙটবাঁধা ঝোলা,—তার মধ্যে রান্না আর ভাঁড়ার ঘর বন্দী। এ ছাড়া জুটেছে একটা ক্যান্ভাস পোর্টম্যান্টো—তার মধ্যে সখের আর সৌখীনতার বাজার। বোম্বাইয়ের পার্শী সিল্ক্, অজন্তার পুতুল, পঞ্চবটীর মন্দির, সমুদ্রের শামুক, ঝাঁসীর খেল্না, আগ্রার পাথরের তাজমহল, জয়পুরী পাথর বাটী, পিতলের বুদ্ধমূর্তি, বৃন্দাবনের ছাপা শাড়ী—অর্থাৎ খেয়ালের দরজা খোলা ছিল, অনেক এসেছে হঠকারিতায়, অনেক গেছে অনবধানে।

শেষ রাত্রে কুলীর কলরবে তাদের ঘুম ভাঙলো। চাদর মুড়ি দিয়ে মীনাক্ষী কুঁকড়ে শুয়েছিল কঙ্করের কোলে মাথা রেখে, আর কঙ্কর ঘুমিয়েছিল জানলার শাসিতে মাথা হেলিয়ে। ঘুম ভাঙলো দুজনের।

এখানে নামতে হবে, মীনু।

না। বলে মীনাক্ষী ঘুমচোখে তাকে আর একটু আঁকড়ে ধরলো।—নামতে দেবো না।

কঙ্কর বললে, নামতে হবেই যে।

মীনাক্ষী বললে, আঃ নিবিড় উত্তাপ তোমার কোলে। এমন ঘুম ভাঙিয়ো না কাঁকর, লক্ষ্মীটি! রাত কত?

ভোর হয়েছে।

মিছে কথা। এখনো রয়েছে তারা, এখনো পাখী ডাকেনি,—রাত রয়েছে, আর একটু ঘুমোও।

দেখতে চাও ভোরের আলো? দেখো উঠে।

মীনাক্ষী তবু মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। বললে, ওটা ভোরের আলো নয়, কাকজ্যোৎস্না!

কিন্তু এমন কাব্যটা ভেঙে গেল একদল কুলীর উৎপাতে। তারা গাড়ীর ভিতরে উঠে বললে, কুলী চাই বাবু, কুলী।

কঙ্কর তাদের দিকে চেয়ে করজোড়ে নিবেদন করলো, প্রিয়তমা বোল্‌তা হ্যায় এখনও সকাল হুয়া নেই, সুতরাং হামলোক নেই নামেগা। বোল্‌তা হ্যায় আকাশমে তারা জাগা হ্যায়, পাখী নেই ডাকা হ্যায়—

মীনাক্ষী হাসতে হাসতে উঠে বসলো, বললে আঃ, হিন্দী বলবার কী ছিরি! হয়েছে, থামো। এই কোলী, মাথামে জিনিষপত্তর উঠায় লেও। খুব সাবধান কর্‌কে—

এমন অনবদ্য হিন্দীভাষা শুনে কঙ্কর চুপ করে গেল।

মীনাক্ষী বললে, বাবারে কী শীত! কোথায় এলে বলো ত?

চেয়ে দেখো মুখ বাড়িয়ে, এসেছ হিমালয়ের পায়ের কাছে। এসো, এখান থেকেই যাবো অজ্ঞাতবাসে।

খুশী হয়ে মীনাক্ষী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলো, দেখতে চাই তোমার চেয়েও হিমালয় বিরাট কিনা। আমাদের অজ্ঞাতবাসটাই হবে বিরাটপর্ব।

জিনিষপত্র সমেত দুজনে গাড়ী থেকে নেমে এলো। তখন সত্য সত্যই প্রভাতের আলো যেন একটা নূতন জীবনের মতো উদ্ভাসিত হচ্ছে। তখনও রাঙা হয়নি পর্বতের চূড়া, কেবল কোমল উদার নীলাভা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। স্টেসন নিরিবিলি, দুরচারজন তীর্থযাত্রী কেবল যে-যার পোঁটলা পুঁটলী নিয়ে অগ্রসর হয়ে গেল। তারপর গাড়ীখানা ছেড়ে চলে গেল পার্বত্য পথে একটা

গুরু গুরু প্রতিধ্বনি তুলে। আর কোথাও কিছু নেই, যতদূর দৃষ্টি চলে পর্বতের কণ্ঠে কণ্ঠে কেবল প্রভাতের পাখীর মধুর কলকাকলী। মীনাক্ষীর চোখে তখনও যেন সম্পূর্ণ ঘুম ভাঙেনি, তখনও কাজলের মতো চোখের পল্লবে লেগে রয়েছে গত রজনীর সুখনিদ্রার আবেশ-বিহ্বলতা। চেয়ে চেয়ে সে বললে, কঙ্কর, এত' সেই সাহেবী পোষাক পরা দার্জ্জিলিঙের হিমালয় নয়!

কঙ্কর বললে, চেয়ে দেখো চারিদিকে চোখের ঘুম ভাঙিয়ে। এ হচ্ছে গেরুয়া জড়ানো মহাযোগীর তপোবন। এ জন্মে এর নাম 'হর-কি-পারি'!

কঙ্করের কোমরে হাতখানা জড়িয়ে মীনাক্ষী ললিতকণ্ঠে বললে, এই আমি চেয়েছিলুম।

চলো, ধর্ম্মশালা খুঁজে বার করি।

কয়েক পা যেতেই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। পাশ থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, ওহে কঙ্করকুমার!

পূর্বজন্মের একটা গহ্বর থেকে যেন কে ডাকলো। কঙ্কর মুখ ফিরিয়ে তাকালো। চিনতে একটু দেরী হোলো বৈকি। সাহেবী পোষাক পরা একটি সৌম্যদর্শন বয়স্ক যুবক। মাথায় টুপি নেই, গলায় নেকটাই নেই, তার বদলে শার্টের কলারটা ওলটানো। সঙ্গে সরু শিকলে বাঁধা একটি নধর কুকুর। হাসিমুখে কঙ্কর এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধ'রে বললে, চেনবার মতন চেহারা আপনার নেই, মৃগেনদা। চুল পেকেছে আপনার।

অকালে পাকেনি হে, যথাকালে এবং যথাসময়ে—তারপর, তুমি যে এই দূর দেশে হঠাৎ?

আপনিই যে হঠাৎ? আশ্চয হয়ে গেছি আমি। এই যে, আমার সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর নাম মীনাক্ষী দেবী, আর ইনি আমাদের মৃগেনদা, ডাক্তার মৃগেন চৌধুরী।

পরস্পরের নমস্কার বিনিময় হোলো। মৃগেন্দ্র বললেন, কোথায় থাকা হবে

কিছু ঠিক আছে? কঙ্করকে ত জানি ছোট থেকে, একটু পাগলের ছিট আছে। আপনি বলুন ত মীনাক্ষী দেবী?

মীনাক্ষী হাসিমুখে বললে, ধর্মশালায় থাকতে বেশ লাগে। জানলা নেই, দরজা নেই, দেওয়ালে কাঠকয়লার আঁজিবুঁজি কাটা,—গাঁটকাটা, সাধু, গোরু, মানুষ—সব একাকার। আপনি কি ধর্মশালা পছন্দ করেন না?

বড বড চোখে মৃগেন্দ্র সবিস্ময়ে তাকালেন এই রহস্যময়ীর দিকে। তারপর বললেন, বুঝেছি, আপনিও তাই। বেশ, একটুও ভয় পাবো না। দুই তাল বেতালের ব্যবস্থা আমিই করব। চলুন আমাব বাসায়।

সে কি মৃগেনদা, আমরা যে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার জন্য এসেছি।—কঙ্কর আবেদন জানালো।

বেশ ত, যা খুশি করো। আহার নিদ্রার কেন্দ্রটা কেবল আমার ওখানে, তারপর তোমাদের যা ইচ্ছে।

মীনাক্ষী বললে, আপনার কত অসুবিধে হবে!

মৃগেন্দ্র বললেন, যদি অসুবিধে হয়ই, আপনি তার ব্যবস্থা করতে পাববেন না?

মীনাক্ষী মুখ তুলে তাঁর প্রতি একবার তাকালো। স্নেহে সিক্ত প্রিয় দর্শন সেই মুখ, বন্ধুতায় উদ্দীপ্ত, নম্রতায় মধুর। সে বললে, বেশ চলুন। কিন্তু আপনি স্টেশনে এসেছিলেন কি জন্যে? আপনার কাজ ত হোলো না?

মৃগেন্দ্র একবার তাকালেন রেলপথের দিকে, তারপর সময় দেখলেন হাত ঘড়িতে। বললেন, এই গাড়ীটা য়্যাটেণ্ড করতে এসেছিলুম, আর কোনো কাজ ছিল না।

কারো বুঝি আসবার কথা ছিল, ডাক্তারবাবু?

হ্যাঁ, এলেন না তিনি। আসুন আপনারা।—এই ব'লে মৃগেন্দ্র কুকুরটিকে নিয়ে প্লাটফরম্ থেকে বেরিয়ে এলেন। ওরা এলো সঙ্গে সঙ্গে।

একখানা ছোট মোটর দাঁড়িয়েছিল। কুলীরা এসে তার পিছনে জিনিষপত্র-গুলি বেঁধে দিয়ে মজুরি নিয়ে চলে গেল। কঙ্কর ও মীনাক্ষী উঠলো পিছনের সীট-এ, মৃগেন্দ্র নিজেই গাড়ী চালাবেন। কুকুরটাকে তিনি পাশে তুলে নিলেন।

গাড়ী চলতে চলতে কঙ্কর বললে, আপনার সঙ্গে সাত বছর পরে দেখা, মৃগেনদা। বিলেত থেকে ফিরলেন কবে?

মৃগেন্দ্র বললেন, এই বছর দুই হোলো। শেষের বছরটা আমেরিকায় ছিলুম! হ্যাঁ, তা প্রায় সাত বছরই হোলো বৈকি!

কঙ্কর কৌতুক ক'রে বললে, আপনার সেই ধনুর্ভাঙা পণ এখনও আছে, মৃগেনদা?

মৃগেন্দ্র হেসে উঠে বললেন, চুল পেকে গেলরে পাগলা, ওসব কথা আর বলে না।

মীনাক্ষী হতাশ হয়ে বললে, যাঃ আদ্ধেক আনন্দই মাটি, মনে করেছিলুম বৌদিদির সঙ্গে খুব ভাব করব গিয়ে। তাল-বেতালকে চললেন নিয়ে, গিয়ে দেখবো হয়ত ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ছড়ানো পাগলের বাসা! বাঃ কী চমৎকার নদী, কী নীল! ভারি সুন্দর দেশে আপনি থাকেন কিন্তু।

মৃগেন্দ্র বললেন, হ্যাঁ প্রাকৃতিক দৃশ্যে এদেশটা খুব সুন্দর। এমন পাহাড় আর নদীর শোভা ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই। থাকতে থাকতে দেখবেন সব সাধুসন্নিসির আড্ডা—কেবল ধুনি জ্বালিয়ে গাঁজা টিপছে, অন্ন আর আশ্রয়ের কোনো দুশ্চিন্তা নেই। বেটাদের চালচুলো নেই, অথচ সব এক একটি মহারাজ!

কঙ্কর প্রশ্ন করলো, ওদের খেতে দেয় কে সত্যি সত্যি?

মৃগেন্দ্র বললেন, কোপ্‌নি আঁটলে আর গেরুয়া জড়ালে কি এদেশে খাওয়ার ভাবনা? ওদেশের মতন ভারতবর্ষটা দরিদ্র নয় হে।

তাহলে ত এখানে চিরকাল থেকে যেতে পারি, ডাক্তারবাবু ?—এই ব'লে মীনাক্ষী আর সকলের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

দুধারে অরণ্যজটায় জটিল পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে স্বপ্নলোকের মতো রহস্যময় পথ সর্পিল গতিতে চলেছে। বাতাসটা শীতের হাওয়ায় মধুর, সকালের সূর্যরশ্মিতে আকাশ হয়ে উঠেছে নীল ও নির্মল, পথের পাশে উপলাহত নীল নদীর কলমুখরতা, কোথাও বাবলার বন, কোথাও নির্জন তপোবনে সামান্য কুটীর। মাঝখানে একবার দেরাদুনের রেলপথের লেবেল-ক্রশিং পার হয়ে মোটর চললো উত্তরপথে।

মীনাক্ষী বললে, এমন স্বাস্থ্যকর দেশে ত আপনাদের অন্ন জোটবার কথা নয়, ডাক্তারবাবু ? আপনি কোথায় প্রাক্‌টিস্ করেন ?

মৃগেন্দ্র বললেন, কই, ডাক্তারি ত করিনে ?

তবে ?

চলুন না, দেখবেন জঙ্গলের গাছ গাছড়া এনে ঘরে ঢোকাই। ল্যাবরেটরি আছে, সেখানে পরীক্ষা হয়। ব্যাক্‌টিরিওলজি যাকে বলে। আমরা একেবারে জঙ্গলী ব'নে গেছি, বুঝলেন মীনাক্ষী দেবী ?

অনেকখানি জঙ্গল পার হয়ে যেতে হোলো। পথ বন্ধুর। এদিকে লোকালয় সামান্য। নদীর ধার থেকে স'রে গেলে মানুষের সমাগম বড় একটা চোখে পড়ে না। দূরে দূরে এক আধটি সরকারি ছোট ছোট বাংলো—কোনোটা জরিপের দপ্তর, কোনোটা বনবিভাগের কর্মকেন্দ্র, কোনোটা পুলিশ অফিসারের বাসা। এই পল্লীরই একটি নিভৃত বাংলার ধারে এসে মৃগেন্দ্র মোটর থামালেন। বললেন, এই আমার বাসা।

ভিতর থেকে জন দুই পোষাকপরা চাকর বেরিয়ে এলো। বাংলার সামনে একটি লন্, তারই ধারে ফুলের বাগান। এ ছাড়া পাম্, অশ্বত্থ, লেবু, ডালিম ইত্যাদির গাছ। ফুলের চারাগুলিতে কোথাও সাদা ও রাঙা গোলাপ, কোনোটায়

বড় বড় চন্দ্রমল্লিকা, কোনোটায় বেগুনি ছিটে দেওয়া সূর্যমুখী,—আর তাদেরই মাঝে মাঝে ভায়োলেটের বড় বড় স্তবক। চারিদিক মন্থর, নীরব।

সকলে ভিতরে গিয়ে উঠলো। পাঁচ ছয়টি ঘর, সব ঘরই সুসজ্জিত, কিন্তু মানুষের গন্ধও নেই। ভিতরে দাঁড়িয়েই দেখা যায় এ দিকে হিমালয় সানুদেশ, অন্যদিকে অন্তহীন বিশাল প্রান্তর,—মাঝে মাঝে তার বাবলা বনের জটলা, মাঝে মাঝে দুই চারিটি গৃহপালিত পশুর আনাগোনা। ভিতরে এসে মৃগেন্দ্র তাঁর কুকুরটাকে ছেড়ে দিলেন, সে একবার অতিথিদের পা শুঁকে একদিকে চ'লে গেল।

মাঝখানে একবার মৃগেন্দ্র ঘুরে এসে বললেন, সব ঘরেই ফুল্ সেট্ আছে, কোন্ ঘরটা নেবে বলো?

কাঁকর তাকালো মীনাক্ষীর দিকে, মীনাক্ষী মুখ নামালো। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, তারপরই মৃগেন্দ্র বললেন, বোধ হয় দুজনে দুটো ঘর চাও, কেমন?

মীনাক্ষী নত মস্তকে বললে, সেই ব্যবস্থাই করুন।

বেশ। এই বিশুন্, দো কম্‌রে দোনোকে লিয়ে। তাহলে আপনারা তৈরী হোন্। এ বৈজনাথ, চা লাও। এই যে, এই ঘরটা নিন্ আপনি, এ ঘরে ড্রেসিং টেবল আছে। আর এটা তোমার, বুঝলে কাঁকর? এ বিশুন্, গরম পানি দেও গোসলখানা মে। হ্যাঁ, যান্। সব বন্দোবস্ত আছে, ঘরের গায়ে লাগানো বাথরুম,—হ্যাঁ, বাথরুমের দরজাটা ওদিক থেকে বন্ধ রাখবেন, এদিকে জানোয়ারের বড উৎপাত।

জানোয়ার!—মীনাক্ষী চমকে উঠে বললে, তবে আমি এ ঘরে একা রাত্তিরে শুতে পারবো না, ডাক্তারবাবু। ওঁকে বরং দিন্ এই ঘরটা।

* *

*

অতিথিরা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ ক'রে ভ্রমণে বেরিয়েছে, সন্ধ্যার সময় তারা

ফিরবে। ভ্রমণকালে কৌতূহল জাগায় যেদিকে মানুষের বসতি, যেদিকে শহর ও নানা দ্রষ্টব্য সম্ভার। এদিকে তার কিছু নেই, কেবল প্রান্তর আর পর্বত, কেবল অরণ্য ও নির্ঝরিণী। সুতরাং দুজনে কতদূর যে যেতে পারে, তার একটা হিসাব মৃগেন্দ্রের মনে মনে জানা আছে। অতিথিরা আজ সারাদিন তাঁকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে! বয়সটা অনেক, চল্লিশের প্রায় কাছাকাছি, তবু আজকের দিনটিতে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন, এই নির্বাসিত বিলুপ্ত জীবনের গণ্ডী ছেড়ে সেই নূতন যৌবনকালের আনন্দমুখর দিনগুলিতে। সে আজ কতদিন হোলো।

চায়ের টেব্‌লে বসবেন এমন সময় অদূরে দেখা গেল একখানা টাঙ্গাগাড়ী পাথরের নুড়ির উপর চাকা মাড়িয়ে মাড়িয়ে তাঁরই বাংলার দিকে এগিয়ে আসছে। যাক্, ওরা তবে হেঁটে ফিরতে পারেনি! কিন্তু তবু যেন তাঁর মনে কেমন সন্দেহ হোলো। চায়ের বাটি মুখের কাছ থেকে নামিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন, এবং সবিস্ময়ে যে-দৃশ্য তাঁর চোখে পড়লো তা'তে ক্ষণকালের জন্য তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

গাড়ীখানা এসে ঢুকলো সটান বাগানের মধ্যে। পিছনের আসনে একটি মহিলা বসেছিলেন। মৃগেন্দ্র হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললেন, অবাক হয়ে গেলুম, একা তুমি আসতে পারলে?

মহিলাটিও হাসিমুখে গাড়ী থেকে নামলেন, বললেন, বিপ্রদাস শর্মার মেয়ে কিছুতে ভয় পায়না। টেলিগ্রাম পেয়েছিলে ঠিক সময়ে?

পেয়েই ত গিয়েছিলুম ভোর রাত্রে স্টেশনে।

ইস্ ভারি কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। কী করবো বলো, পাঁচ মিনিটের জন্যে গাড়ীখানা ফেল করলুম। স্টেশনে ব'সে রইলুম সারারাত, ভোরে গাড়ী পেলুম।

মৃগেন্দ্র সবিনয়ে বললেন, তোমার কষ্টই ত বেশী হোলো, কল্যাণী?

কল্যাণী হেসে বললেন, যাক্, শুনে আশ্বস্ত হলুম, তবু ত একটু সহানুভূতি এখনো আছে। এটুকু অন্তত থাকবে ত চিরকাল?

মেয়েটির সিঁথির মূলে চওড়া সিঁদুরের রেখা, হাতে এয়োতির অলঙ্কার, শাড়ী পরিণত বয়সের সঙ্গে মানানসই। পরণে সাদামাটা পরিচ্ছদ। বয়স বত্রিশ তেত্রিশ।

সামান্য জিনিষপত্র নামিয়ে নিয়ে গাড়ী বিদায় করা হোলো। যিনি বিপ্রদাস শর্মার মেয়ে এবং কিছুতেই ভয় পান না, তিনি বছর তিনেক আগে একবার এখানে এসেছিলেন, সুতরাং এখানকার সবই তাঁর পরিচিত। মৃগেন্দ্র সর্বক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কারণ কোনরূপ সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে গেলে অকৃত্রিম তিরস্কার লাভ অবশ্যম্ভাবী। মুখ হাত ধুয়ে এসে কল্যাণী একবার সমস্ত বাংলাটার সব জায়গায় ঘুরে এলেন, দেওয়ালে টাঙানো ছবি-গুলির দিকে চেয়ে চেয়ে কিয়ৎক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালেন, তারপর চায়ের টেবলে এসে বসলেন। বললেন, কিছুই বদলায়নি মৃগেনদা, সবই এক রকম আছে। তুমিও আছো তেমনি।

মৃগেন্দ্র শান্তকণ্ঠে আলাপ আরম্ভ করলেন, তোমার চেহারা খুব কাহিল দেখছি। গায়ের রংটাই কেবল আছে, রক্ত নেই।

রোগও ত কিছুই নেই, ডাক্তারবাবু। এমন কি, মাথাও একটু ধরে না।—ব'লে কল্যাণী হেসে উঠলেন। তাঁর হাসির ভিতরে নিজের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

বিশুনলাল গরমা চা ও খাবারের দুটো কাচের থালা এনে টেবলের ওপর রাখলো। চায়ের বাটি মুখের কাছে তুলে ধ'রে কল্যাণী বললেন, সামান্য একটু বদলেছ তুমি।

কি বলো ত?

মাথার চুল শাদা হয়ে এসেছে। চেহারাটা তাই বদলেছে একটু।

মৃগেন্দ্র হেসে বললেন, তাড়াতাড়ি জীবনটাকে খরচ ক'রে ফেলাই ত ভালো, কল্যাণী।

কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে দূরে মাঠের দিকে তাকালেন, বললেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করাও যে আরো কঠিন।

চায়ে চুমুক দিয়ে মৃগেন্দ্র ব'সে রইলেন। কথা কম নয়, কিন্তু কথা বলবার যেন পথ নেই। আর যাই হোক, দুজনের আলাপে আন্তরিকতার একান্ত অভাব—এমন একটা কঠিন আড়ষ্টতা—যাকে অতিক্রম করা বড় কষ্টসাধ্য। কেবলই যেন এই মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠতে চায়, এক পক্ষ আক্রমণশীল, অন্যপক্ষ আত্মরক্ষণশীল,—কোন্ আঘাতটা কখন্ কিভাবে আসবে তারই একটা সম্ভাব্যতা খতিয়ে যোগ্য প্রত্যুত্তর মনে মনে মিলিয়ে চলা। এটা যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু এ সঙ্কট অনিবার্য।

সুধীশ কেমন আছে আজকাল, কল্যাণী ?

কল্যাণী মুখ ফিরিয়ে তাকালেন এবং হাসলেন। বললেন, তুমি কি জানবার জন্য খুবই ব্যগ্র ?

খুবই স্বাভাবিক ব্যগ্র হওয়া—মৃগেন্দ্র আহত হয়ে বললেন, বয়সে বছর চারেকের ছোটো হলেও সে আমার অতি প্রিয় বন্ধু। তাকে আমি লেখাপড়া শিখিয়েছি, ছোটবেলা থেকে এক্‌সারসাইজ করিয়েছি, তার কারবারে মূলধন যুগিয়েছি—

থামলে যে ?

থামলুম, পাছে তুমি আঘাত পাও, কল্যাণী।

একটু উষ্মা প্রকাশ ক'রে কল্যাণী বললেন, সত্য ঘটনা শুনলে আঘাত পাবো ? তাহলে মিছেই তোমার পায়ের কাছে ব'সে সংশিক্ষার পাঠ নিয়েছিলুম। আমি জানি শেষে এই কথাটা বলতে গিয়ে তুমি থেমেছ যে, জগতে যে তোমার সবচেয়ে প্রিয়, তাকেও তুলে দিয়েছ তুমি সেই প্রিয় বন্ধুর হাতে। এই না ?

সংযত কণ্ঠে মৃগেন্দ্র মাথা নীচু ক'রে বললেন, ঠিকই বলেছ, কল্যাণী। আমিই তোমাদের বিয়ে দিয়েছিলুম। তোমরা দুজনে যেমন প্রিয়, তোমার তিনটি ছেলেমেয়েও আমার তেমনি প্রিয়। তারা ভাল আছে ত?

ঘাড় নেড়ে কল্যাণী জানালেন, তারা ভালো আছে।

মৃগেন্দ্র বললেন, সুধীশকে ভালোবাসি আমি, কারণ এতবড় উদার চরিত্র আমার কখনো চোখে পড়েনি। তোমার এখানে আসার মধ্যেও তার সেই উদার বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

কল্যাণী চায়ের পেয়ালা রেখে সহসা উঠে ভিতরে চ'লে গেলেন। মিনিট দুই মাত্র। তারপরেই পুনরায় এসে বললেন, উদার বিবেচনা? তুমি কি জানো না যে, তিনিও প্রতারিত হলেন সারা জীবনের মতন? মৃগেনদা, তোমার আদেশ পালন করার জন্য আমার মৃত্যু যত বড়ই হোক্ কিন্তু একজন নিরপরাধ দেবচরিত্রকে দিতে হয়েছে আত্মবলি। মৃগেনদা, যারা তোমার উৎপীড়ন সইল চিরদিন, একটি প্রতিবাদ জানালো না, আজ তোমার নিষ্ফল প্রশংসায় তারা কি কোনো শান্তি পাবে?

মৃগেন্দ্র বললেন, সুধীশ তোমাকে খুবই ভালোবাসে, কল্যাণী।

কল্যাণী কলকণ্ঠে হেসে উঠলেন। বললেন, অর্থাৎ, বলতে চাও আমার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। ভয় নেই, তোমার বাড়ীতে ঢুকে গায়ের জোরে তোমার কাছে কিছু আদায় করব না, মৃগেনদা। কল্যাণীর শিক্ষা তোমারই কাছে, সম্ভ্রম সে খোয়াবে না। কিন্তু তবু যে কথা রয়ে গেল, ব্রহ্মচারী মশাই। ছেলেমানুষি আলাপ করতে লজ্জা করে, ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। আজ যদি বলি তিনটি সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তোমার কল্যাণী তার দেবচরিত্র স্বামীকে কেবল বঞ্চিতই করে রেখেছে, তবে তোমার সেই প্রিয় বন্ধুর ক্ষতিটা কে পূরণ করবে, তাই বলো। সাধু ভাষায় এমন কথা যদি বলি যে, তোমার আদেশ মানতে গিয়ে আমি আমার নারীধর্মকে ক্ষুণ্ন করেছি, তার জবাব কি দেবে, বলো?

মুখ রাঙা ক'রে মৃগেন্দ্র বললেন, তুমি সন্তানের মা, কল্যাণী,—একজনের সংসারের লক্ষ্মী। কোনো দিন কোনো অন্যায় ত তুমি করোনি!

করিনি তোমার আদেশে।—কল্যাণীর কণ্ঠ যেন একটা সর্বপ্লাবিনী উত্তেজনায় ভগ্ন হয়ে এলো,—আমি সন্তানের মা, আমি লক্ষ্মী, আমি সাধ্বী স্ত্রী,—সমস্তই তোমার আদেশ। মৃগেনদা, আজ নিজের জন্য কোনো বেদনা বোধ আমার নেই, কিন্তু সকলের বড় যন্ত্রণা এই, একজনের অদ্ভুত একনিষ্ঠার কোনো প্রতিদান আমি দিতে পারলুম না। সেও হাসিমুখে জেনে রইলো এই বঞ্চনা, আমারো মাথা হেঁট হয়ে রইলো নিজের প্রতারণায়।

মৃগেন্দ্র বললেন, আমার আদেশের ওপরেও তোমার বাবার আদেশ এই ছিল, কল্যাণী।

কল্যাণী বললেন, কুলশীল সম্বন্ধে বারবার ভুল আদর্শকে তুমি প্রশ্রয় দিয়েছিলে কেন?

বিপ্রদাস বাবুর আদর্শ ভুল?—মৃগেন্দ্র চায়ের বাটি রেখে সহসা হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন,—এ কথা মনে করবার স্পর্ধা আমার নেই। একটিমাত্র মেয়ে তুমি, কুলপরিচয়কে অম্লান রাখতে গেলেন তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্য,— অত বড় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভুল ধরবার সাহস আমার নেই।

কল্যাণী বললেন, খুব সম্ভব এই কথা মনে করেই তুমি শান্তিতে আছো।

মৃগেন্দ্র পদচারণা করতে করতে বললেন, আমার শান্তি মৃত্যু পর্যন্তই অক্ষয় হয়ে থাকবে, কল্যাণী।

তাঁর এই উক্তির পর আর কোনো জবাব পাওয়া গেল না, কিন্তু তিনি মুখ ফেরালে দেখতে পেতেন, আসন্ন সন্ধ্যার ধূসরতায় কম্পিত অগ্নিশিখার মতো একখানি শীর্ণ দেহের উপরে দুটো বড় বড় চোখ আহত শ্বাপদের হিংস্রতায় জলজল ক'রে জলছে।

আরে, এসো এসো,—তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি, কতক্ষণ থেকে। কতদূর গিয়েছিলে শুনি? তোমাকে বলতেই ভুলেছি কল্যাণী, ওদের কথা।

কল্যাণী নিশ্বাস ফেলে সহজ হয়ে বললেন, ওরা কে?

ওরা একজোড়া তাজা কাঁচা মানুষ। একজোড়া পাগল। এসো এসো,—

মীনাক্ষী ও কঙ্কর হাসতে হাসতে বাগান পার হয়ে উপরে উঠে এলো। মৃগেন্দ্র বললেন, এর নাম মীনাক্ষী, ওর নাম কঙ্কর—আমার পুরনো ছাত্র। আর ইনি আমার বন্ধুস্ত্রী কল্যাণী রায়—আজ ভোরে এঁরই জন্যে স্টেশনে গিয়ে তোমাদের কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল।

সকলের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হোলো।

মীনাক্ষী তখনও হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। হাসিমুখে কল্যাণীর হাত ধ'রে বললে, ডাক্তারবাবুর কী আক্ষেপ সারাদিন, আপনি এলেন না ব'লে। কিছু আজ খেতে পারেননি।

সত্যি?—কল্যাণী সস্নেহে হেসে উঠলেন। উত্তরে মৃগেন্দ্র অনুযোগ ক'রে বললেন, এটা কিন্তু বড় অতিশয়োক্তি হোলো, মীনাক্ষী।

কল্যাণী বললেন, মিথ্যা ব'লেই ত বেশি মিষ্টি।

মীনাক্ষী বললে, আচ্ছা দাঁড়ান্, প্রমাণ দিচ্ছি। চলুন আমার সঙ্গে, যে-ঘরটি উনি রেখেছেন আপনার জন্য, সেটি সবচেয়ে ভালো ঘর, সবচেয়ে বেশি সাজানো।

মৃগেন্দ্র বললেন, তোমরাও যদি খবর দিয়ে আসতে তাহলেও—

কল্যাণী বললেন, একি, তোমার কপালের নীচে কাটলো কেমন ক'রে ভাই? কঙ্কর বুঝি আঁচড়ে দিয়েছে?

মীনাক্ষী হেসে হেসে বললে, ওর আঁচড়ে রক্ত পড়ে না, শুধু জ্বালা করে।

আমি তবে বলি দিদি, শুনুন।—ব'লে কঙ্কর এগিয়ে এলো। বললে, মানা

করলুম কতবার, কে কা'র কথা শোনে, উনি নাচতে গেলেন পেখম মেলে পাহাড়ের ওপর—বাস্, গড়িয়ে গেলেন নীচে পা পিছলে—

তবু ধরেনি আমাকে, বুঝলেন দিদি ?—মীনাক্ষী করুণকণ্ঠে বললে, ভাগ্যি একটা গাছের গোড়ায় আটকে গেলুম !

তা নইলে অতলে তলিয়ে যেতে, না ?—ব'লে কল্যাণী একবার মৃগেন্দ্রর দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, পুরুষ মানুষকে আর বিশ্বাস করো না ভাই, তলিয়ে গেলেও ওরা ধরে না, কেবল তত্ত্বকথা আওড়ায়। তারপর, এবার আপনি বলুন কঙ্করকুমার, ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল দেখে মনে হচ্ছে কাব্য রচনা করেন। সত্যি কিনা বলুন ত ?

কঙ্করের কথা বলবার আগেই মীনাক্ষী ব'লে উঠলো, সাবধান দিদি, প্রশ্রয় দেবেন না। ধরেছেন ঠিক, উনি একজন কবি, সেজন্য মাত্রাবোধও একটু কম, সারারাত কবিতা শুনিয়ে আপনার জীবন বিপন্ন করতেও পারেন !

বটে !—কঙ্কর বললে,আপনিই বলুন ত দিদি, বিলেতে গিয়ে রবিঠাকুরকেও এক বাড়ীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একজন মহিলাকে কবিতা শোনাতে হয়েছিল কিনা ?

তিনি রবিঠাকুর !—মীনাক্ষী ব'লে উঠলো।

আমিই কোন্ কম্।—এই ব'লে কঙ্কর কৃত্রিম ক্রোধের উচ্ছ্বাসে পুনরায় বললে, দাঁড়ান্ আপনারা, খাতাখানা এনে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি। এমন কবিতা তিনিও লেখেননি।—এই ব'লে সে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে গেল। সকলে হেসে লুটোপুটি।

মৃগেন্দ্র বললেন, কল্যাণী, এবার তুমি একটু বিশ্রাম নেবে। এইটুকু কথাবার্তার পরিশ্রমেই তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

মীনাক্ষী বললে, সত্যি, বড় কাহিল আপনার শরীর। ছেলেপুলেরা দুরন্ত বুঝি খুব ? থাকুন এখানে অনেকদিন, জায়গাটা ভারি স্বাস্থ্যকর।

কল্যাণী বললেন, ডাক্তারবাবু যদি অতদিন থাকতে না দেন ?

মৃগেন্দ্র বললে, অনুযোগটা শুনলে ত মীনাক্ষী ?

মীনাক্ষী একবার তাকালো তাঁর দিকে, আর একবার কল্যাণীর চোখের দিকে। তারপর হেসে উঠে যাবার সময় ব'লে গেল, এখানে আমার অনধিকার চর্চা !

দুইজনেই তাকে ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু মীনাক্ষী পালিয়ে গেল।

*

* *

কলরব-মুখরতাটা নিতান্তই সাময়িক। মীনাক্ষী আবিষ্কার ক'রে বসলো এ-বাড়ীর চারিদিকে চাপা বিষণ্ণতার একটা গুরুভার আছে, তার কারণটা খুঁজে পাওয়া যায় না, কৈফিয়ৎটা প্রকাশ করা চলে না। তবু আছে। সেটা অনেক সময় দৃশ্যমান নয় বটে, অথচ অনুভব করা যায় পদে পদে। কিন্তু তারা ত নিতান্তই অস্থায়ী অতিথি, এখানে তাদের মতো মানুষের দীর্ঘ একটি সপ্তাহ কেটে গেল এইটিই বিস্ময়কর। যে কোনদিন প্রাণের বাতাস একবার বইলেই তারা পাল তুলে দিয়ে ভেসে চ'লে যাবে দূরান্তরে।

বিষণ্ণতার সঙ্গে আছে কিছু যেন নিশ্বাস রোধ করা অশান্তির কালো ছায়া, সেই অশান্তি গুমরে ওঠে না বটে তবু বিশ্লেষণ করলে তাকে যেন পাওয়া যায়। এমন একটা সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার মধ্যে এই ক্ষুদ্র সংসারটি চলে যে, মনে হয় প্রত্যেকে যেন নিয়মানুবর্তিতার ক্রীতদাস। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে আহার, বিহার ও নিদ্রা বিধিবদ্ধ ; এই নিঃশব্দ নিয়মতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করলে হয়ত একটা ঝড় উঠতে পারে—তারই একটা আতঙ্কে মীনাক্ষীর যেন দম আটকে আসে। অথচ বাস্তবে এসব কিছু নয়—মনে হয় এ যেন তারই একটা অলীক কল্পনা, একটা মনোবিকলন মাত্র।

মৃগেন্দ্র সারাদিন থাকেন ল্যাবরেটরিতে, রাত্রেও কাজ থাকে। কল্যাণী

থাকেন নিজের ঘরে বই আর মাসিকপত্র নিয়ে,—চায়ের টেবলেও প্রায় তিনি অনুপস্থিত, দুইবার ভোজনের আসরে একবারমাত্র তাঁকে আজকাল পাওয়া গেলেই যথেষ্ট। আর কঙ্কর! সে এতদিন পরে যেন নিজের পৃথিবী আবিষ্কার করেছে। 'সে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।'

কিন্তু ইঙ্গিত পেলেই তার সঙ্গে পালানো যায় না। এই মাঠের মধ্যে আর পার্বত্য অরণ্যের প্রান্তে একটি ছোটখাটো সমাজ গ'ড়ে উঠেছে, সেটাকে মেনে চলতেই হয়, কারণ, সে স্ত্রীলোক। তাছাড়া নূতন মানুষের সম্ভ্রমরক্ষার প্রতি তার একটা দায়িত্ববোধও আছে। তাকে ঘিরে কোনো একটা গুঞ্জন হয়নি বটে তবে তাদের গতিবিধির পরে একটা সজাগ দৃষ্টি থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর কঙ্করকে নিয়ে সে যাবেই বা কতদূরে! ফিরে আসার প্রশ্নটা থাকলে যাবার দিকে আর তার পা সরে না। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসার চিহ্নটা বড় হ'য়ে উঠতেই থাকে, এখানকার অবকাশে কেন এই ধূসরতা? প্রাণের উত্তাপ নেই, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নেই,—মুখ তুলে তাকাবার আশ্রয় কোথাও নেই। সমস্তটার মধ্যেই যেন একটা যান্ত্রিক সচলতা। চাকরগুলো পর্যন্ত কানাকানি করে কিন্তু চেঁচিয়ে কথা বলে না। মৃগেন্দ্রর মুখে একটি অতি স্নিগ্ধ অতিথিবৎসল হাসি, কল্যাণীর মুখে অতি নিখুঁত বন্ধুতার স্নেহচ্ছায়া,—আলাপে, আচরণে, ব্যবহারে, কোথাও অভিযোগ আনবার একবিন্দু অবকাশ নেই,—অথচ, মীনাক্ষী ভাবতে লাগলো, কোথাও সচ্ছল বাতাস বয়না। যেন মনে হয় এখানকার বিস্তীর্ণ মাঠ আর দিগন্তহীন আকাশে অলক্ষ্যে একটা ভয়ানক গুমোটের সৃষ্টি হচ্ছে, এর পিছনে রয়েছে একটা দুরন্ত ঝড়। এই নিঃশব্দ নিশ্বাসরোধ প্রবল ঝাপটায় বিদীর্ণ হয়ে যাবে!

তারা চ'লে যাবে, তবে যাবার উপলক্ষ্যটা একটু জোরালো হওয়া দরকার। এ বাড়িতে থাকতে ভয় করে, বেরোতে পা চলে না। মৃগেন্দ্র আদেশ করেছেন, অন্তত দুমাসের আগে তাদের চ'লে যাবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না; এ সম্বন্ধে

তাঁর সঙ্গে বিতর্ক বাধানো সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ তাঁর হুকুম একটুও নড়বে না। দুমাস! সে যেন আর এ জন্মে নয়। এই ভয়াবহ শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে ষাটটি যন্ত্রণাদায়ক দিন! মীনাক্ষী ব্যাকুল হয়ে তাকালো পথের দিকে,—পথ তেমনি অবারিত, তেমনিই চলেছে জনপদ পেরিয়ে নদীর কিনারা দিয়ে প্রান্তর অতিক্রম ক'রে পর্বতের দুর্গমে,—অন্ধকার থেকে আলোর দিকে সেই পথ, সেই পথ মৃত্যু থেকে জীবনের কোলাহলের দিকে, এবং সেই প্রাচীন পথ তেমনই পৃথিবী থেকে বিশ্বের দিকে প্রসারিত। কিন্তু চলবার শক্তি তার নেই, এই অখণ্ড মুক্তির মধ্যেও সে বন্দিনী। সমস্তটাই যেন তাকে প্রবল আকর্ষণে পিছনে টানছে,—এই অবারিত মাঠের মধ্যে এই বাংলাটিতে এমন ভীষণ শাসন নিহিত ছিল একথা তার আগে মনে হয়নি। এ তার সেই চিরবাঞ্ছিত আনন্দের স্বর্গ নয়, এখানে বিশ্রাম নেবার মতো স্থান তার নেই,—এই নীরব, নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত ঘরগুলিতে যেন একটা যন্ত্রণাদায়ক কৃত্রিমতা,—একটা ওজন করা, পালিশ করা, কেতা-দুরস্ত ও ভব্য কাঠামোর মধ্যে কয়েকটি মানুষের নিখুঁৎ জীবনযাত্রা। যেদিকে অসীম প্রাণলোক, যেদিকে মুক্তির বাতাস সহজ ও স্বচ্ছন্দ, যেখানে পদে পদে জীবনকে তীব্রভাবে, রূঢ়ভাবে নিবিড় ক'রে অনুভব করা যায়,—সেইখানে মীনাক্ষীর মন ছুটতে লাগলো দুই পক্ষ বিস্তার ক'রে। কিন্তু উপায় নেই, পথ নেই, যেন একটা প্রবল প্রতিকূল বাতাসের আলোড়নে নিজের ডানায় জড়িয়ে উড়ন্ত পাখী একটা কাঁটাবনের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়েছে!

সেদিন সকালবেলা মালীর অস্ফুট কলরব শুনে মীনাক্ষী দ্রুতপদে বাহিরে এসে দাঁড়ালো, এবং যে দৃশ্য সে চোখের সম্মুখে দেখলো তা'তে তার মুখে আর বাক্‌শক্তি রইলো না। অদূরে বারান্দার উপর মৃগেন্দ্র চায়ের পেয়ালা নিয়ে ব'সে রয়েছেন। তাঁর শার্টের হাতা গুটানো, মাথার চুল এলোমেলো, মুখখানা পরিশ্রম ও ক্লান্তিতে রক্তাভ। হাসিমুখে তিনি মীনাক্ষীকে ডেকে কাছে বসালেন।

বাগানের সমস্ত ফুলের চারাগুলি বিধ্বস্ত, শাদা গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা আর সূর্য্যমুখীগুলি ধূলা ও কাঁকরের উপর ছিন্নভিন্ন হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে; ডালগুলি মচকানো, রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলো ভাঙা। সমস্ত বাগানটা শ্রীহীন, বিপর্যস্ত। নিষ্ঠুর নখের আঁচড়ে সমস্তটা যেন নির্জীব।

ডাক্তারবাবু? মীনাক্ষী তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

মৃগেন্দ্র ক্লান্ত হাসি হেসে বললেন, কিছু জানতে চেয়োনা ভাই। ওরে বিশুন্, দিদিকে একটু চা এনে দে।

মীনাক্ষীর উদ্‌গত প্রশ্ন চিবুকের কাছে এসে কাঁপতে কাঁপতে থেমে গেল। সে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলো।

বিশুনলাল দুই পেয়ালা চা এনে টেবলের উপর রেখে গেল; সেই অতি উত্তপ্ত চা মৃগেন্দ্র দ্রুত পান করতে লাগলেন। আবার একবার অস্থির হয়ে মীনাক্ষী ব'লে উঠলো, ডাক্তারবাবু—?

আবার প্রশ্ন?—এই ব'লে মৃগেন্দ্র হেসে উঠলেন এবং চায়ের পেয়ালা শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

কোন জবাব নেই, ডাক্তারবাবু?

না, দিদি।—এই ব'লে মৃগেন্দ্র এই স্বল্পপরিচিতা সোদরোপমার মাথার উপরে পরমস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে পুনরায় বললেন, এর জবাব জীবনেও দিতে পারব না বোন, তোমার দাদাকে তুমি ক্ষমা ক'রো। আচ্ছা, চা খাও তুমি ব'সে ব'সে,—আর একটু কাজ আমার বাকী আছে।

মস মস ক'রে তিনি তাঁর পরীক্ষাগারের দিকে চ'লে গেলেন। মীনাক্ষীর হাতের কাছে চা জুড়িয়ে শীতল হ'য়ে আসতে লাগলো।

বিকাল বেলার দিকে আজ চারদিন পরে কঙ্কর ফিরে এলো। সে গিয়েছিল মুসৌরীতে। মীনাক্ষী তাকে দূর থেকে দেখে ঘরের মধ্যে চ'লে গেল—কথাও বললে না, অভ্যর্থনাও জানালো না। এটা নূতন, একটুখানি বিচিত্র বটে।

বাগানের হতশ্রী চেহারাটা কঙ্করের প্রথমেই চোখে পড়লো। সমস্ত বাংলাটা যেন থম থম করছে। এমন নীরবতায় কুচিন্তাই আনে। সন্দিগ্ধ মনে কঙ্কর বারন্দা পার হ'য়ে মৃগেন্দ্রের ঘরে ও লেবরেটরিতে উঁকি দিয়ে দেখলো, তিনি নেই। বৈজনাথ জানালো সাহেব মোটর নিয়ে শহরে গিয়েছেন।

বড়া মাইজিও কি তাঁর সঙ্গে গিয়া হ্যায় ?

নেই সাব্,—বৈজনাথ জানালো, তিনি একা মাঠের দিকে ঘুরতে গিয়েছেন। তাঁর 'শিরমে' আজকাল বড 'চক্কর' লাগছে, মোটরে তিনি উঠবের না। 'ছোটা মাইজি হ্যায় ঘরমে।'

কঙ্কর ঘরে এসে ঢুকলো এবং কিছু জানবার ও বোঝবার আগেই মীনাক্ষী এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সহসা কাঁদতে লাগলো। স্ত্রীলোকের কান্নায় মোহগ্রস্ত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। খুশী মনে হিমালয়ের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে কঙ্কর বললে, কেমন, বলেছিলুম না তখন যে আমার সঙ্গে চলো ? যেতে পাওনি ব'লে এখন কাঁদলে হবে কি ? আ, কী চমৎকার মুসৌরী,—কী সুন্দর মোটর পথ! দূরে তুষারমণ্ডিত কৈলাস—সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তে সোনা গ'লে পড়ে তার কপাল বেয়ে—

হঠাৎ সন্দেহক্রমে সে থিয়েটারি ভঙ্গীটা থামিয়ে বললে, ছাড়ো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদো কেন ? মেয়ে মানুষের চোখের জলে ভীষণ মৎলব ভেসে বেড়ায়, ওসব আমি বুঝি। আরে, ও কী হচ্ছে ? কিছু বলেছেন নাকি ওঁরা ?

মীনাক্ষী বললে, না। আমরা এখান থেকে চ'লে যাই চলো।

কেন, চেহারাটা ত বেশ গুছিয়ে নিলে দশ বারো দিনে! যাবার কথা কেন ? সেই ভুট্টার খই খাবার জন্যে বুঝি প্রাণ কাঁদছে ? আচ্ছা বেশ, যেয়ো। আগে চান্ করিয়ে দাও দেখি আমাকে বাথ্রুমে নিয়ে গিয়ে।

পারব না আমি,—ব'লে মীনাক্ষী তাকে ছেড়ে স'রে গেল।

পারবে না?—কঙ্কর বললে, জানো আমি বলপ্রয়োগ করতে পারি? কেন পারবে না, বলবে অনুগ্রহপূর্বক?

মীনাক্ষী বললে, বে-আইনী!

বে-আইনী?—কঙ্কর তার ডান হাতে ঘুষি পাকিয়ে এক দাম্ভিক অভিনেতার মতো থিয়েটারি কায়দায় বললে, বে-আইনী? জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সতীত্ব রক্ষায় নিযুক্ত, বছরে দশমাস আঁতুড় ঘরে যারা দিন কাটায়, একটুখানি ভালোবাসা পাবার জন্য যারা মানসম্ভ্রম খোয়ায়, চোখের দুফোঁটা জল ফেলে যারা পুরুষের হাত থেকে চিরদিন দানাপানি আর ডিমপাড়ার বাসা ছিনিয়ে নেয়,—পৃথিবীর সেই পরাশ্রিত আর পুরুষপদলেহী নারী জাতির কাছে আমাকে আইন শিক্ষা করতে হবে? 'সাবধান নারি, পায়ে যদি রাখি তবেই তুমি দাসী, নৈলে পথের কীটানুকীট—ইঁদুর মতন পদদলিত হবার জন্যই তোমাদের জন্ম,—পুরুষের পৃথিবীতে তোমরা পারিয়া,—মনে রেখো।

এমন সময় বিশুনলাল জলখাবারের ডিস ও চা এনে হাজির করলো। মীনাক্ষী তার হাত থেকে সেগুলি নিয়ে কঙ্করের মুখের কাছে ধরলো। ক্ষুধার্ত কঙ্করের পক্ষে লোভ সামলানো কঠিন। মধু ও মাখন মাখানো একখানা টোস্ট তুলে নিয়ে এক কামড় দিয়ে বললে, ধ'রে থাকো, আমি খাই। আঃ—চারটে দিন তুমি ছিলে না, ভারি অসুবিধে হয়েছিল!

মীনাক্ষী মুখ টিপে বললে, বে-আইনী!

কঙ্কর হো হো করে হেসে উঠলো। খাওয়া শেষ হ'লে মীনাক্ষী এনে দিল খাবার জল, তারপর চায়ের পেয়ালা দিলে তার হাতে। চা খেয়ে কঙ্কর গা এলালো বিছানায়।

ব্যাগটা খুলে মীনাক্ষী আয়না, সেফটি ক্ষুর, সাবান ও ব্রাশ বার করলো। তারপর জলের পাত্র হাজির ক'রে বললে, ওঠো, দাড়ি কামাও। মুখখানা জঙ্গল হয়ে উঠেছে!

দাড়ি যদি না কামাই, তোমার ক্ষতি কি ?

তবে দাড়িটা থাক্, গোঁফটা কামাও।

কামালে তোমার কোনো স্থবিধে আছে ?

একটু আছে বৈকি—মীনাক্ষী বললে, নাও ওঠো।

কঙ্কর বললে, জানো, এটা বে-আইনী।

মীনাক্ষী হেসে ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, আইন শিখতে হবে তোমার কাছে ? পুরুষ মানুষ হ'লে না হয় চুপ ক'রে থাকতুম, ছেলেমানুষের কাছে আইন শেখবার আগে ওই ক্ষুর গলায় দেবো।

নারীর স্পর্ধা ক্ষমা করলেম !—ব'লে কঙ্কর উঠে গিয়ে দাড়ি কামাতে বসলো।

মীনাক্ষী এক সময় আদর ক'রে তার মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে বললে, রাগ করো না সোনা, যদি একটা কথা বলি। ওরা কেউ এসে পড়বে, লক্ষীটি, আজ তুমি নিজে নিজেই চান করো। এখান থেকে গিয়ে তারপরে—কেমন ?

বিদ্রোহ ক্ষমা করলেম, যাও নারী !

মীনাক্ষী হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অশ্রুজলের ইতিহাসটা তাকে বলা হোলো না বটে, কিন্তু পশ্চিম মাঠের উপর রঙীন সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে মীনাক্ষী যেন অনুভব করলো, অমনি ঐশ্বর্যে অমনি মধুর বর্ণের সামঞ্জস্যে তার হৃদয়ের সকল সীমা কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার কোনো নালিশ নেই, কোনো ব্যথা নেই—এই বাড়ীর সমস্ত বিমর্ষতা ও বিষাদের চাপা বেদনা যেন কোন্ মায়ামন্ত্রে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

*

*     *

গোপন করার কিছু নেই, প্রকাশ ক'রে বলাটাও নিষ্প্রয়োজন। নির্বোধ কে আছে যে, দুজনের সম্পর্কটা বুঝতে পারেনি ? তবু,—মীনাক্ষী রাত্রির অন্ধকারে একা বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো, তবু নিয়তিকে সহস্র ধন্যবাদ।

শুচিতা ও সংবৃত্তিকে তারা রক্ষা ক'রে চলেছে। কত ঝড়-ঝাপটা, কত দুর্বলতা ও পরীক্ষার মুহূর্তগুলিকে তারা এতদিন ধ'রে অতিক্রম ক'রে এলো। অনেক সময় অস্থিরতা হয়েছে, অনেক সময়ে সংযমের অলীকতা তাদের চোখে ধরা পড়েছে, কিন্তু তবু আসক্তির আগুনে তাদের মুখ পোড়েনি। সহজ অবলীলায় তারা বিচক্ষণ পর্যালোচনায় এর প্রাধান্যকে স্বীকার করেনি। এর কারণ ছিল। এখানে দুজনের ভালোবাসার চেহারাটা বড় নয়, জনপ্রিয় উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মতো তাদের বিরহ মিলনের প্রশ্নটাই মুখ্য নয়, অথবা সুলভ সমাজবিদ্রোহ, নরনারীর স্বাধীন প্রেম ইত্যাদির প্রচারকায ক'রে যাওয়াই তাদের কাজ নয়। তাদের মধ্যে বিবাদ ঘটেনি, তাদের প্রণয় ও মিলনের পথে কোনো প্রতিবন্ধক ছিল না, আসক্তিকে প্রশ্রয় দেবার জন্য তারা বিদ্রোহ ঘটায়নি, বিবাহের শাঁখা ও সিন্দূর চড়িয়ে এবং টোপর মাথায় দিয়ে উলুধ্বনি সহকারে ঘরে ওঠাই তাদের জীবনের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা নয়,—তাদের অনেক কাজ ছিল। ভালোবাসা তাদের প্রথমেই পাওয়া, মিলন তাদের প্রথমেই সংঘটিত,—কিন্তু তারপরে সত্যকার জীবন আরম্ভ হোলো। মীনাক্ষী ভাবতে লাগলো, নূতন জীবন হবে কেমনতরো? যেমনই হোক, তার মূলভিত্তি হবে বিপ্লবাত্মক। ঘরের মধ্যে তারা আশ্রয় নেবে না, জীবনকে করবে ঘরছাড়া। অসন্তোষকে তারা জাগিয়ে তুলবে দেশ থেকে দেশান্তরে। যত নোংরা, ছেঁড়া, তলাফুটো, পাঁজরভাঙা, ভাগ্যহত, লক্ষ্মীছাড়া—এদের নিয়ে হবে তাদের শোভাযাত্রা। তারা থাকবে বিপদের মাঝখানে, থাকবে দুর্গমে, যাবে দুর্যোগে। একটুখানি আনন্দে, দু'ফোঁটা চোখের জলে, সামান্য একটু বেদনায়, ক্ষণকালের সম্ভোগে, অল্পকালের মোহমত্ততায়,—তারা খুঁজে পাবে কিছুকালের সান্ত্বনা। দায়িত্ব-বোধের ছায়া তারা মাড়াবে না, গায়েপড়া সেবাধর্মকে ক'রে যাবে বিদ্রূপ,—তারা কোনো বাধ্যবাধকতার ধার ধারবে না। পণ্ডিতেরা থাকুক বিদ্যায় ডুবে,

গৃহস্থরা থাকুক সন্তান আর সংসারের খেলায় মেতে, স্বেচ্ছাসেবক থাকুক মানব সেবার অহঙ্কার নিয়ে, ধনী-দরিদ্র থাকুক বিবাদ-বিতর্ক নিয়ে, এবং সমাজপতি সমালোচকরা থাকুক দুর্নীতি আর শাসন-শৃঙ্খলার চুলচেরা বিচার নিয়ে,—তাদের পথ আলাদা, তারা যেন এদের দিকে চেয়ে দিনে রাতে হেসে চ'লে যেতে পারে, যেন অনর্গল হেসে এদের সকলের গাম্ভীর্যকে হাল্‌কা ক'রে দিয়ে যেতে পারে, এই প্রার্থনা রইল ভাগ্যবিধাতার দরবারে। যতদূর দৃষ্টি যায়, অতীতকালের দিকে চেয়ে মীনাক্ষী ভাবলো, ক্ষয়ক্ষতি তাদের কিছু হয়নি, বিবাদ হয়নি কারো সঙ্গে, বেদনা জাগায়নি কারো মনে। কা'কে বলে পাপ তার ধারণা নেই; কা'কে বলে পুণ্য, সে জানে না। এই অন্ধকার বিছানার চারিপাশে পৃথিবী এসে যেন দাঁড়ালো,—তার কোনো অভিযোগ নেই, কোনো ভ্রূকুঞ্চন নেই—নির্বিকার সহজে দুজনে যেন দুজনকে স্বীকার ক'রে নিল।

বাইরের দিক থেকে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে মীনাক্ষীর মন থমকে দাঁড়ালো। চারিদিক নীরব; রাত্রি থম থম করছে। শুক্লপক্ষের চন্দ্র অস্ত গেছে, তারই একটা আভাস আছে পশ্চিমের জানলায়। আওয়াজটা কেমন, কোথাকার কিসের আওয়াজ, ঠিক বোঝা গেল না। মাঝে মাঝে বন্য জানোয়ারের উৎপাত হয় এদিকে, কথাটা তার মনে ছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ, সেদিক থেকে কোনো ভয় নেই। পাশের ঘরে সোনার পালঙ্কে যে-রাজপুত্রটি নিদ্রিত, তার চুলের মুঠি ধ'রে না টানলে তার ঘুম ভাঙবে না। চাকর-বাকররা থাকে বাগানের ওপাশে, তাদের পশ্চিমী ঘুম, পোড়ানো লোহার ছ্যাঁকা না দিলে তাদের চৈতন্য ফিরবে না। আর কল্যাণী, তিনি ওদিকের ঘরে সন্ধ্যার পর থেকেই নির্বাসন ব্রত নিয়েছেন।

আবার সহসা একটা আওয়াজ। যেন একটা অতি ভঙ্গুর পদার্থ চুরমার হ'য়ে ভেঙে পড়লো। কেমন যেন একটা নিক্কণ, যার আকস্মিক নিক্ষেপণে কান্নার মতো একটি সঙ্গীত কানে শোনা গেল। মীনাক্ষী উঠে বসলো।

অকস্মাৎ আবার একটা আর্তনাদ কানে এলো। অত্যন্ত মৃদু, একটিমাত্র মুহূর্তের আর্তনাদ। পাখীর বক্ষ শরবিদ্ধ হ'লে সে যেমন একটি পলকের জন্য কাতরোক্তি ক'রে একেবারে থেমে যায়—তেমনি ক্ষণিক, তেমনি করুণ। মীনাক্ষী আলোটা জ্বালবে মনে করলো, কিন্তু আপন অস্তিত্বকে গোপন করবার জন্য আলো না জ্বেলেই দ্রুতপদে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলো। কুকুরটা বার দুই ডেকে চুপ ক'রে গেল।

কঙ্করের দরজা খোলা। মীনাক্ষী অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে পা টিপে টিপে সেই ঘরে প্রবেশ করলো। অতি মৃদু পদসঞ্চারে বিছানার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে ফিস ফিস ক'রে ডাকলো, কাঁকর?—একি, জেগেছিলে তুমি?

কাঁকর বললে, হ্যাঁ, তুমি কেন এলে?

একজনের রুদ্ধ দ্রুত নিশ্বাস আর একজনের মুখে লাগছে। মীনাক্ষী বললে, ঘুম ভেঙে গেল। শব্দ শুনেছ?

চাপাকণ্ঠে কঙ্কর বললে, শুনেছি।

কিসের আওয়াজ বলো ত?

চুপ! কিছু জানতে চেয়ো না।

কিন্তু আমার যে ভয় করে, কাঁকর।

কানে কানে কাঁকর বললে, ভয় কিছু নেই, চ'লে যাও। যাও ঘুমোওগে।

মীনাক্ষী বললে, আমি তোমাকে দরজা খুলে রাখতে দেবো না। উঠে দরজা বন্ধ করো।

কাকঁর উঠে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। মীনাক্ষী আবার অন্ধকারে চ'লে গেল।

আবার চারিদিক নিথর, নিস্পন্দ। ঘড়ির *টিক টিক* শব্দ, বুকের ভিতরকার ধুক ধুক আওয়াজ, রাত্রির ঝিল্লির চীৎকার, দূরে কোন্ বন-পথের অজানা প্রাণীর বিনিদ্র অস্পষ্ট কণ্ঠ,—কান পেতে মীনাক্ষী শুনতে লাগলো। অদ্ভুত এই রাত্রিটা, তার চেয়েও এই বাংলাটা,—এ যেন পৃথিবীর বাইরে। এর ভিতরকার

সমস্ত আসবাব সজ্জাগুলি এই অন্ধকারে কেমন যেন একটা অলৌকিক অনৈসর্গিক আকার নিয়েছে। এরা কথা কয়, চ'লে ফিরে বেড়ায়, শব্দ করে,—দিনের বেলাকার সূর্যের আলোয় আত্মপ্রকাশের ভয়ে এরা জড়ত্বের ভান ক'রে নিশ্চল হয়ে থাকে, রাত্রে এদের ঘুম ভাঙে, এরা মাথা তুলিয়ে ভয় দেখায়; আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

ঝন্ ঝনক ঝনাৎ—

মীনাক্ষী সহসা কাঠ হয়ে দাঁড়ালো। মনে তার সন্দেহ হোলো, এ আওয়াজ মানুষের সৃষ্টি। সে একটি মুহূর্তের জন্য সুইচটা টিপে আলো জ্বালিয়ে দেখে নিল, রাত প্রায় আড়াইটে। ঝন ঝন আওয়াজের শেষ রেশটা তখনও থামেনি—যেন চূর্ণ পিতল ও কাঁসা পাথরের মেঝের উপরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মীনাক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলো পা টিপে টিপে। হে রাত্রির দেবতা, তার এই কৌতূহলকে ক্ষমা করো। হে কৌতূহল, তোমারই নাম নারী। মীনাক্ষী তেমনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ওদিকের বারান্দায় দেখলো ডাক্তারবাবুর লেবরেটরিতে আলো। জানালার পাশে গিয়ে মীনাক্ষী আলোটা বাঁচিয়ে চুপি চুপি দাঁড়ালো।

ভিতরে দুইজনের চাপা কণ্ঠস্বর। মীনাক্ষী কান পেতে শোনে:

—এমনি ক'রে ভাঙলে সব?

বেশ করেছি। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবো না।

কী করেছি তোমার, কল্যাণী? কেন রক্তাক্ত করলে আমাকে?

মীনাক্ষী রুদ্ধশ্বাসে একটি পলকের জন্য দেখে নিল, মৃগেন্দ্রের কপালে রক্তের দাগ। আত্মোৎসর্গকারী নিরুপায় পুরুষের চোখে যেন অশ্রুবিন্দুও দেখা গেল!

কল্যাণী অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে বললেন, আমারও বুকের রক্ত নিয়ে তুমি খেলা ক'রে চলেছ কুড়ি বছর ধ'রে।—এই ব'লে পাগলিনী আলুথালু হয়ে আবার সেই পরীক্ষাগারের রাশি রাশি কাঁচের সরঞ্জাম দুই হাতে তচনচ ক'রে দিল। মৃগেন্দ্র

বাধা দিলেন না। মীনাক্ষীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি সেদিন বলেছিলেন, অন্তত দশ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি তাঁর পরীক্ষাগারে আছে।

কেন তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমার সন্তানদের নামে দান করেছ? কেন? কেন?

আমার আর কেউ নেই, তার জন্যে।

আজ আমি—আমি—কল্যাণী আহত হরিণীর মতো আর্তকণ্ঠে বললেন, তোমার সব আদেশ, সব অনুরোধ মেনেছি। আর কি উপায় ছিল আমার? কেন নিলে না, কেন মুখ ফিরিয়ে চ'লে এলে সেদিন? কেন ধ্বংস করলে তিনটে মূল্যবান জীবন? যেদিন আমরা কেউ থাকবো না, সেদিনও তুমি সুধীশের সন্তানদের জন্য চরম অসম্মানের ব্যবস্থা রেখে গেলে।

ক্ষমা চাই তোমার কাছে, কল্যাণী।—ভগ্নকণ্ঠে এই কথা উচ্চারণ ক'রে ডাক্তারবাবু নিজের মুখ ঢাকলেন।

ক্ষমা করব? কেন? আমার সমস্ত জীবনধর্মকে বিষাক্ত করেছ তিলে তিলে চিরদিন। ক্ষমা নেই, প্রতিবিধান নেই।—ব'লে কল্যাণী সেই রাশি রাশি ভাঙা কাঁচের জঞ্জালের উপর সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে মৃগেন্দ্রের দুই পা জড়িয়ে ধরলেন। পায়ের উপরে তাঁর সেই সিন্দুর-শোভিত মস্তক বারংবার আঘাত ক'রে আর্তকণ্ঠে বললেন, ক্ষমা করব না, দয়া করব না,—না, না—আমি চাই আমার সতীধর্মকে রক্ষা করতে,—ক্ষমা নেই, দয়া নেই—

তোমাদের পৃথিবীতে দেবে না আমাকে বাঁচতে? তুমি চাও আমার মৃত্যু, কল্যাণী?

চাই, চাই, চাই—ব'লে কল্যাণী তাঁর ভিতরকার অসহ্য যন্ত্রণা ও অস্থির বেদনার উচ্ছ্বাসে ডাক্তারবাবুর পায়ের উপরে মাথা কুটতে লাগলেন।

আঁচলের ডেলা পাকিয়ে মীনাক্ষী নিজের মুখ চেপে ধরলো, আর একটু অসতর্ক হ'লেই একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এসেছিল আর কি। সে নিঃশব্দে নিজের

ঘরে এসে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। কিছুকাল থেকে কেন জানিনে, মীনাক্ষীর সেই আগেকার স্বভাব-কাঠিন্য আর খুঁজে পাওয়া যায় না,—সূর্যের উত্তাপ লেগে তুষারের স্তূপ যেন নরম হ'তে সুরু করেছে। বিছানায় তার অবসন্ন দেহ এলিয়ে সে আবিষ্কার করলো, তার চোখের জলে রাত্রির অন্ধকার যেন অধিকতরো অন্ধ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার কেন এই আবরণ অশ্রু? পরীক্ষাগারের দশ হাজার টাকার কাঁচ ধ্বংস হোলো, এতে তার ক্ষতি কি? এক নির্মম পুরুষের উৎপীড়নে একটি চরিত্রবতী সাধ্বী নারীর জীবন মিথ্যা হ'য়ে গেল, এ আঘাত তার বুকে বাজবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। একটি নিরপরাধ সর্বত্যাগী আদর্শবাদী পুরুষ এক নারীর প্রার্থনায় মৃত্যুবরণ করতে স্বীকৃত হোলো, এতে তার চোখে অশ্রু আসাটা অতিশয় ভাবালুতার পরিচয়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের ভিতরে মাত্র তিনটি প্রাণীর শোচনীয় ভীষণ পরিণামের কথা স্মরণ ক'রে তার মনই বা টল্‌বে কেন? কিন্তু তবু হোলো ছেলেমানুষি। যেন তারই পাঁজরের অস্থি বিদ্ধ ক'রে প্রবেশ করেছে একটা ভাঙা কাঁচের টুক্‌রো, আর তারই একটা অসহনীয় অস্বস্তিতে সেই নিশীথ অন্ধকারে মীনাক্ষীর দুই মুদিত চোখের কোণ বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

ঘুম তার চোখে আসেনি, দরজা ঠেলার শব্দে সে চোখ চেয়ে দেখলো, অনেক আগে সকাল হয়েছে। রাত্রিটাই যেন সত্য ছিল, সকালটা লাগলো স্বপ্নের মতো।

মীনাক্ষী, দরজা খোলো।

মীনাক্ষী উঠে দরজা খুলে অনেকটা ক্লান্তি নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। কঙ্কর গম্ভীর হ'য়ে বললে, দিদির আচরণে আমি মর্মাহত হয়েছি। ভোর রাত্রের দিকে তিনি একা মৃগেনদার মোটর নিয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়েছেন কেউ জানে না। চাকর-বাকররা তখনো ঘুমিয়েছিল।

মীনাক্ষী কম্পিতকণ্ঠে বললে, ডাক্তারবাবু কোথায় ছিলেন ?

তিনি ছিলেন লেবরেটরিতে। তাঁর ঘরে শিকল টেনে দিয়ে বন্দী ক'রে রেখে দিদি চ'লে গেছেন।

তাঁর উদ্দেশ্য কি ?

ব'লে গেছেন: তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন।—কঙ্কর বললে, মৃগেনদা লজ্জায় কারুকে প্রথমটা ডাকেননি, কিন্তু নিরুপায় হয়ে এক সময়ে আমাকে ডাকেন, আমি গিয়ে দরজা খুলে দিই।

মীনাক্ষী ক্লিষ্টকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, দিদি মোটর চালাতে জানেন ?

হ্যাঁ, ছোটকালে মৃগেনদাই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। যাই হোক্ তিনি গেছেন দিদির সন্ধানে, চাকর দুজনেও গেছে তাঁর সঙ্গে।—কঙ্কর পায়চারি করতে করতে বললে, মৃগেনদার ভয় একটু আছে বৈ কি। দিদির মোটর চালাবার অভ্যাস নেই, হাতটাও একটু কাঁচা। তা' প্রায় ঘণ্টা দুই হোতে চললো। তুমি এবার চা করো, মীনাক্ষী।

কিন্তু মীনাক্ষী ভীত কম্পিত দেহে দেয়ালের ধারে মেঝের উপর ব'সে পড়লো। চারিদিক থেকে একটা অমঙ্গলের কালো ছায়া ডানা মেলে এই বাংলাটার উপরে নেমে এসেছে। কঙ্কর তার দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বাগান দিয়ে নেমে পথের দিকে চ'লে গেল।

কিন্তু তবু শেষের ঘটনাটা মীনাক্ষীর কাছে একেবারে আকস্মিক নয়। এর জন্য সে প্রস্তুত হয়েই ছিল। দীর্ঘকাল থেকে যে রুগ্ন, জীবন যেখানে জীবনেরই একটা গুরুভার—তার মৃত্যু যেমন করুণ হ'লেও একটা নিগূঢ় সান্ত্বনা আনে, এও যেন তাই। মীনাক্ষী প্রস্তুত হয়েই ছিল।

ঘণ্টা তিনেক বাদে কঙ্কর ঘুরে এসে যখন দাঁড়ালো তখন দেখা গেল সে একা নয়, জনকয়েক অপরিচিত মানুষ—তাদের মধ্যে স্থানীয় পুলিশের পোষাকপরা জনচারেক লোকও রয়েছে। সংবাদটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক এবং সাধারণ।

কল্যাণী দেবীকে খুঁজে পাওয়া গেছে। খুঁজে পাওয়া গেলেও তিনি সজ্ঞানে ছিলেন না। পুলিশের অনুসন্ধানে প্রকাশ, মোটর নিয়ে তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন উত্তরদিকের পার্ব্বত্যপথে। কিন্তু মোটরের স্টিয়ারিং তিনি ভালো ক'রে বাগাতে পারেন নি। ফলে দৈবাৎ সম্মুখের একখানা চাকা পাহাড়ের ধারে পিছলে পড়ে। তা'তে সচরাচর যা ঘ'টে থাকে। গাড়ীখানা তাঁকে নিয়ে ওলোটপালট খেয়ে অনেক নীচের দিকে নেমে যায়। দু'চারজন পাহাড়ী লোক ঘটনাটা বুঝতে পেরে কোতোয়ালীতে সংবাদ দেয়। তারা লোকজন এবং সাজসরঞ্জাম নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে পৌছয়। তদন্তের ফলে প্রকাশ, গাড়ীখানা চুরমার হয়েছে এবং সুধীশচন্দ্রের পত্নী মিসেস কল্যাণী রায় প্রচণ্ড আঘাতের ফলে রক্তাক্ত ও অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। শহরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা যায়, কল্যাণী রায়ের মস্তিষ্কের শিরা ছিন্ন হয়ে গেছে, তাঁর জীবনের আশা কম। ডক্টর মৃগেন্দ্রের বাড়ীতে তিনি আতিথ্য নিয়েছিলেন, সুতরাং মৃগেন্দ্রবাবুই পুলিশ সাহেবের মোটরে রোগীকে তুলে নিয়ে সরাসরি দিল্লী যাত্রা করেছেন। স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসায় রোগীর অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। ট্রাঙ্ক্ টেলিফোনে রোগিণীর স্বামীকে দুর্ঘটনার সংবাদ জানানো হয়েছে। চাকর দুজনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দিল্লী রওনা হয়েছে।

পুলিশের দুইজন অফিসার ভদ্রলোক অগ্রসর হ'য়ে এসে জানালেন, ডাক্তারবাবু যাবার সময় আপনাদের ওপরেই এ বাড়ীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে গেছেন। তবে আপনারা যদি চ'লে যান্ তবে আমাদেরই হাতে এ-বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকবে। আপনাদের জিনিষপত্র আপনারা নিয়ে যেতে পারেন।

মীনাক্ষী ইংরেজী ভাষায় জানালো, তারা আজই এখান থেকে চ'লে যেতে চায়, কিন্তু জিনিষপত্র কিছুই তারা সঙ্গে নেবে না। পুলিশ সাহেবের কাছে সে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সমস্ত ঘরের চাবির গোছা জমা রেখে যেতে চায়।

পুলিশ সাহেব একবার কঙ্কবের অশ্রুউদ্‌গত মুখের দিকে ফিরে তাকালেন, তারপর করুণ ম্লান হেসে বললেন, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

## তেরো

প্রাচীন টিহরী গাড়োয়ালের পার্বত্যপথে আবার এই গল্পের সূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। অপরাহ্নের দিকে নববর্ষার গুরু গুরু ঘোষণা পশুরাজের মতো কেশর ফুলিয়ে নীলকণ্ঠ পর্বতের প্রান্তে জেগে উঠেছে,—অরণ্যে অরণ্যে তারই গভীর গর্জন চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে।

প্রাচীন সর্পিল পথের একটি পৌরাণিক মহিমা আছে, সেখানে আধুনিক কালের কোনো বৈচিত্র্য নেই। পথের একদিকে খরতর বিজনবাহিনী নীলধারা, অন্যদিকে জটারণ্যের জটিল তপোবনে সন্ন্যাসীগণের আশ্রম। কোথাও কোন প্রশ্ন আর কৌতূহল নেই; পথিকের সংবাদ আর পরিচয় কেউ জানতে চায় না। জীবন এদিকে বড় উদাসীন। কখনো ক্বচিৎ সন্ন্যাসীর চিমটার শব্দ পথ থেকে পথের দিকে মিলিয়ে যায়।

দূরের থেকে সামান্য একটি পার্বত্যগ্রাম ছাড়িয়ে দুজনে চলেছে দক্ষিণপূর্ব পথে। মাঝখানে লোকবসতির সামান্য একটু প্রাণচাঞ্চল্য পাওয়া গিয়েছিল, তারপর সকল দিক নীরব, কেবল ছায়াপথে যেতে অবিশ্রান্ত ঝিল্লির একটানা আর্তনাদ। পত্রপল্লবের মর্মে মর্মে আসন্ন বর্ষার কৌতূহল-কানাকানি চলেছে। কোথাও জটাজটিল পথে করুণ অন্ধকার আশ্রয় নিয়েছে, কোথাও গভীর কালো গুহা, কোথাও বা তপোবনের পাশে পাহাড়ের খাদে এক একটি কলকণ্ঠী ঝরণা,

—এরই ভিতর দিয়ে চলেছে দুজনে। ভদ্রসমাজের আশ্রয়টা তাদের পক্ষে মানানসই হয়নি, রস পেলো না তারা চল্‌তি জীবনে, তারা পালিয়ে চললো বিশ্রামের সন্ধানে। জীবনবৈরাগ্য এটা নয়, অনেকটা নিরিবিলি বিশ্রাম। সন্ন্যাসের দিকে তাদের কোনো আসক্তি নেই, কেবল স্নায়ুতন্ত্রের পরে একটি শান্ত, সহজ ও নিরাসক্তির প্রলেপ বোলানো। তবু প্রশ্ন উঠতে পারে, একি ভালো হোলো? কোলাহলমুখর যে জীবন, তার মধুচক্র থেকে নিরুদ্দেশে পালানো কি মনুষ্যত্বের পরিচয়?

কাঁধের ঝুলিটা নামিয়ে কঙ্কর একবার থম্‌কে দাঁড়ালো। ডান হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। পিছন দিকে চেয়ে বললে, তোমার মতন তপস্বিনী পেলে তাপস হ'তে আমার আপত্তি নেই, মীনাক্ষী।

মীনাক্ষীর পরণের শাড়ীখানা গাছকোমর বাঁধা, হাতে একটি ফল-পাকড়ের ঝারা। খালি পা দুখানা ধূলিধূসরিত। মুখখানা পরিশ্রমে রাঙা। হাসিমুখে বললে, কিন্তু তোমার মতন তাপস সঙ্গে থাকলে তপস্বিনী হওয়া বড় কঠিন যে। আ, কী ছিরিই হয়েছে! খালি পায়ে হাঁটা অভ্যাস নেই, পা দু'খানা যে গেল! তখন বললুম না, ওখান থেকে কিছু খেয়ে নাও।

কঙ্কর বললে, ফিরবে কবে এখান থেকে?

সূর্যের দক্ষিণায়ণে।

আকাশে আবার মেঘ ডেকে উঠলো। কঙ্কর আবার হাঁটতে লাগলো। মীনাক্ষী চললো পিছনে পিছনে। কিছুদূর গিয়ে দুজনে পুনরায় দাঁড়ালো। পথের পাশে এক ক্ষুদ্র ঝরণায় অঞ্জলি ভ'রে মীনাক্ষী জলপান করলো। চিবুক বেয়ে সেই জলের ধারা নীচের দিকে নেমে গায়ের কাপড় ভিজিয়ে দিল। জলের হাত বুলোলো জটপড়া রুক্ষ চুলের রাশিতে।

কাঁকর!

কঙ্কর ফিরে দাঁড়ালো।

কল্যাণী নিশ্চয়ই মারা গেছেন, কি বলো ?

কঙ্কর বললে, মরেছেন তিনি কুড়ি বছর আগে, মীনাক্ষী।—এই ব'লে সে আবার এগিয়ে চললো।

অপ্রত্যাশিত,—কিছুদূর গিয়ে সহসা পিছন থেকে দ্রুত এসে মীনাক্ষী রুদ্ধশ্বাসে কঙ্করের হাত চেপে ধরলো। কম্পিতকণ্ঠে ডাকলো, কঁাকর !

কি হোলো তোমার ?

ভয় করে তোমার কথায়। আমাদেরো কি মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে বলতে চাও ?—অধীর উৎসুক প্রশ্ন নিয়ে মীনাক্ষী তার দিকে বিশাল চক্ষু মেলে তাকালো।

কঙ্কর বললে, সংশয় আর বাধা ত আমাদের মধ্যে নেই, মীনাক্ষী। এদের স্বীকার করলে এরাই তোমাকে বাঁধবে। ভয়ের জন্ম আত্ম-সংশয়ে।

কিন্তু যদি তুমি ছেড়ে চ'লে যাও ?

পারবে না ধ'রে রাখতে ?

মীনাক্ষী তার পায়ের কাছে ব'সে পড়লো। মুখ তুলে ভগ্ন ক্লান্তকণ্ঠে বললে, তুমি যে বিপ্লবী !

তুমি যে সেই বৈপ্লবিক শক্তির অংশ। পজেটিভকে ছাড়লে একা নেগেটিভে আলো জ্বলে না।—এই ব'লে কঙ্কর তার হাত ধ'রে তুলে নিল। বললে, চলো, পথ ফুরিয়ে এসেছে।

অনেক দূরে গিয়ে মীনাক্ষী আবার থমকে দাঁড়ালো। ডাকলো, কঁাকর !

কঁাকর পিছন ফিরে তাকালো।—ওকি, এগিয়ে এসো।

মীনাক্ষী নতমস্তকে স্থির হয়ে রইল। হাসিমুখে কঁাকর এগিয়ে এসে তার চিবুকে হাত দিয়ে বললে, আবার সন্দেহ ? বলো, কি বলবে ?

বিপদের কথাটা ভাববে না ? আমি যে মেয়েমানুষ, কঁাকর।

বেশ ত, সেজন্য আমি বাধিত। বিপদটা কি শুনি ?

তুমি জানো—ব'লে মীনাক্ষী মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

কঙ্কর একবার নিরুত্তরে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিয়ে বললে, তোমার সকল প্রশ্নের জবাব পাবে দু'জনের জীবনযাত্রায়। ভয় কি? এসো, পথ ফুরিয়েছে।

কিছুদূর গিয়ে কাঁধের ঝোলাটা পথের ধারে নামিয়ে কঙ্কর বললে, দাঁড়াও, মন্দিরেব গদিতে গিয়ে খবরটা জেনে আসি।—এই ব'লে সে সটান দালানের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

কিছুক্ষণ পরে একজন গেরুয়াপরা লোক এক গোছা চাবি নিয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে এলো। তাকে অনুসরণ ক'রে দু'জনে চললো দক্ষিণদিকে। পাশেই নদীর বাঁধানো ঘাটেব ধারে একখানা নৌকা বাঁধা—খেয়াপার করে। ঘাট ছাড়িয়ে তিনজনে কিছুদূর গিয়ে একটি সুন্দর ফুলের বাগানযুক্ত একখানি কুটিরে প্রবেশ কবলো। কুটিব একটি নয়, অনেকগুলি। আশে পাশে কয়েকজন মৌনী সন্ন্যাসী নিজ নিজ আশ্রমের সেবায় রত। তারা ফিরেও চাইলো না।

ভিতরে ঢুকে সেই ব্যক্তিটি কুটিরের চাবি খুলে দিল। পাথর ও মৃত্তিকায় ঘরখানি তৈরি। ভিতরে একরাশি ডালপালা, একপাশে কালি-ঝুলি মাখা একটা পাথরের উনুন, খান দুই কম্বল, বড একখানা চাটাই, খড়ের আটিবাঁধা বালিশ। ঘরের পাশেই একটি পূজার বেদী, একটা শাঁখ, কয়েকটি কাঠের ও পাথরের পাত্র। দেখেই মনে হয় সম্প্রতি কেউ এখানে ছিল। ঘরের ভিতরকার অদ্ভুত সরঞ্জামগুলির দিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী বিস্ময়বোধ করলো। যেগুলি পথের ধারে জঞ্জালের মতো ফেলে দিলে কেউ কোন দিন ফিরেও চায় না—সেইগুলিই যেন এখানে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। এই ঘরে একজন বৈরাগী সম্প্রতি বাস ক'রে গেছে, কিন্তু যেদিন তার আর কোন প্রয়োজন থাকেনি, সেদিন বিদায় নেবার সময় এই ঘর ফেলে চ'লে গেছে অনাগত অদেখা মানুষের জন্য; অবহেলায় ফিরেও তাকায়নি। মীনাক্ষী চেয়ে দেখলো, সর্বাঙ্গে

এর দারিদ্র্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই দারিদ্র্যের মধ্যে কোথাও অসন্তোষ ও নিরানন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না—তার বদলে চারিদিকে যেন কেমন একটা গভীরতর বৈরাগ্যের তৃপ্তি। কাঠের পাত্র, পাথরের নুড়ি, ভাঙা শাঁখ, মোটা কম্বল,—এইগুলোই যেন এখানে মানায়,—মানব সভ্যতার কোনো উপকরণ এখানে পাওয়া গেলে যেন রসভঙ্গ হোতো, ছন্দপতন ঘটতো। এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের পরণের শাড়ী আর জামা মীনাক্ষীর সর্বশরীরে যেন অস্বস্তির খোঁচা বিঁধিয়ে দিতে লাগলো।

কঙ্কর বললে, পাশেই পাহাড়ের গা, সাপখোপ থাকতে পারে। দেখেছ, জানালা দরজা ঢাকবার জন্য কখানা তক্তা প'ড়ে রয়েছে।

মীনাক্ষী বললে, এদিকে চেয়ে দেখো, একরাশ রুদ্রাক্ষের মালা। ওখানে দেখো চন্দনকাঠ আর শিলা।

কঙ্কর বললে, তান্ত্রিক মতে আজ একটা পূজা করলে কেমন হয়? তুমি সাজবে দিগম্বরী।

এমন সময় পথপ্রদর্শক লোকটি প্রদীপ জ্বালার সাজসজ্জা এনে হাজির করলো। আরো দুখানা কম্বল এনে দিল। তারপর জানালো, আজ পাশের আশ্রমে যজ্ঞ হবে, রাত্রে আপনারা প্রসাদ পাবেন। এই ব'লে সে সেদিনকার মতো বিদায় নিল।

মীনাক্ষী সোৎসাহে বললে, তোমার ঝোলাঝুলি খোলো। ছালের কাপড় দুখানা বা'র করো। দাঁড়াও, আগে ঘর সাজাই।

লতাপাতার আটি বেঁধে মীনাক্ষী ঝাঁটা তৈরি করলো। কঙ্কর ঘরের সজ্জা গোছালো। এমন দুর্লভ আশ্রয় মানুষের জীবনে অল্পই জোটে। ঘরটি এখানে নগণ্য, কিন্তু পারিপার্শ্বিক চেহারাটাই যেন দুর্লভ। পর্ণকুটিরের ভিতরকার দরিদ্র জীবনযাত্রাটার মোহ কিছু নেই, কারণ দারিদ্র্য বরণ করাটায় জীবনের গৌরব বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু পুষ্পলতা-বিতানে ভরা এমন একটি অঙ্গন, তার নীচে এমন খরপ্রবাহিনী স্বচ্ছ নীলধারা পর্বতের এমন

শোভা, তপস্যার এমন মনোরম স্থান,—এমন একটি নির্জন সর্ব আভরণহীন উদার উদাস বিশ্রামের নিকেতন,—এইটি সকলের বড পাওয়া। একে সৌখীন বৈরাগ্য বলো, কবিত্ব বলো, অবৈধ আত্মগোপন বলো—মীনাক্ষী সব স্বীকার ক'রে নেবে। তবু কথা থেকে যাবে, ওরা এইদিকে আনন্দ পায় কেন? দুজনের জীবনভরা বিপ্লববাদের মধ্যে কেন এমন একটা অদ্ভুত নিরাসক্তি? কুড়িয়ে কিছু নেয় না, সঞ্চয় কিছু করে না, লোভের উপকরণ খুঁজে পায় না,—সব যেন পথের ধারে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে যায়। ভয়ানক আধুনিকতা, কিংবা এটা অতি' প্রাচীন আমলের—এ নিয়ে তর্ক নেই। কিন্তু ওদের পক্ষে এই স্বাভাবিক। ভয় পেলো না নিন্দায়, চক্ষুলজ্জা পেলো না ভদ্রসমাজে, আনন্দের উপকরণ পেলো না নাগরিক জীবনযাত্রার বিপুল উপকরণ-বাহুল্যের বিলাসে—কিন্তু এই দারিদ্র্যের কল্পনায় খুঁজে পেলো অফুরন্ত রসের ভাণ্ডার।

কুটিরের দরজা খোলা রইলো। দুজনে এসে নামলো কঠিন শীতল নদীর জলে। নদীর প্রবাহ অতি দ্রুত, দুই ধারে গগনস্পর্শী পর্বতমালা, তাদেরই উপর দিয়ে ভৈরব গর্জনে চলেছে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ,—সন্ধ্যা আসছে ঘনিয়ে। নদীর প্রবল স্রোতে উজানে সাঁতার দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হোলো,—তাদের অসাড় দেহ যেন বাধা ও বাঁধন খুলে ভেসে চললো।

অত স্নান, অদ্ভুত সাঁতার। সম্ভ্রম খোয়াবার ভয় নেই, জবাব দেবার প্রশ্ন নেই,—মেয়ে আর পুরুষের মধ্যে সেই আরণ্যক বন্য প্রকৃতি জেগে উঠলো। খোলা চুলের রাশির সঙ্গে প্রাণের গ্রন্থিও যেন সব খুলে গেল। সকল সংস্কারকে ভাসিয়ে অতল তলে তলিয়ে গিয়ে তারা যেন দেখে নিতে চাইলো, ভিতরে কী আছে সকলের শেষ অর্থটাকে তারা যেন ডুব দিয়ে তুলে আনতে চায়। অনেকক্ষণ ভাসতে ভাসতে গিয়ে তারা এক ঘাটের বড় একখানা পাথর আঁকড়ে স্রোতের ধারা থেকে আত্মরক্ষা করলো। সর্বাঙ্গ তখন অসাড়, হিমশীতল। কঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করলো, তোমার পরণের শাড়ী কোথায় গেল?—মীনাক্ষী

সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় নদীর প্রস্তর শিলার উপরে উঠে সহসা বিপন্ন হ' খরস্রোতা নীলধারার চারিদিকে তাকালো।

*   *

*

প্রাচীন ঋষিরা যা ব্যবহার করতেন, সেই বাকল পাওয়া গেল না। কিন্তু গাছের ছাল থেকে যে কাপড় তৈরি তাই জড়িয়েই মীনাক্ষীকে সান্ত্বনা মানতে হোলো। কঙ্কর গিয়ে রাশিকৃত ফুল তুলে আনলো। শাদা ও রক্তগোলাপ, কাঁঠমল্লিকা, শ্বেতকরবী, সূর্য্যমুখী,—আরো অনেক নাম-না-জানা ফুলের গুচ্ছ। গাছের ঝুরি থেকে আঁশ খুলে সরু কাঠির সাহায্যে মালা তৈরি হোলো। দীপ জ্বাললো মীনাক্ষী,—গলার চেন্ হার ও হাতের সোনার চুড়ি খুলে সরিয়ে রেখে দিল। তারপর শিলার উপরে চন্দন তৈরি হোলো। রুদ্রাক্ষের মালাগুলো আনা হোলো, মীনাক্ষী একছড়া মালা পরিয়ে দিল কঙ্করের গলায়, আর একছড়া খুলে বেঁধে দিল তার দুই হাতে। কপালে পরিয়ে দিল বরচন্দন। কোমরে বেঁধে দিল গোলাপের মালা। পুরুষের সজ্জা হয়ে গেল।

এবার তুমি প্রস্তুত হও, মীনাক্ষী।—ব'লে ক্ষণেকের জন্য কঙ্কর দরজার দিকে তাকালো। বাইরে ঝরো ঝরো বর্ষণের শব্দ, ভিতরে ঘৃতপ্রদীপের শিখাটি কেঁপে উঠছে। ক্ষণেকের জন্য, তারপরই সে পুনরায় বললে, সব খোলা থাক্—দরজা জানালা সব। এসো, আমি প্রস্তুত।

কিন্তু কঙ্কর নিজেই এগিয়ে এসে বললে, একদিন অলঙ্কার পরার লজ্জায় পালিয়েছিলে ঘর থেকে, আজ নিজের হাতে তোমাকে অলঙ্কৃত করব। না, বাধা দিয়ো না, সব ফেলে দাও। তেমনি ক'রে দাঁড়াও, যেমন ক'রে পৌরাণিক কালে তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে বিশ্বামিত্রের ধ্যানদৃষ্টির সামনে।

মীনাক্ষী তান্ত্রিক মতে তার আদেশ পালন ক'রে চোখ বুজে দাঁড়ালো স্মিতমুখে।

# আঁকা-বাঁকা

কঙ্কর তার এলো চুলে বেঁধে দিল কুরুবকের চূড়া, গলায় ঝুলিয়ে দিল মল্লিকার গুচ্ছ। দুই হাতে বাঁধলো সূর্যমুখীর স্তবক। কটিতটে দোলালো রক্তগোলাপের লহরী। দুই বক্ষে দিল বেঁধে গৌরীফলের ঝালর। ডালিমের ফুল দিয়ে বানাল চরণের নূপুর। তারপর শান্তকণ্ঠে সে বললে, এখানে একটা চলতি উপমা প্রয়োগ করতে পারি, মীনাক্ষী। সর্ব আভরণহীন প্রকৃতিকে পুষ্পালঙ্কৃত করলো এসে ঋতুরাজ। তারই স্পর্শে ফুল ফুটলো তোমার সর্বাঙ্গে স্তবকে স্তবকে। লজ্জাবাস ত্যাগ করেছিলে তুমি স্বেচ্ছায়, তোমার লজ্জা ঢেকে দিল সে।

মীনাক্ষী পাষাণীমূর্তির মতো রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কপালে ও সিঁথিতে তার রক্তচন্দন এঁকে দিয়ে কঙ্কর বললে, এই তোমার চিরস্থায়ী এয়োতির চিহ্ন—এঁকে দিলুম আমার বুকের রক্তের সঙ্কেত। এবার ফুলশয্যা রচনা করো।

বাইরে ঝড়ের মাতন, মেঘের গুরু গুরু ডাক, ঘন জলধারার অবিশ্রান্ত হাহাকার, মুক্ত দ্বারপথে বৃষ্টির মুহুর্মুহু ঝাপট—কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরের ভিতরে ময়ূর-ময়ূরী যেন নৃত্য ক'রে উঠলো। আকাশে আকাশে জেগেছে করুণ বিরহ-বেদনা, উন্মত্ত ঝড়ের বার্তায় তার বাণী ছুটে চললো দিগ্‌দিগন্তরে,—বর্ষার জলধারায়, ভেকের উচ্চকণ্ঠে, ঝিল্লির আর্তরবে, বিবর্ণ অন্ধকারের ভিজে হাওয়ায়, —যেন একটা লক্ষ্যহীন বিপ্লব ঘোষণা ক'রে চলেছে; যেন সেই বিপ্লবের নিগূঢ় তাৎপর্য উন্মাদিনী প্রকৃতির সর্বাঙ্গে পরিদৃশ্যমান, যেন চিরপলাতক ঋতুরাজের পলায়নে তিনি অশ্রুপ্লাবিনী। তাই বসন্তের পরে নববর্ষা।

ভিতরে এর বিপরীত। যে-ফুলশয্যাটা রচনা করা হোলো সেটা যেন চিতাশয্যা; দপ দপ ক'রে জ্বলছে। তার উপর চিরপলাতকের অস্থিদাহ হবে। অগ্নিরূপিণী একবার এগিয়ে এলো, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বৃষ্টিধারার দিকে আবেশমদির চক্ষে চেয়ে একরূপ আশ্চর্য হাসি হাসলো। ঝড়ের গর্জনের দিকে মুখ তুলে সহসা উঁচু গলায় মীনাক্ষী বললে, ভয় করিনে তোমাদের, পৃথিবীতে এই সংবাদ ঘোষণা ক'রে দিয়ো—এই ব'লে সে কুটীরের দ্বার বন্ধ ক'রে দিল।

———

## প্রবোধকুমার সান্যালের

## অন্যান্য বই

---

জলকল্লোল

মল্লিকা

যতদূর যাই

আলো আর আগুন

বন্যাসঙ্গিনী

আগ্নেয়গিরি

চেনা ও জানা

অঙ্গরাগ

পঙ্কতীর্থ

নববোধন

জয়ন্ত

নদ ও নদী

অরণ্যপথ

অঙ্গার

দেবীর দেশের মেয়ে

দেশ দেশান্তর

সরলরেখা

স্বাগতম্

এই যুদ্ধ

মহাপ্রস্থানের পথে

অগ্রগামী

কাজল লতা

পায়ে হাঁটা পথ

ভ্রমণ ও কাহিনী

তরঙ্গ

রঙীন স্থতো

সায়াহ্ন

ইতস্ততঃ

মনে মনে